উজ্জ্বলনীলমণি

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

ভারতী প্রকাশন
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রক :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

পূজনীয় পিতৃব্য

শ্রীযুক্ত ব্রজপদ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

অন্যান্য বই :

মুমূর্ষু পৃথিবী
হংসদূত
ঋতুসম্ভার
অস্তাচল
এগারোই ফাল্গুন
মণিকুন্তল
মাটির পরশ
পলাশী
অজন্তা
স্বর্ণপুত্তলিকা
মহাজাতি
দাঁড়কাকের মিছিল
লীলাভূমি
অমর প্রেম
গোধূলি লগ্ন
পাতাল গঙ্গা

উজ্জ্বলনীলমণি

অবতরণিকা

রূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি বিশ্বসাহিত্যের এক অভিনব সম্পদ। পূর্বে ভরত প্রভৃতি মুনিগণ নাট্যসাহিত্যের রসবিচার ও চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য যে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন, সেগুলিকে নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণ ও রসবিশ্লেষণের বিশদ ব্যাকরণ বলা চলে। মধুররসে আপ্লুত নরনারী বা নায়ক-নায়িকার মনঃসমীক্ষণ তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রূপ-গোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি শুধুমাত্র অলঙ্কার বা রসশাস্ত্রের অনুশীলন নয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে শৃঙ্গারমদির আনন্দধারার অনন্ত প্রবাহ জীবজগৎকে করেছে মধুময়, লোকাতীত কল্পলোক যার মোহনস্পর্শে হয়ে উঠেছে স্বপ্নমধুর, সেই রতিরসাত্মক অমৃতধারার বিস্তৃত আলোচনাই রূপ পরিগ্রহ করেছে শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে। এই উজ্জ্বলাখ্য মধুররসই তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। দিকে দিকে এই অফুরন্ত রূপরাশি যাঁর অনন্ত রূপের বিকাশ, যিনি নিজেকে বিকশিত করেছেন পুরুষ ও প্রকৃতির সীমাহীন সমন্বয়ে, সেই মহান্ সত্তাই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে আশ্রয় ক'রে, শ্রীমতী ও গোপাঙ্গনাদের প্রেমলীলা প্রসঙ্গে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন নরনারীর অন্তরের নিগূঢ় রহস্য। পার্থিব জগতে নায়ক ও নায়িকার অন্তরের প্রতিটি গোপন অনুভূতি ধরা দিয়েছে তাঁর মর্মদর্শী অসামান্য দৃষ্টির আলোকে। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনারা হয়েছেন পার্থিব নরনারীর মূর্ত প্রতীক। পার্থিব জীবনে মানুষের যে ভালোবাসা, দাম্পত্য প্রেম ও প্রণয়, তাই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাদের প্রণয়লীলা-রহস্যের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বলনীলমণির প্রতিটি শ্লোকে ও ছত্রেছত্রে। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাদের অপরূপ প্রেমলীলা অবলম্বন ক'রে বৈষ্ণব কবিগণ যে অপরিমেয় মাধুর্যরস পরিবেশন করেছেন, তা শুধু কবিকল্পনা নয়; নরনারীর প্রাণের সুকুমার অনুভূতিই পরিব্যক্ত হয়েছে সেই অপার্থিব পরম সত্তা ও পরমা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। সে শুধু দেবতার প্রেম নয়, মানুষেরই মনের কথা। পার্থিব জীবনের দৈনন্দিন গতিপথে নরনারীর বুকে

প্রণয়ের যে চিরন্তন ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে, তারই নিগূঢ় রহস্য রূপায়িত হয়েছে দেবতার উদ্দেশে গাঁথা ওই প্রেমের মন্দার মালায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?

*   *   *

এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ দেয় বঁধূর গলায়।
* * * আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

দেবতার উদ্দেশে রচিত প্রেমকাব্যের এই খনিতে লুকিয়ে আছে মানুষেরই প্রাণের কথা, যেখানে দেবতার মন্দিরে প্রিয় আর প্রিয়তমের সিংহাসনে দেবতা পেয়েছেন স্থান।

বাঙলার নিজস্ব কাব্যচিন্তা পূর্ণতা লাভ করেছে বৈষ্ণবযুগে। কালিদাস, ভারবী, ভবভূতি, মাঘ ও শ্রীহর্ষ প্রমুখ কবিগণের আবির্ভাবের পর কয়েক শতাব্দী ভারতের কবিকুঞ্জ নীরব ছিল। সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে একে একে আবির্ভূত হলেন জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। তাঁদের অলোকসামান্য প্রতিভার পঞ্চপ্রদীপে কাব্যভারতীর মঙ্গলারতি ক'রে গেলেন। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা—তথা সারা ভারতের কবিকুঞ্জ মুখর হয়ে উঠলো সুমধুর গীতিঝঙ্কারে। কিন্তু দেখতে দেখতে সে সঙ্গীত মূর্ছনাও আবার নিথর হয়ে এলো। প্রায় তিনশো-বৎসরকাল সমগ্র জাতি নিমজ্জিত হয়ে রইল জড়জীবনের স্থূল বাস্তবতার সংঘাত-তরঙ্গে। মানসলোকে নেমে এলো নিবিড় অন্ধকার। সহসা সেই নিষ্ক্রিয়তার প্রাচীর ভেঙে অবতীর্ণ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সারা ভারত প্লাবিত হয়ে গেল প্রেমের বন্যায়। নদীয়া, বৃন্দাবন,

ভূমিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণি গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থে তিনি বৃন্দাবনলীলারসের নিগূঢ় ও মধুরতম রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। গোপীগণের সহিত শ্রীগোপীনাথের এই মধুর রস-লীলা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম ও চরম আস্বাদ্য। এই সম্প্রদায়ের ইহাই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

রসতত্ত্বের আলোচনার ইতিহাসে প্রথমেই ভরতমুনির নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি নাট্যশাস্ত্রে রসের নানাপ্রকার বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরবর্তী রসিক আচার্য্যগণ ভরতেরই অনুগামী। "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্‌রসনিষ্পত্তিঃ"। এই প্রসিদ্ধ ভরতসূত্রই রসশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রধান উপজীব্য। এইরূপ সূত্রকে দার্শনিক পরিভাষায় "গ্রহণবাক্য" বলা হয়। এই সূত্রে রসের লক্ষণ, স্বরূপ ও কারণসমূহ বিবৃত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় নানাবিধ মতবাদ উপস্থিত হইয়া রসিকগণের নানা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে। ভরতমুনি আটটি কিংবা নয়টি রস স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ভরতমুনির উদ্ভাবিত বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি স্বীকার করিয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ রসতত্ত্বকে স্বীকার করেন নাই। ঐ রস অনিত্য ও লৌকিক। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় নিত্যা প্রেয়সীগণকে অবলম্বন করিয়া যে রসের প্রকাশ, সেই রসই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জীবাতু। সেই রসই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। রৌদ্র ভয়ানক প্রভৃতি রস স্বীকৃত হইলেও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসই রসিক বৈষ্ণবগণের প্রধানরূপে অনুমোদিত। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম মধুর রসই সর্বাপেক্ষা প্রধান। শ্রীমদ্রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে

মধুর রসের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের মনীষা, মননশীলতা ও বিচার-বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য অভূতপূর্ব বলিয়া মনে হয়।

এই অলৌকিক মধুররস লৌকিক শৃঙ্গার রসেরই অনুরূপ হইলেও ইহা মুমুক্ষুর আস্বাদ্য। ভরতমুনিকথিত বিভাব অনুভাব প্রভৃতি এই অলৌকিক রসে অপেক্ষিত হইলেও এই রসের আলম্বন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় তদীয় নিত্যকান্তা গোপীগণ। ইঁহারা নিত্যপ্রেয়সী হইলেও প্রকটলীলায় অনূঢ়া ও পরোঢ়া-রূপেই মধুররসের আশ্রয় হইয়াছেন। অনূঢ়াগণ পতিভাবে ও পরোঢ়াগণ উপপতিভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রেম নিবেদন করিয়াছেন। পরোঢ়াগণের উপপতিভাবময় রসই অলৌকিক মধুর রস। ইহাই বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরকীয়াভাবময় লীলার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে। এই লীলার স্বরূপ ও রহস্যের উপলব্ধি সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। ইহা অতিনিগূঢ় রহস্য-বস্তু। সাধারণজন প্রকৃত রহস্য না বুঝিয়া এই লীলাতে লৌকিকভাবে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। লৌকিক দৃষ্টিতে পরকীয়াভাবময় মিলন অতিনিন্দিত। এই জন্যই মহারাজ পরীক্ষিৎও লৌকিক দৃষ্টিতে আক্ষেপ করিয়াছেন। রাসলীলা শ্রবণ করিয়া, শ্রোতা পরীক্ষিৎ সন্দিগ্ধচিত্তে আক্ষেপ করিলেন যে, যিনি ধর্মস্থাপনের জন্য ও অধর্মবিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আপ্তকাম শ্রীভগবান্ পরোঢ়া গোপীগণের সহিত রাস-রস আস্বাদন করিলেন কেন? এই কার্য্য ত অতিজুগুপ্সিত ও নিন্দিত। তিনি ত আপ্তকাম, পূর্ণানন্দস্বরূপ। পরোঢ়ার প্রতি এইরূপ অনুরাগ হওয়া তাঁহার পক্ষে অতিশয় দোষাবহ। যাহা এইরূপ নিন্দিত ও দোষাবহ তাহা কখনই অলৌকিক রস হইতে পারে না।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সিম্পোসিয়াম (Symposium) গ্রন্থে প্রেমতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। একজন কবি বলিলেন যে, প্রেম দিব্যবস্তু। সক্রেটিস্ কিন্তু এই মত স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, প্রেম কখনই দিব্য হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বস্তুর অভিলাষে যে প্রেমের উৎপত্তি, তাহার দিব্য হওয়ার সামর্থ্য নাই। দিব্য হইলে, তাহা নিত্য দিব্যবস্তুকেই অবলম্বন করিত। সক্রেটিসের মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন—স্ত্রী পুরুষের প্রণয়কে প্রেম নামে অভিহিত করা অনুচিত। উহা জৈব ধর্ম মাত্র। যৌবনের উদ্গমের সহিত স্বাভাবিক এই প্রবৃত্তি নরনারীকে

বংশরক্ষায় বলপূর্বক প্রবৃত্ত করে। ইহাতে প্রেমের গন্ধও নাই। কিন্তু দার্শনিকগণ যাহাই বলুন, পৃথিবীতে নানাদেশে অগণিত কবি নরনারীর ঐ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে প্রেম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। এখনও সেই পরম্পরা অব্যাহত রহিয়াছে। নরনারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে যাঁহারা প্রেম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও কিন্তু অবৈধ প্রণয় অর্থাৎ পরোঢ়া নারীর প্রতি তাদৃশ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে প্রেম বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বরং বিশেষভাবে নিন্দাই করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ও পরোঢ়া গোপীগণের প্রণয় অলৌকিক প্রেমরস কিরূপে হইবে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন "জুগুপ্সিতং সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ"। অর্থাৎ এই উপপতিভাব সদ্‌গতিবিরোধী, অকীর্ত্তিকর, অসার, ক্লেশকর, ভয়াবহ ও নিন্দিত। ইহা যেমন পরীক্ষিতের প্রশ্ন, তেমনই জনসাধারণেরও। এই রসের ব্যাখ্যাতা শ্রীরূপগোস্বামীও এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই প্রশ্নের সমাধানও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উপপতি ভাবময় প্রণয় প্রাকৃত নরনারীকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইলেই উক্ত দোষসমূহের সম্ভাবনা হয়। বৃন্দাবনলীলায় উপপতিভাবময় প্রণয়ের আলম্বন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। যাঁহারা তাদৃশ ভাব নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই নায়িকাগণও সাধারণ নারী নহেন। ইঁহাদের এই লীলার নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে হইলে পূর্ববৃত্তান্তের সহিত পরিচয় হওয়া আবশ্যক। এই সকল গোপীদের মধ্যে অনেকেই শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি। কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ ঋষি ও কেহ কেহ শ্রুতি। কোন সময় দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ রামচন্দ্রের মনোহর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মধুর ভাবে বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই মুনিগণ গোকুলে গোপীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে শাস্ত্রের আলোচনায় জানা যাইবে যে, গোপীগণ পরোঢ়া হইলেও তাহা ব্যবহারিকভাব মাত্র। রসের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য যোগমায়ার দ্বারা এই পরোঢ়াভাব কল্পিত হইয়াছে। পরকীয়াভাবে যে-রূপ রসের উল্লাস হয়, সেইরূপ স্বকীয়াভাবে হয় না। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নর-নারীর প্রণয় পরমউৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। এইজন্য উহা সমঞ্জসা রতি নামে পরিচিত। উহাতে লোকনিন্দার ভয় নাই। বাধাও নাই। ঔপপত্য-মূলক প্রণয়ে লোকনিন্দাভয় ও বাধার পরম্পরা উপস্থিত হয়। এই প্রণয় অভিদুর্লভ এবং দুর্লভ বলিয়াই উৎকৃষ্ট। এই সমর্থা রতির প্রণয় অতি প্রবল ও

দুর্ধার। ইহা লোকশাস্ত্রসম্মত প্রণয়ে থাকে না। ঔপপত্যভাব না হইলে এই প্রণয় চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত না। সেইজন্য যোগমায়া নিত্য প্রেয়সীগণের তাদৃশভাব প্রকাশ করিয়া, মধুররসকে উন্নত পরাকাষ্ঠায় উপস্থাপিত করিয়াছেন। ঘৃণা লজ্জা ভয় প্রভৃতি সকলভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমমিলনপ্রত্যাশী না হইলে, তাহাতে পূর্ণতা আসিতেই পারে না। ঐরূপ পূর্ণতা না আসিলে তন্ময়ভাবময় প্রেমরস প্রকাশিতই হইবে না। এই অলৌকিক রসের অপূর্ব মাধুর্য আস্বাদন করিতে হইলে, এই রসের আলম্বন ও আশ্রয়তত্ত্বের স্পষ্ট পরিচয় মনে রাখিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রীরাধা ও গোপীগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিত্য। সেইজন্য এই লীলাও নিত্য। যখন শ্রীভগবানের স্বরূপমাধুর্য আস্বাদন করাইবার ও প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার বলবতী উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়, তখন যোগমায়ার সাহায্যে নিত্য স্বকীয়াভাব আবরণ করিয়া, তিনি নিজপ্রেয়সীগণের পরকীয়াভাব প্রকাশ করেন। অপ্রকট লীলায় নিত্যস্বকীয়াভাব বিরাজিত থাকায় রসের অপূর্ব উৎকর্ষ থাকে না। সেইজন্য প্রকটলীলায় পরকীয়াভাবের অভিব্যক্তি। ইহা শ্রীজীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত। তিনি বলিয়াছেন যে, গোপীগণের বিবাহ মায়া কল্পিত। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিতই তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত তিনি গোপালচম্পূ কৃষ্ণসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভিন্নমত পোষণ করেন। নানা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের যেমন পরকীয়া ভাব, নিত্যলীলাতেও তেমনই পরকীয়াভাবই রহিয়াছে। যাহাই হউক এই মধুর রসময়ীপ্রেমলীলায় স্বয়ং ভগবান্ আলম্বন ও তদীয় স্বরূপশক্তিগণ আশ্রয় হওয়ায় ইহা অতিপবিত্র ও অলৌকিক। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, দেব, শ্রুতি ও ঋষিগণ সীমাতিশায়ী কৃষ্ণরূপমাধুর্য্যে লালসান্বিত হইয়াছিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ তাঁহাদের লালসানুরূপ লীলা করিয়াছিলেন, এই কথা মনে রাখিয়াই এই মধুরলীলা আস্বাদন করিতে হইবে। তাহা হইলে অশ্রদ্ধা বা সন্দেহ আসিবার সম্ভাবনাই থাকিবে না। শ্রীরূপগোস্বামী এই সকল তত্ত্বকথা অতি বিশদভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা রসিকভক্তজনের আস্বাদ্য অমূল্য)

এই প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্যের অবতারণা করা আবশ্যক মনে করিতেছি

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনবিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত জনগণের নানাবিধ কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম একান্ত কামবাসনাপ্রসূত একথাও অনেকে বলেন। তাঁহারা প্রেম ও কামের স্বরূপ ভেদের তত্ত্ব অবগত নহেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।"

কাম আত্মকেন্দ্রিক, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই তাহার পর্য্যবসান। অনুরাগের আলম্বন বিভাব; নায়ক বা নায়িকা সেখানে ভোগের সাধন মাত্র, সাধ্য নহে। গোপীপ্রেম কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। গোপীপ্রেমে নিজের ভোগসিদ্ধির ইচ্ছা বিন্দুমাত্র নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসম্পাদনই একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ঐকান্তিক পরার্থপরতাই গোপীপ্রেমকে প্রাকৃত নায়কনায়িকার অনুরাগ হইতে পৃথক্ কোটিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আর একটি কথা—কামের স্বরূপ কি, ইহা বিচারণীয় বিষয়। ফ্রয়েড Sex বা জৈবকাম প্রবৃত্তিকে আদিম-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন এবং ইহা ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতির আদিম ও অকৃত্রিম উৎস। তাঁহার মতে অন্য সমস্ত প্রবৃত্তি যাহা সভ্যজগতের মানবচিত্তে উচ্চতর পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত, তাহা সমস্তই এই জৈবকামপ্রবৃত্তি হইতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে উদ্ভূত। প্রেম কামপ্রসূত, কামই তাহার বীজ। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ এবং বেদান্তসম্প্রদায় ইহার অন্যরূপ সমাধান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আত্মার স্বরূপভূত আনন্দেরই অভিব্যক্তির বিকৃত পরিণাম কামরূপে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মার স্তবে ইহার রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়াছে। "আনন্দচিন্ময়রসাত্মতা মনঃসু, যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং স্মরতামুপেত্য। লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।"

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের আনন্দচিন্ময়স্বরূপ প্রাণিগণের চিত্তে প্রতিফলিত হইলে কামের উদ্ভব হয়, এবং এই কামের লীলাপ্রভাবে তিনি নিখিলভুবন অবিরাম গতিতে অভিভূত করিতেছেন। এই কাম যদি না থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্টি হইত কি প্রকারে? Race Preservation বা প্রাণিসৃষ্টিধারা অব্যাহত রহিয়াছে ইহারই কল্যাণে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে দেখি—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি।" ইহাই সিসৃক্ষা, ইহারই উপব্যাখ্যান উপনিষদে দৃষ্ট হয়—"একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

বৈধ কাম সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ অনেক বিধি ও অর্থবাদ বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাবহারিক জগৎ, কুলধর্ম, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সমস্তই শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাহার মূল স্তম্ভ গার্হস্থ্য-ধর্ম, অর্থাৎ পতি পত্নীর বৈধ মিলন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলা অলৌকিক ও অপ্রাকৃত। ইহার মধ্যে সিসৃক্ষার প্রেরণা নাই। ইহা লোকোত্তর, নিত্য ও পারমার্থিক। ভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির সহিত নিত্যলীলায় অনুষক্ত। এই ভগবল্লীলারই প্রাকৃত জগতে প্রাণিগণের চিত্তে প্রতিবিম্বপাতে কামের উদ্ভব হয়। ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন—"এতস্যৈব মাত্রামুপজীবন্তি লোকে"। এই অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন অপরিসীম ব্রহ্মানন্দেরই বিন্দুমাত্র উপজীবন করিয়া জীবজগৎ বিদ্যমান থাকে। জগতের উৎপত্তিও এই আনন্দ হইতে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"। এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি উপাধিবশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া জীবজগতে অনুভূত হয়। ইহারই অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন লোকে স্পষ্ট ও স্পষ্টতরভাবে প্রকটিত হয়। ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি বেদান্তমতে জীবের ব্রহ্মের সহিত অভেদপ্রাপ্তিতে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে নিত্যলীলায় সংঘটিত হয়।

অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে, এই উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ অবশ্য অধ্যয়ন করা কর্তব্য। মধুররসের এত বিচিত্র বিশ্লেষণ, নায়কনায়িকার প্রকারভেদ, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির বিপুল সম্ভার অন্যকোন অলঙ্কারগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচিত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বোধগম্য হয় না। যাঁহারা সংস্কৃতভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ সহজবোধ্য হয় না। এই অতুলনীয় গ্রন্থের সরস সর্বজনবোধ্য সুললিত বঙ্গানুবাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনারায়ণ ঐ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমানের এই সহজ সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ বঙ্গভারতীর একটি অমূল্য সম্পত্তি। ইহার দ্বারা শ্রীমানের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অনুবাদ বঙ্গভাষারই কেবল শোভাবৃদ্ধি করিল না, অলৌকিকরসপিপাসু ভক্তরসিকজনের রসাস্বাদনের সুযোগকেও সহজ করিয়া দিল। শ্রীমানের এই অবদান গৌড়দেশবাসীর অভিনন্দনের বস্তু হইবে। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

আমি এই অনুবাদ দেখিয়া অতিশয়িত সন্তোষ লাভ করিয়াছি এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনারায়ণের সুদীর্ঘ আয়ু ও অপ্রতিহত সারস্বত সাধনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি। অলমধিকেন।

ডক্টর **সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়** এম্. এ., পি.-এইচ-ডি.
প্রাক্তন আচার্য নবনালন্দা মহাবিহার ও ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ
সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৭২
রাতমা, বীরভূম।

সূচী

মিথিলা, প্রয়াগ, নীলাচল ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে উঠলো সেই প্রেমের তরঙ্গ। মানুষের জীবন ও মন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল এক অভিনব মিলনের ছন্দে। মানুষের প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ভগবান্—আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন প্রেমিক-প্রেমিকার নিবিড় প্রণয়-বন্ধনে। সহজিয়া রীতির এক নবতম যুগ প্রবর্তিত হলো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রেমধর্ম-প্রবাহের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হলো এইখানে। মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন বাঙলার মনীষীরা—রূপ, সনাতন, বৃন্দাবন দাস, শ্রীজীব, মুরারি গুপ্ত, কর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস প্রভৃতি আরো অনেকে। তারপর একে একে আবির্ভূত হলেন প্রতিভাদীপ্ত কবিগণ। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম দাস, লোচনদাস, নরহরি, নরোত্তম দাস, শচীনন্দন প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার অমৃতরসধারায় সিক্ত করলেন বাঙলার মৃত্তিকা; পুষ্পিত হয়ে উঠলো বাণীকুঞ্জে সুরভিস্নিগ্ধ মল্লিকা-মালতী-কদম্ব-চম্পক। দিব্যজীবনের স্পর্শ লাগলো আকাশে-বাতাসে।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণের মধ্যে শ্রীরূপ ও সনাতনের নাম সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য। সনাতন ও রূপ উভয়েই ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত। সনাতন ছিলেন ভাগবতশাস্ত্রে বিশেষ প্রাজ্ঞ, আর শ্রীরূপ ছিলেন স্বভাবকবি ও রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। শ্রীরূপরচিত শ্লোকগুলি যেমন রসপ্লুত ও সুললিত ছিল, তাঁর হস্তাক্ষরও ছিল তেমনি অনবদ্য সুন্দর। শ্রীরূপরচিত শ্লোকে মহাপ্রভু তাঁর আপন অন্তরের প্রতিধ্বনি খুঁজে পেয়েছিলেন; মুগ্ধ হয়ে স্বরূপ দামোদরকে বলেছিলেন—'আমার অন্তরবার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?' তাঁর হস্তাক্ষর দেখেও অতীব প্রীত হয়ে, তিনি বলেছিলেন—শ্রীরূপের হস্তাক্ষর যেন মুক্তাকলাপের মতো সুন্দর।

"শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি।" চৈঃ চঃ ৩।১

ত্রিভুবনে নিত্যকিশোর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ, এবং সেই রূপই সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যানের বিষয়। ব্রজভূমে অবতীর্ণ হয়ে সেই ভুবনমনোমোহন পরমরূপময় মাধব অপ্রাকৃত মাধুর্যরসে নিত্যলীলা করলেন যমুনার কূলে কূলে প্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে। শ্যামের রূপই শ্রেষ্ঠরূপ, আর বৃন্দাবন ও মথুরাই (মধুপুরী) তাঁর শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি। তিনিই সর্বরসের আধার, মূর্তিমান

আনন্দস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। সেই রসের সারভূত নিগূঢ়তম আনন্দপ্রবাহ শৃঙ্গার রস, এবং সেই শৃঙ্গার রসের শ্রেষ্ঠ লীলানিকেতন বৃন্দাবন।

'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্ আদ্য এব পরো রসঃ॥'

বৃন্দাবনে এই মধুরতম রস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আপন রূপরাশি সম্ভোগ ক'রে হ্লাদিনী শক্তির তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অবগাহন করলেন। মধুর রসের ঘনতম পরিপাক পরকীয়া প্রেম। সেই রসোল্লাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় পরমাশক্তি, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাভাবস্বরূপিনী যোগমায়া শ্রীরাধা এবং গোকুলবাসিনী পদ্মনয়না গোপাঙ্গনাগণ হলেন তাঁর পরকীয়া নায়িকা। এই পরকীয়া প্রেমের রসোল্লাস যতই নিবিড় হোক, ব্রজভূমি ব্যতীত অন্যত্র সে প্রেমের বসতি নাই। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা ও ব্রজাঙ্গনাদের পক্ষেই সে প্রেম প্রযোজ্য, ভগবান্ ও ভক্তের জন্য কল্পিত। সমাজ-জীবনে ওই পরকীয়া প্রেমের আদর্শ সর্বথা পরিবর্জনীয়। বিষপান যেমন শঙ্করের পক্ষেই সম্ভব, মানবের পক্ষে নয়, পরকীয়া প্রেমও তেমনি বৃন্দাবনলীলাতেই সম্ভব, বাস্তব জীবনে নয়।

'পরকীয়াভাবে রতিরসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা তাহার অন্যত্র নাহি বাস॥' চৈঃ চঃ

কালধর্মে বৃন্দাবনলীলার সেই মাধুর্য ও মাহাত্ম্য অবলুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। মহাপ্রভু সেই অত্যুজ্জ্বল প্রেমভক্তিরহস্যের পুনরুদ্ঘাটন ও প্রচারের জন্য সনাতন ও শ্রীরূপকে প্রেমভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠালেন। সুপণ্ডিত ও পরমভাগবত সনাতন এবং প্রেমভক্তিরসপ্লুতহৃদয় স্বভাবকবি শ্রীরূপ ছিলেন তাঁর অতীব অন্তরঙ্গ। শ্রীরূপের কবিপ্রতিভায় তিনি পূর্বেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই প্রেমালাপ এবং গাঢ় আলিঙ্গনে তিনি শ্রীরূপকে অভিষিক্ত করেছিলেন। আপন হৃদয়ের অনুভূতি এবং প্রতিভাদীপ্ত অমেয় শক্তি শ্রীরূপের অন্তরে সঞ্চারিত ক'রে তিনি পরমমধুর প্রেমধর্মের বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন।

'কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥'

কবিকর্ণপুর—চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

বৃন্দাবন ছিল মথুরারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমের লীলাক্ষেত্র এই ব্রজভূমি—মথুরা ও বৃন্দাবন। মথুরায় তিনি লীলা-বিলাস করলেন লোকধর্মমতে গৃহীতা পত্নীদের সঙ্গে, আর বৃন্দাবনে লোকাতীত মধুররসের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা করলেন মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধা ও প্রেমময়ী গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে। মহাপ্রভু সেই নিত্যলীলার অবলুপ্তপ্রায় মাধুর্য প্রচারের ভার দিলেন সনাতন ও রূপ গোস্বামীর উপর। অভিন্নহৃদয় শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে পাঠাবার সময় তিনি অন্যান্য বরেণ্য ভক্তগণের নিকট তাঁর জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন, যাতে শ্রীরূপের অন্তরে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

'অদ্বৈত নিত্যানন্দপ্রভু এই দুইজনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমা দোঁহার কৃপাতে ইঁহার হয় তৈছে শক্তি।
যাতে বিরচিতে পারে কৃষ্ণরসভক্তি॥'

এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীরূপ ও সনাতন ছিলেন তাঁর অত্যধিক প্রিয়। বৃন্দাবন যাত্রাকালে তিনি নিজের প্রাণসম শ্রীরূপকে ব'লে দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমের পরকীয়া লীলা যেন বৃন্দাবনেই সীমাবদ্ধ থাকে; ব্রজভূমি ব্যতীত সে প্রেমলীলা যাতে অন্যত্র উদাহৃত না হয়, সেজন্য শ্রীরূপকে তিনি বিশেষভাবে সাবধান করে দিলেন।

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥"

শ্রীরূপকে তিনি শুধু সাবধান করে দিলেন, তাই নয়। বৃন্দাবনের অনাবৃত প্রেমলীলার সকল তত্ত্ব তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিলেন।

'কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্বপ্রান্ত। সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥'

প্রেম ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ হৃদয়ে ধারণ ক'রে, শ্রীরূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও প্রেমধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। সেই সব উপদেশামৃতের কথা স্মরণ ক'রে, শ্রীরূপ তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণবন্দনা ক'রে লিখেছেন—

'হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥' —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

শ্রীরূপ, সনাতন এবং শ্রীজীব ও অপর যে কয়েকজন কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী ভক্ত বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করলেন, তাঁদের সাধনা হলো ভগবৎ আরাধনায় আত্ম-নিবেদন এবং বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলামাধুর্যের অনুসরণে সাধন-ভজনের জন্য সেই নিত্যলীলার পুনঃপ্রচার। মহাপ্রভুর প্রভাবে অবলুপ্তপ্রায় বৃন্দাবন-লীলার মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবচেতনা ও প্রেমধর্ম পুনরুজ্জীবিত হলো। এই মহান্ কার্যে চৈতন্যদেবের নির্দেশে ব্রতী হলেন ছয় গোস্বামী, যাঁরা বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করলেন, এবং এই প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন।

'শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা হৈল পরকাশ॥'

সে যুগে ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৈধী উপাসনার রীতি প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র গৌড় এবং দাক্ষিণাত্যের কাবেরীতীরে ও মহানদ-উপকূলে আলবার বা আরওয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল রাগানুগা প্রেমধর্মরীতি। বিল্ব-মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং আরওয়ার সম্প্রদায়ের গীতাবলীতে রাগানুগার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু বাঙলার কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীতেও আমরা অপূর্ব মাধুর্যরসের ছবি পাই। এই বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরম আরাধ্য ভগবান্। নায়ক ও নায়িকার মতো প্রেমের অনির্বচনীয় সম্পর্কে যখন সেই ভগবান্ ও ভক্তের মধুরতম সংযোগ হয়, তখনই হৃদয়মন এক অপ্রাকৃত অভিরাম মধুররসের আস্বাদনে ভরপুর হয়ে ওঠে। হৃদয়ের উৎসমুখ খুলে গিয়ে মহাপ্রভুর অন্তরে এই অমৃতময় মধুররসের মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি ভাবে বিভোর হয়ে উঠেছিলেন। তারপর সার্ব-ভৌমের নিকট সন্ধান পেয়ে, তিনি দাক্ষিণাত্যের বিদ্যানগরে গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অন্তরঙ্গ আলাপে রামানন্দের নিকট 'কান্তাসাধ্য' প্রেমের নিগূঢ় রহস্যের কথা অবগত হয়ে, তাঁর অন্তরে প্রেমের প্রবল বন্যা বয়ে গেল। সেই প্রেমধর্মের বীজ তিনি শ্রীরূপের হৃদয়ে অঙ্কুরিত করলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ পেলেন প্রেমধর্মের গঙ্গোত্রীর সন্ধান।

'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার' এবং তন্মধ্যে 'রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি' এই তত্ত্ব রামানন্দের নিকট অবগত হলেও, মহাপ্রভু যে প্রেমধর্মের প্লাবন এনে

দিলেন, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রখাতে প্রবাহিত হলো। মহাপ্রভুপ্রবর্তিত প্রেমধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব-রীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে, এক অভিনব সহজিয়া রীতির প্লাবন এনে দিল। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের প্রেমধর্মের দ্বারা তিনি যে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সেই প্রেম-ধর্মের মূলধারার সঙ্গে তাঁর অমিয়হৃদয়ের অমৃতধারা মিশ্রিত হয়ে নববারি বর্ষণ করলো বৃন্দাবন-নীলাচল ও গৌড়বঙ্গে।

জীবনের সারবস্তু বা চরমকাম্য (summum bonum) আনন্দ (delight)। ভগবান্ এই আনন্দের পরিপূর্ণ স্বরূপ। পার্থিব জীবনে আমরা যে আনন্দের স্বাদ পাই, তার মধ্যে ভালবাসার আনন্দই সর্বাধিক (Love is the highest form of delight)। এই আনন্দই রস এবং রসই প্রেম। প্রেম ঘনীভূত হয়ে যখন প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু রাগ সঞ্জাত হয়, তখন অতিশয় দুঃখও চিত্তে সুখানুভূতি সঞ্চার করে।—রূপগোস্বামী।

ভালবাসার আবেশ ও ব্যাকুলতা (Sentiment and Emotion) জ্ঞান বা ভক্তির চেয়ে অনেক বেশী। জ্ঞান বা ভক্তি চিত্তকে সমাহিত করে, কিন্তু ভালবাসা মিলনপিয়াসী চিত্তকে উতরোল করে। বিরহের অগ্নিদাহ প্রেমিককে পাগল ক'রে তোলে। জ্ঞান বা ভক্তির মধ্যে শ্রদ্ধা এবং কিছুটা ভালবাসা থাকে; কিন্তু সেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মধ্যে থাকে ভয় এবং সম্মানবোধের ব্যবধান। প্রেমে এই ব্যবধানবোধ মুছে যায়। প্রেমের লক্ষণই হলো গাঢ় তৃষ্ণা। এই গাঢ় তৃষ্ণা নায়কনায়িকার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। বিরহের অগ্নিদাহে বা মিলনের মধু-উত্তাপে দুটি হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে একসঙ্গে মিশে যায়। বিচ্ছেদ এবং মিলনের ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়।

'দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥'

—চণ্ডীদাস

গোপাঙ্গনাদের এই প্রেম সাধারণ কাম নয়। প্রণয়াবিষ্ট অন্তরের আকুতিই এখানে নিবিড়তম বন্ধনে ভক্ত ও ভগবান্‌কে আবদ্ধ করেছে।

'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥' চৈঃ চঃ মধ্য। ৮ম পরিচ্ছেদ।

সর্বসাধারণের এই প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়ে, মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে পাঠিয়েছিলেন ব্রজভূমে নিত্যপ্রেমের লীলাভিরাম প্রচারের জন্ত।

ব্রজবাসকল্পে বৃন্দাবন যাত্রার অনেক পূর্বেই শ্রীরূপ গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। হংসদূত কাব্য শেষ ক'রে তিনি তাঁর বিখ্যাত বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক তুখানি রচনায় রত হয়েছিলেন। হংসদূত বিরহ কাব্যের একখানি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহাকবি কালিদাস বিরহী যক্ষের মর্মন্তুদ বেদনার গানে এক অভিনব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছিলেন মেঘদূতে। আর অমরকবি রূপ বিরহিণী রাধা ও গোপাঙ্গনাদের বিধুর চিত্তকুসুম চয়ন ক'রে মানসলোকের এক অপরূপ ছায়াপথ সৃষ্টি করলেন হংসদূতে। কালিদাস করেছেন বিরহী নায়কের মনোবিশ্লেষণ বেদনামন্থর মন্দাক্রান্তার যাতুমন্ত্রে; আর রূপ এঁকেছেন বিরহিণী নায়িকার চিত্তচ্ছবি বিধুরা শিখরিণীর অনবদ্য ছন্দতুলিকায়। নায়ক ও নায়িকা-চরিত্রের তুটি বিভিন্ন দিক্ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই তুখানি দূতকাব্যে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি হংসদূতের যে কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলাম, সেখানি বাঙলার বিদগ্ধসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে, এবং এ যাবৎ তার ছয়টি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। বাঙলার সুধীজনগণের প্রতি আমি সেজন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরূপ বৃন্দাবনলীলায় পরকীয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা, এবং ললিতামধবে শ্রীকৃষ্ণের পুরলীলা অর্থাৎ স্বকীয়া প্রেমের নিষ্ঠা ও মাধুর্য চিত্রিত করেছেন। বিদগ্ধমাধব অবিমিশ্র মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ। চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ ও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টিতে কবির অসামান্য মনীষা তুখানি নাটকেই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর নাটকরচনার কৃতিত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে চৈতন্তদেব বলেছেন—

"মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥"

যদিও বৃন্দাবনের অনাবৃত লীলাই শ্রেষ্ঠ প্রেমলীলা, তবুও দ্বারকার পুরলীলা যে সমভাবে অনূ্যন প্রেমমাধুর্যে পরিপূর্ণ, কবি তাঁর ললিতমাধব নাটকে সেই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন। তবে স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেম অনেক বেশী বাধাবিঘ্নসঙ্কুল। সামাজিক বিধিনিষেধের অনুশাসন ও লোকলজ্জার কঠিন নিগড়ে পরকীয়ার পদেপদে বাধা। কিন্তু স্বকীয়া প্রেম অবাধ, নিরঙ্কুশ ও

লোকধর্মতঃ স্বীকৃত, কাজেই সে প্রেমের স্ফূর্তি ও নিত্যলীলায় কোথাও কোন বাধাবিপত্তির নিগড় নাই। সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে পরকীয়া প্রেমের স্ফূর্তি ও মিলন হয় বলেই সে প্রেম স্বকীয়ার চেয়ে অনেক বেশী রসঘন ও মাধুর্যময়। ললিতমাধবে শ্রীরাধাকে তিনি স্বকীয়া নায়িকায় রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু সেই নায়িকার মুখ দিয়েই তিনি নাটকের সমাপ্তিতে বলেছেন—

'যা তে লীলাপদপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥'

অর্থাৎ সকল মাধুরীর সারভূত মাধুর্যরসময় মহামাধুরীপূর্ণ লীলাবিহারের মধুময়গন্ধবিস্তারকারী বনসমূহে পরিব্যাপ্ত বৃন্দাবনে ভাবমুগ্ধ অন্তরে চটুলা গোপীগণ তোমার সঙ্গে যে নিঃসঙ্কোচ ক্রীড়া করে, তা অন্যত্র অসম্ভব। সেখানকার ধন্যভূমিতে গোপীভাবে মুগ্ধচিত্তা আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, তুমি প্রফুল্লবদনে সুমধুর বেণুবিহার ক'রো।

এই উক্তিতে বৃন্দাবনের অনাবৃত প্রেমলীলার গৌরব অধিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভাবমুগ্ধ অন্তরে চটুলা গোপাঙ্গনাগণ নিঃসঙ্কোচ ক্রীড়ার সঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়ায়, তাঁর মুখকমল উল্লসিত হয়ে ওঠে; তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে বাঁশী বাজান।

নাটক দুখানির রচনা আরম্ভ হয় শ্রীরূপের ব্রজবাসযাত্রার এক বৎসর পূর্বে। তিনি যখন নীলাচলে সিদ্ধবকুল মঠে ছিলেন, তখন এই নাটক রচনায় রত ছিলেন। সেই সময় চৈতন্যদেব একদিন তাঁর নাটকের একটি পাতা হাতে নিয়ে, তাঁর রচিত শ্লোক পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৪৩৮ শকাব্দে নাটক দুখানি তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলে বিদগ্ধমাধব, এবং ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, জ্যৈষ্ঠমাসে চতুর্থী তিথিতে ভদ্রবনে ললিতমাধব নাটক শেষ করেন। নাটক দুখানি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পুরীধামে স্বরূপ দামোদর ও নাট্যকলাবিশারদ রায় রামানন্দ মিলিত হয়ে নিত্যানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, অদ্বৈতাচার্য ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতদের সঙ্গে ব'সে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। তাঁরা সকলেই শ্রীরূপের কবিপ্রতিভা ও নাটকের রসমাধুর্যের উচ্চ প্রশংসা করেন। "জগন্নাথ

বল্লভ" নাটকের রচয়িতা সুযোগ্য সমালোচক রায় রামানন্দ নাটক দুখানির সুখ্যাতি ক'রে বলেছিলেন—

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥'

হংসদূত, বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব ছাড়াও শ্রীরূপ আরো কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ এবং বিবিধ স্তব রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে দানকেলিকৌমুদী বা ভাণিকা, উদ্ধবসন্দেশ, লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং চাটুপুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি স্তব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই বলেছি, রূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি বিশ্বসাহিত্যের এক অভিনব সম্পদ। শুধু অভিনব বললেই যথেষ্ট হয় না। মননশীলতার দিক থেকে উজ্জ্বলনীলমণির সমকক্ষ গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে বিরল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এবং অনেকেরই ধারণা যে, উজ্জ্বলনীলমণি অলঙ্কারশাস্ত্রের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু বস্তুতঃ তা-ই নয়। প্রণয়াবিষ্ট নরনারীর মনঃসমীক্ষণের এক অপূর্ব ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন মহামনীষী রূপগোস্বামী তাঁর এই উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে। চুম্বক ও লৌহের আকর্ষণের চেয়েও পার্থিব জীবনে নরনারীর প্রণয়াকর্ষণ অনেক বেশী গভীর এবং দুর্বার। এই আকর্ষণ জীবনকে করে মধুময় এবং জীবনের পরপারে অতীন্দ্রিয় লোককে ভরে তোলে স্বপ্নময় মাধুর্যকল্পনায়। নরনারীর এই প্রণয়াকর্ষণ কেমন ক'রে সঞ্চারিত হয়, কেমন ক'রে দুজনের দু'জনকে ভাললাগে, এবং সেই ভাললাগা থেকে মুকুলিত হয় পূর্বরাগ, তারপর সেই পূর্বরাগ পরিণত হয় অনুরাগে, প্রেম ও প্রণয়ে, তারই নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন কবি তাঁর এই বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থে। কবি বলেছেন, একটিমাত্র গ্রন্থি থেকে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয়ে ইক্ষুদণ্ডের উদ্ভব হয়, এবং সেই ইক্ষুদণ্ডের বুকে রস সঞ্চারিত হয়ে, সেই রস থেকে হয় গুড়, খণ্ড ও শর্করা, তেমনি পূর্বরাগ থেকে ধীরে ধীরে অনুরাগ, প্রেম ও প্রণয়ের সঞ্চার হয়। এই পূর্বরাগই প্রেমের প্রথম অঙ্কুর।

'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলাতে প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥'

এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয় বৃন্দাবনের নিত্যলীলা—শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাদের অফুরন্ত প্রণয়রহস্য। কিন্তু নায়ক-নায়িকারূপে কল্পিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা ও ব্রজসুন্দরীরাই হয়ে উঠেছেন পার্থিব নরনারীর মূর্ত প্রতীক। তাঁদের প্রণয়লীলায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে মানুষেরই প্রেম, মিলন ও বিরহের আনন্দবেদনা। নায়কের ভালো লাগে নায়িকাকে, নায়িকা মুগ্ধ হয় নায়কের গুণে। উন্মীলিত যৌবনের কুসুমাঞ্জলি নিয়ে, নায়িকা এগিয়ে যায় তার দয়িতের পায়ে দেহমন সমর্পণ করতে ; সুমধুর আহ্বানে নায়ক অভিনন্দিত করে তার প্রেমাস্পদ নায়িকাকে, দুটি বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন-পিয়াসে, নায়িকার দেহমন আসঙ্গ-উল্লাসে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের তরঙ্গহিল্লোলে আস্বাদিত হয় মহাজীবনের অমৃতরাশি। জীব-জীবনের এই অমৃতস্বাদই ব্রহ্মস্বাদের প্রতিকল্প—'ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ'। কবি যেন অন্তরের অন্তস্তলভেদী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন প্রণয়মুগ্ধ সেই নরনারীর গোপন মনের প্রতিটি অনুভূতি, আশা ও আকাঙ্খা। বিদগ্ধগণ জীবনের এই আনন্দধারাকেই বলেছেন মধুররস। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি সেই উজ্জ্বলাখ্য মধুররস বা শৃঙ্গাররসের পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত আলোচনা।

পাত্র-পাত্রীভেদে প্রেমের দুটি ধারা নির্ণীত হয়েছে। একটি স্বকীয়া, আর একটি পরকীয়া। পূর্বরাগ উভয়বিধ প্রেমেই হয়, তবে তার অনুক্রমে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকে। ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসনমতে গৃহীতা নায়িকার সঙ্গে যে প্রেম, সে প্রেম স্বকীয়া ; আর পরোঢ়া বা অনূঢ়া নায়িকার সঙ্গে যে প্রেম, তাকে বলে পরকীয়া। পরকীয়া প্রেম সমাজনীতির বহির্ভূত এবং নানা বাধাবিঘ্নসঙ্কুল ব'লে, সেখানে মাধুর্যের ঘনত্ব স্বকীয়ার চেয়ে অনেক বেশী। রূপগোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে অসামান্য নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে এই স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমের নায়ক-নায়িকার মনঃসমীক্ষণ করেছেন ; বিশেষতঃ নায়িকার প্রকৃতি ও গোপনমনের প্রতিটি অনুভূতি তিনি দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত ক'রে, বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিভাব, আলম্বন, উদ্দীপন, পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, বিরহ, অভিসার, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধ, প্রবাস, মাদন, মোদন ও প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি বিচিত্র ভাব ও অবস্থাগুলি তিনি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। যদিও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রেমানুগা কৃষ্ণভক্তির পথনির্দেশ করা, তবুও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মানবমনের চিররহস্যময় যে

মধুরা রতি, সেই রতিই ধরা দিয়েছে তাঁর প্রতিটি শ্লোকে। প্রেমের যে সংজ্ঞার্থ (definition) তিনি নিরূপণ করেছেন, সংক্ষেপে তার চেয়ে যথাযথ নির্বচন আর হতে পারে না। তিনি বলেছেন—

'সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥'

নায়কনায়িকার যে ভাববন্ধন কোন অবস্থাতেই ধ্বংস হয় না, ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও যা অটুট থাকে, তাকেই প্রেম বলে। উজ্জ্বলনীলমণি সেই প্রেমের নিগূঢ় মনস্তত্ত্ববিষয়ক একখানি মৌলিক গ্রন্থ (A Psychology of Love and Sentiments)।

মধুরা রতির রসবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রূপগোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা শুধু কবিকল্পনা নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলেও দেখা যায় যে, তাঁর নির্ণীত প্রতিটী তত্ত্ব নিখুঁত, এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত। রূপগোস্বামী খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি। কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে তিনি নায়িকা-মনের এমন অনেক গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, যা বর্তমান শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানীদের পক্ষেও গবেষণার বিষয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে তিনি নরনারীর যৌন-মনস্তত্ত্বের যে বিস্তৃত আলোচনা ও সুগভীর মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) করেছেন, তার তুলনায় বিশ্ববিখ্যাত কামশাস্ত্রকার বাৎস্যায়ন, অধ্যাপক ফ্রয়েড, হ্যাভলক্ এলিস, উইলিয়ম স্টেকেল, মেরি কারমাইকেল স্টোপস ও য়ুং প্রভৃতি মনীষিগণের কামতত্ত্বের আলোচনা অনেক বেশী স্থূল ও অকিঞ্চিৎকর। কেশবদাস তাঁর 'অষ্টনায়িকা' গ্রন্থে নায়িকাদের প্রকৃতি, বয়স ও গুণানুসারে শ্রেণীভাগ করেছেন। কিন্তু প্রেম কেমন ক'রে সঞ্চারিত হয়, এবং কেমন ক'রে ধীরে ধীরে তা পূর্ণতা লাভ করে, সে সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা তিনি করেন নি। প্রণয়াবিষ্ট নায়ক-নায়িকার মনঃসমীক্ষণ রূপ গোস্বামী যেভাবে তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে করেছেন, তেমন বিস্তৃত পর্যালোচনা অন্যকোন গ্রন্থে আমরা পাই না। আনুমানিক ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়।

রূপ গোস্বামী বাঙালী ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ রূপেশ্বর ছিলেন গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে রূপেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পদ্মনাভ

পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। পদ্মনাভ ৫৯ বৎসর বয়সে গৌড়ের মন্ত্রিত্ব থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে, বর্তমান কাটোয়া মহকুমার সন্নিকটবর্তী ঝামটপুর-নৈহাটি (নবহট্ট) গ্রামে গঙ্গাতীরে বসবাস স্থাপন করেন। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেবের পুত্র কুমারদেব ছিলেন রূপের পিতা, এবং তাঁর মাতার নাম ছিল রেবতী দেবী। রেবতী দেবীর গর্ভে কুমারদেবের চার পুত্র জন্মলাভ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর লঘুবৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থের শেষে যে বংশপরিচয় দিয়েছেন, তাতে এই জ্যেষ্ঠতাত সম্পর্কে তিনিও কোন কথা বলেন নি। তবে কুমারদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র যে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, সে কথার উল্লেখ চরিতামৃতে পাওয়া যায়। সনাতনকে বন্দী করবার সময় গৌড়েশ্বর বলেছিলেন—

'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥
জীব পশু মারি সব বাক্‌লা কৈল খাস।
এথা তুমি কৈলে মাত্র সর্বকার্য্যে নাশ॥'

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, সনাতনের অগ্রজ বাক্‌লা মহাল খাস দখলে রেখেছিলেন এবং বাদশাহকে সেজন্য কোন রাজস্ব দিতেন না। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ তাঁদের পৈতৃক জমিদারি ছিল। কুমারদেব পূর্ববঙ্গে ওই জমিদারি স্থাপন করেন।

ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে যে, জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় কুমারদেব তাঁর পত্নীপুত্রদের নিয়ে নৈহাটি ছেড়ে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ মহালে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। এই মহাল বর্তমান বাখরগঞ্জ ও যশোহর জেলার অন্তঃপাতী এলাকায় অবস্থিত ছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য যশোহরের ফতেয়াবাদ গ্রামে তিনি বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

'নিজগণসহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতেয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াতহেতু তথা করিল আলয়॥'

১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর জন্ম হয়। রূপের অগ্রজ ছিলেন সনাতন, এবং বল্লভ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এঁদের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর, সন্তোষ এবং অনুপম। মহাপ্রভু ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়ে নামকরণ

করেন সনাতন, রূপ ও বল্লভ। সনাতন ও রূপ অল্পবয়সেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায় ও মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সংস্কৃত শিক্ষা শেষ হলে, উভয়ে সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ফার্সী পণ্ডিত ফকরুদ্দিন গাজীর নিকট রাজভাষা ফার্সী ও আরবি শিক্ষা করেন। সনাতন যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রতিভাবান্ ছিলেন, তেমনি অসামান্য ছিল তাঁর তেজস্বিতা। গৌড়েশ্বর তাঁর গুণপরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী বা 'সাকর মল্লিক' পদবীতে ভূষিত ক'রে প্রধান উপদেষ্টা বা সচিব (Chief Adviser) পদে নিযুক্ত করেন। তারপর রূপ এবং অনুপম (বল্লভ) অগ্রজের অনুসরণ ক'রে গৌড়েশ্বরের অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। শ্রীরূপ সুলেখক ছিলেন, এবং তাঁর হস্তাক্ষর অতিসুন্দর ছিল। মুন্সিয়ানা ও লিপিকুশলতার জন্য বাদশাহ তাঁকে 'দবীরখাস' বা খাসমুন্সী (Private Secr.tary) পদে নিযুক্ত করেন। মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পর সনাতন "দবীরখাস" পদে এবং শ্রীরূপ রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। কনিষ্ঠ অনুপম রাজ-সরকারে টাকশালের অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর রাজপদবীকে নাম ভ্রম করে স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর Vaisnav Literature of Medieval Bengal গ্রন্থে এবং ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর Indian Pholosophy গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৭৬১ পৃষ্ঠা) বলেছেন যে, স্বধর্ম ত্যাগ করে উভয় ভ্রাতা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ভ্রমের কিছুটা কারণ হয়তো ঘটেছে চৈতন্যভাগবত ও চরিতামৃতের কয়েকটি উক্তি থেকে। চৈতন্যদেবের নিকট সনাতন নিজের সম্পর্কে বলেছেন—আমি 'নীচেরকুর্পর' অর্থাৎ কুক্ষীগত দাস ; 'ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম। কুকর্মেতে সদা রত গোয়াক্রিন্দু ধর্ম'। কিন্তু ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ মুসলমান নয়। বহু প্রাচীন গ্রন্থে অহিন্দু-আচারযুক্ত জাতি শবর-কিরাত প্রভৃতিকেও ম্লেচ্ছ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। মুসলমানধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার বহুপূর্বে, অশুদ্ধভাষা প্রয়োগের জন্য অনাচারী অসুরদেরও ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ অবাধে বিচরণ করে না, সে দেশকেও ম্লেচ্ছ দেশ বলা হতো। যা যজ্ঞীয় নয়, তাও ম্লেচ্ছ ব'লে অভিহিত। সনাতন ও রূপ বাদশাহের দাসত্ব করতেন এবং হিন্দু-আচারভ্রষ্ট ছিলেন ব'লে নিজেদের ম্লেচ্ছ অর্থাৎ ব্রাত্য বলেছেন। কিন্তু

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে, রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকেও সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা প্রণয়ন করেছিলেন এবং রূপ গোস্বামী গৌড়ে বসে 'হংসদূত' রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, একথা মনে করবার কোন কারণ নাই। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর বংশপরিচয়ে তাঁদের ধর্মান্তরগ্রহণ সম্পর্কে কোন কথা উল্লেখ করেন নি।

সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পরে চৈতন্যদেব ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন ও রূপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে গৌড়ের সন্নিকটস্থ রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে উভয় ভ্রাতার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। মহাপ্রভু তাঁর নবধর্ম প্রচারের জন্য উভয় ভ্রাতাকে পরমসুহৃদ্ ও সহায়রূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের বৈষ্ণবপ্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়ে, ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন ও রূপ নামে অভিহিত করেন।

'আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।' চৈঃ চঃ

উচ্চরাজপদ ও সংসারধর্ম ত্যাগ ক'রে, মহাপ্রভুর নির্দেশে উভয় ভ্রাতা যখন প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য বৃন্দাবনে গেলেন, তখন সনাতন ও রূপের হাতে পূর্বার্জিত বহু অর্থ ছিল। রাজকার্য পরিত্যাগকালে শ্রীরূপের হাতে প্রায় চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সেই অর্থের অধিকাংশ তিনি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণের জন্য বিলিয়ে দিয়ে, অবশিষ্ট অর্থ দেবালয় ও দেবকীর্তির জন্য এবং রাজরোষে নিজের দণ্ড বন্ধের জন্য সঞ্চয় ক'রে বিশ্বস্ত বিপ্রস্থানে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধধনে।
এক কোঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥'

চৈঃ চঃ ২। ১৯।

সনাতন ও রূপ শেষজীবন অতিবাহিত করলেন বৃন্দাবনে। সেখানে মাধুকরী করে তাঁরা জীবনধারণ করতেন এবং অবসর সময় অতিবাহিত করতেন মদনমোহনের আরাধনায় ও প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য গ্রন্থরচনায়। পূর্বার্জিত অর্থের অবশিষ্ট যা ছিল, সে অর্থ ব্যয় করলেন মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও লুপ্তপ্রায় দেবালয়গুলির

সংস্কারে। সনাতন প্রতিষ্ঠিত করলেন মদনমোহনের নূতন মন্দির। শ্রীরূপ একের পর এক বৃন্দাবনের নিত্যলীলা সম্পর্কে নানা গ্রন্থ রচনা করলেন।

সনাতন ও রূপ বাঙালী হলেও তাঁদের গ্রন্থগুলি সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সারাভারতে অবাধ প্রচারের জন্যই হয়তো তাঁরা সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি যে, রূপ গোস্বামী ছিলেন চৈতন্যযুগের অদ্বিতীয় কবি। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিগণ প্রায় সকলেই বাঙলা ভাষায় কাব্য ও পদাবলী রচনা করেছিলেন। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবিগণের মধ্যে অবশ্য অনেকে সংস্কৃতভাষায় নাটক, কবিতা ও পদাবলী রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জয়দেব, উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ১২৪৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধরদাস তাঁর বিখ্যাত সদুক্তিকর্ণামৃতনামক সুবৃহৎ গ্রন্থে দু'হাজার সাতশো সংস্কৃত পদাবলীর সংকলন করেছিলেন। সেই পদগুলির প্রায় সবই বৈষ্ণব-প্রেমধর্মবিষয়ক এবং তার মধ্যে প্রায় পাঁচশো পদ বাঙালী কবিগণের রচিত। এই পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই মধুররসাত্মক। শ্রীধরদাস পাঁচটি প্রবাহে পদগুলিকে বিভক্ত করেছেন। এই পাঁচটি প্রবাহ হলো—

(১) অমর প্রবাহ, (২) শৃঙ্গার প্রবাহ, (৩) চাটু-প্রবাহ, (৪) অপদেশ প্রবাহ, এবং (৫) উচ্চাবচ প্রবাহ।

অমর প্রবাহের বিষয়বস্তু অমর বা দেবতাগণের কথা ; শৃঙ্গার প্রবাহে বর্ণিত হয়েছে বিবিধ প্রকৃতির নায়ক-নায়িকা, তাদের প্রেম, এবং বিরহ-মিলনের কথা। চাটুপ্রবাহে আছে নানাবিধ চাটু বা স্তুতি. অপদেশ প্রবাহে দেবতা, পশুপক্ষী, ভ্রমর ও পদ্ম প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হয়েছে ; এবং উচ্চাবচ প্রবাহে বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী আরো বিস্তৃতভাবে এই প্রবাহগুলিকে রূপায়িত করেছিলেন এবং শৃঙ্গার বা মধুররসের অনেকগুলি সংস্কৃতপদের সংকলন করেছিলেন। তিনি নিজেও তাঁর গীতাবলী নামক গ্রন্থে একচল্লিশটী সুললিত গীতিপদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই পদগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও, ঠিক বাঙলা ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদাবলীর মতোই সাবলীল ও মধুর। পদগুলির লালিত্য ও প্রসাদগুণ অনবদ্য। শ্রীরূপের অনেক পদ এখনো কীর্তন-পালাগানের সঙ্গে গাওয়া হয়। যেমন—

গোপযুবতি মণ্ডল মতি
মোহন কলগীত।

মুক্তসকল কৃত্যবিকল

যৌবত পরিবীত ॥

বিস্ফুরদিভ নায়কনিভ

মঞ্জুল জলখেল।

চঞ্চলকর পুষ্করবর

কৃষ্ণমুরতিচেল ॥

রত্নভবন সংনিভবন

কুঞ্জবিহিতরঙ্গ।

রাগবিরত যৌবতরত

চিহ্নবিলসদঙ্গ ॥

পদগুলি দেখে মনে হয় যেন বাঙলা ভাষাতেই রচিত। পরবর্তীকালে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীরূপের এই পদগুলি স্তবমালায় সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

শ্রীরূপের প্রিয়শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব তাঁর নিকট শাস্ত্র ও ধর্ম শিক্ষা করেন। পরবর্তীযুগে তিনি ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ও টীকাকার বলে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীরূপের সবগুলি গ্রন্থের এবং বৈষ্ণবধর্মের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির যে টীকা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, তা 'লোচনরোচনী' নামে খ্যাত। তাঁর সংকলিত 'ষট্সন্দর্ভ কারিকা' বৈষ্ণবধর্মের মহামূল্য গ্রন্থ।

রূপ একাধারে মধ্যযুগের অদ্বিতীয় কবি, সাধক এবং বৈষ্ণবধর্মের আদর্শ গুরু ছিলেন। তাঁর প্রচারিত রাগানুগা পদ্ধতি 'রূপানুগা' রীতি নামে খ্যাত। কেউ কেউ বলেন, মেবারের রাণী স্বনামধন্যা মীরাবাঈ রূপগোস্বামীর নিকট 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'-বিষয়ে দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর ব্রজবাসে অতিবাহিত করে, ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনেই সাধক কবির দেহাবসান হয়।

উজ্জ্বলনীলমণির বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য-বিশ্লেষণ ও মর্মমাধুরী আলোচনায় শ্রীজীব গোস্বামীর 'লোচনরোচনী', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'আনন্দচন্দ্রিকা', শচীনন্দন বিদ্যানিধির 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত সটীক উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। মূলগ্রন্থের প্রত্যেকটি সূত্র-শ্লোকের

বঙ্গানুবাদসহ সেগুলির মর্মার্থ তাৎপর্য আলোচনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে সব শ্লোকের দুই বা ততোধিক উদাহরণ আছে, গ্রন্থের কলেবর সংক্ষেপণের জন্য তার মধ্যে প্রয়োজনমতো একটি বা দুটি উদাহরণমাত্র লিপিবদ্ধ করেছি। মাঝে মাঝে শ্লোকের মর্মানুযায়ী, প্রচলিত দু'চারটি কীর্তন ও গীতিপদ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

রূপ গোস্বামীর গ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষায় রচিত ব'লে বর্তমান যুগের সঙ্গে সেগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই 'অনুবাদ ও মর্মমাধুরী' যদি রূপ গোস্বামীর সঙ্গে পাঠকসাধারণের পরিচয়স্থাপনে বিন্দুমাত্র সহায়তা করে, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে; আমি কৃতার্থ হবো।

কলিকাতা
মাঘীপূর্ণিমা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি ॥ ১ ॥

নিখিল বিশ্বে অনুক্ষণ চলেছে মিলনের মধু-মহোৎসব। চলেছে দেহ ও মনের খেলা—রূপ ও আনন্দের তরঙ্গ হিল্লোল। উৎসব! উৎসব চলেছে রাত্রিদিন দিকে দিকে রূপের আনন্দমেলায় নরনারীর মনোবিনিময়ে, দেহযমুনার তটে তটে।

দিকে দিকে এই অফুরন্ত রূপরাশি যাঁর অনন্ত রূপের বিকাশ, যাঁর স্বভাবধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দপ্রবাহে রাত্রিদিন বয়ে চলেছে অবিরাম উদ্দীপনার স্রোত, সেই সদানন্দ চিরন্তন আত্মার বন্দনা করি। আপনার নামে আপনি আকৃষ্ট সেই সনাতন রসজ্ঞ প্রভু জয়যুক্ত হউন। ১।

জীবজগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ রতিরসাস্বাদনে—প্রিয়া ও দয়িতের শৃঙ্গারমদির মিলনের মধু-মহোৎসবে। এই আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো আনন্দের তুলনা হয় না। পার্থিব এ আনন্দ অসীম, অপরিমেয় ও অনির্বচনীয়। রতিবিষয়ক এই গূঢ়তম মধুর রসের আলোচনাই উজ্জ্বলনীলমণি।

বিভাব

এই মধুর রসাস্বাদনের মূল উপাদানকে 'বিভাব' বলে। বিভাবই রতিরসাস্বাদনের হেতু। এই বিভাবের সংযোগ পরিণত হয় প্রেমে; প্রেম পরিতৃপ্ত করে নায়ক-নায়িকার চিত্ত।

বিভাবের আশ্রয় দুটি। একটি 'আলম্বন', অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে চিত্তে আকর্ষণ সঞ্চারিত হয়। অপরটি 'উদ্দীপন'—অর্থাৎ হৃদয়াবেগ বা উদ্দীপনা যা মধুর রতিরসাস্বাদনে নায়ক বা নায়িকার চিত্তকে আকৃষ্ট করে। 'আলম্বন' নায়ক বা নায়িকা (Object of love)। 'উদ্দীপন' প্রণয়ের উৎস—হৃদয়ের নবারুণ রাগ (Incitement)। এই উদ্দীপনা ধীরে ধীরে চিত্তকে নিয়ে যায় রতিরসাস্বাদনের সাগরতীরে।

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাব প্রভৃতি যখন কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত হয়, তখনই আস্বাদিত হয় মধুর রতিরস। এই মধুর রতিরসের পরিণতিকে মনীষিরা বলেন প্রেম। ২।

আলম্বন

উজ্জ্বলের আলম্বন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আর কৃষ্ণপ্রিয়াগণ হয় আলম্বন॥

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে নায়ক রূপে কল্পিত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা শ্রীরাধা ও অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা, যাঁরা কৃষ্ণপ্রিয়া। ৩।

পূর্বেই বলেছি, বিভাবের প্রথম বস্তু আলম্বন, দ্বিতীয় উদ্দীপন। নায়িকার চিত্ত প্রথম বিমোহিত হয় নায়কের রূপে বা গুণে। চোখে ভাল লাগে, মনকে স্পর্শ করে, তাই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় আবেগ, উদ্দীপনার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস। অনুকূল দখিণা বাতাসে মুকুলিত হয়ে ওঠে নারীমন। এই মুকুলিত হৃদয়াবেগের নামই পূর্বরাগ। পূর্বরাগ পরিণত হয় অনুরাগে। অনুরাগ সঞ্চারিত হলে দেহমন মিলন-পিয়াসী হয়ে ওঠে। রতিরসাস্বাদনের কামনায় উতরোল

হয়ে ওঠে নায়িকার সারা সত্তা। এই পুষ্পিত চিত্তবেগ যখন আনন্দঘন স্থায়িরসের সঞ্চার করে তখনই পরিণত হয় প্রেমে।

আলম্বনকে আশ্রয় করেই প্রেমের সূচনা হয়। তার পূর্ণতাও হয় সেই আলম্বনের বেদীতলে দেহমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে। মধুরা রতির সঞ্চার ও সম্ভোগ অধিকতঃ নির্ভর করে আলম্বন বা নায়কের চরিত্র এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর। নারী স্বভাবতঃ আত্মসমর্পণ-শীলা। কিন্তু পুরুষ তা নয়। পুরুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রেমের সার্থকতা বেশী নির্ভর করে। তাই রতিসম্ভোগের অনির্বচনীয় তথ্য অনুধাবন করতে হলে প্রথম জানতে হবে নায়ককে, তার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্যকে। অবশ্য নায়িকার চরিত্রও উপেক্ষনীয় নয়। নারীমনের গতি পুরুষমনের চেয়েও বিচিত্র। স্বভাব ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুরুষের চরিত্রকে যতভাবে বিশ্লেষণ ও বিভক্ত করা যায়, নারীচরিত্রের বিভাগ তার চেয়ে অনেক বেশী। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রতি-বিলাসে পুরুষের অধিকার ও সুযোগ যত অবাধ, নারীর তত নয়। লোকভয়, সামাজিক অনুশাসন ও পারিপার্শ্বিক বাধা নারীর জীবনগতিকে পদে পদে শৃঙ্খলিত করে। ফলে, নায়িকাচরিত্র হয়ে ওঠে অধিক জটিল। অবস্থাভেদে তার চরিত্রগত বিভেদ নিতান্ত স্বাভাবিক। তাই নায়িকা বিচিত্ররূপিনী।

উদ্দীপন

যা করপদদ্যুতি দরশনে নিগরব কোটি কোটি মনোমথ ভেল।
কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরলি ত্রিভুবন মন হরি নেল॥
অভিনব জলধর সুন্দর আকৃতি অনুখনহি পরম বিহার।
ত্রিজগত যুবতীক ভাগিবর সাধন মুরতি পিছি অবতার॥
সো অব নন্দকিনন্দন নাগর তোহে কর আনন্দভোর।
শ্রীশচীনন্দন ও নব মাধুরী বরণি না পাওল ওর॥

সুন্দর অভিনব নবজলধরকান্তি, যিনি অপূর্ব লীলার নিধিস্বরূপ, যাঁর পদদ্যুতি নিখিল কন্দর্পের রূপগরিমা হরণ করে, কটাক্ষ নারীগণের চিত্ত বিমোহিত করে, যুবতীগণের ভাগ্যফলরূপী সেই অনির্বচনীয় পুরুষ তোমার হর্ষ বিধান করুন। ৪।

নায়কের এতাদৃশ রূপ নায়িকাচিত্তে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এই উদ্দীপনার আধার যদি বাঞ্ছিত বিবিধ গুণের অধিকারী হন তবেই তাঁকে বলা চলে নায়ক বা প্রেমাস্পদ।

নায়কভেদ

নায়কের গুণাবলী

সুরম্য, মধুর, সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ, নবযৌবনান্বিত, সুবক্তা, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান্, সুপণ্ডিত, প্রতিভান্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, বরীয়ান্, কীর্তিমান্, নারীজন-মনোহারী, নিত্যনূতন, অতুল্য কেলিসৌন্দর্যবিশিষ্ট ও বংশীকণকারী বা সুমধুর সুরশিল্পী। ৫।

এই সকল মাধুর্যগুণের অধিকারীই সুযোগ্য নায়ক ও মধুর রসাস্বাদনের শ্রেষ্ঠ আধার বা আলম্বন। ৬।

নায়কের শ্রেণীভেদ

চরিত্রগত গুণানুযায়ী নায়ককে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদাত্ত ও ধীরোদ্ধত।

বিদগ্ধ, নবযুবা, পরিহাসবিশারদ ও নিশ্চিন্ত প্রকৃতির নায়ককে ধীরললিত বলে। এঁরা প্রায়ই প্রেয়সীর প্রেমানুসারে বশবর্তী হন। যথা—কন্দর্প।

শান্তস্বভাব, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক, ধার্মিক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত নায়ককে ধীরশান্ত বলা হয়। যথা—যুধিষ্ঠির।

ধীরোদাত্ত নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, সুদৃঢ়ব্রত,

নিরহঙ্কার, গূঢ়গর্ব ও আত্মপ্রত্যয়বিশিষ্ট, সুসত্ত্বভৃৎ বা বলবিশেষ-সম্পন্ন ও অপরাজেয়। যথা—শ্রীকৃষ্ণ, রঘুনাথ।

মৎসরী বা অন্যশুভদ্বেষী, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষণস্বভাব, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘাকারী অথচ ধীর নায়ককে বলে ধীরোদ্ধত। যথা—ভীম সেন।

এই চতুর্বিধ নায়ককে আবার সম্বন্ধ এবং সংযোগানুযায়ী দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: পতি ও উপপতি।

পতি

শাস্ত্রমতে বা বেদোক্ত বিধানানুযায়ী যিনি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং লৌকিক সমাজবিধানে সেই কান্তার ভর্তার আসনে অধিষ্ঠিত, তিনি পতি।

বিক্রমের দ্বারা ভীষ্মকরাজের পুত্র রুক্মিকে পরাজিত করে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় এনে উৎসবোচ্ছলিত পৌরমণ্ডল সমক্ষে তার পাণিগ্রহণ করলেন। বেদোক্ত বিধান অনুযায়ী এখানে নায়ক রুক্মিণীর পতি। ৭।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর সঙ্গে যুগলভাব অঙ্গীকার করে যজ্ঞ-ভূমিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার্থ ধনদান করেন এবং নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগশৃঙ্গারে রত হন। এই সহধর্মিনীসঙ্গবিহার ও ব্রত উদ্‌যাপন বিষয়ে তাই তিনি রুক্মিণীর পতি। ৮।

যে সব গোকুল-কুমারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ভরে মহামায়ার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—হে কাত্যায়নি! নন্দসুতকে যেন পতিরূপে পাই, এবং মনে মনে সেই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, বিধিমতে নন্দতনয় তাঁদেরও পতি। ৯।

রুক্মিণীর পাণিগ্রহণের পূর্বে যে ব্রজকুমারিকাদের সঙ্গে লীলাচ্ছলে মাধবের পরিণয়-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ধর্মতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরও পতি। ১০।

এ বিধান অবশ্য শুধুমাত্র কুমারী নায়িকাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লৌকিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত না হয়েও, যদি লীলাচ্ছলে কোন কুমারীর সঙ্গে নায়কের মাল্যদান, অঞ্চলবন্ধন বা দেহ বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে নায়ক সেখানেও ধর্মতঃ পতিরূপেই পরিগণিত।

উপপতি

ইহলোক পরলোক না করি গণন।
নিজরাগে করে যেই ধর্মের লঙ্ঘন॥
পরকীয়া নারীসঙ্গে করয়ে বিহার।
সদা প্রেমবশ, 'উপপতি' নাম তার॥

ইহলোক, পরলোক ও পাপপুণ্যের ভয় না রেখে, অনুরাগবশে যে প্রেমিক পরকীয়া নারীর সঙ্গে বিহার করেন, তিনি উপপতি। ওই রমণীর প্রেমই তাঁর সর্বস্ব। প্রেমের জন্য নায়ক লোকভয়, ধর্মাধর্ম—সবকিছুই তুচ্ছ করেন।

রাইক মন্দির আসি করু নাগর সংকেত কোকিল বোল।
শুনি ধনি উঠত দ্বার যব খোলই হৈয়ল কঙ্কণ রোল॥
দেখ দেখ নাগর, আনন্দভোর।
কঙ্কণধ্বনি শুনি মনে অনুমানই রাই মিলব মঝু কোর॥
জটিলা জাগরি তৈখনে বোলত কো করু কঙ্কণ নাদ।
শুনি ধনি চমকিত মন্দিরে সুতল নাগর গণল প্রমাদ॥
পুনঃ ধনি আসি মিলব মঝু সঙ্গতি ঐছন মনোরথ ভেল।
রাধা মন্দির কোণ বিটপিতলে জাগরি যামিনী গেল॥

নিশিথ অভিসারে রাধার গৃহপ্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ যখন কোকিল নিনাদের সংকেত করলেন, চুপিচুপি রাধা বেরিয়ে আসছিলেন দ্বার খুলে। হঠাৎ তাঁর কঙ্কণের শব্দ হল। শব্দ শুনে জটিলা জেগে উঠল—কে!—কে?

মিলনপিয়াসী নায়ক ও নায়িকার উদ্বেলিত হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠল। রাধা শয়ন কক্ষে ফিরে গেলেন, শ্রীকৃষ্ণের অসহ রাত্রি কেটে গেল প্রাঙ্গণের কোণে বিটপিছায়ার অন্ধকারে পুনর্মিলনের অধীর প্রতীক্ষায়। ১২।

শৃঙ্গারের মাধুর্য অধিক ইহাতে। ১৩।
উপপতি রসশ্রেষ্ঠ ভরতের মতে ॥ ১৪ ॥

যে আনন্দের স্বাদলাভের জন্য নানা বিধিনিষেধ ও বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করতে হয়, যেখানে ইচ্ছামাত্র অবাধে রতিসম্ভোগ সম্ভব নয়, লোকভয় ও সমাজভয় প্রতিনিয়ত প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তকে নিপীড়িত করে, সেখানেই মিলনের আনন্দ অপরিমেয়। তাই পরকীয়া প্রেমের উত্তাল তরঙ্গময় বিপদ ও বাধার সাগর পার হয়ে যে মিলন হয়, সেই মিলনে মন্মথের 'পরমা রতি' আস্বাদিত হয়। ১৫।

লোকশাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ।
প্রচ্ছন্ন কামুক যাথে দুর্লভ মিলন ॥
তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজশাস্ত্রে এইমত কয় ॥

উপপতি সঙ্গবিহারের এই পরমা রতি লোকচক্ষে লঘু ও নিন্দিত হলেও, শৃঙ্গার রসের যে পরিতৃপ্তি এই মিলনে আস্বাদিত হয়, তা অতুলনীয়।

ইহাতে লঘুতা যেই কবিগণ কয়।
প্রাকৃত নায়কে সেহ, কৃষ্ণ প্রতি নয় ॥
রসের পরমাকাষ্ঠা রতি আস্বাদন।
অবতার কৈল হরি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৬ ॥

ত্রিভুবনের আশ্রয় শিখিপুচ্ছবিভূষণ শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাররসসর্বস্ব হয়ে নরদেহে এই শ্রেষ্ঠ রসসম্ভোগকে আশ্রয় করলেন। ১৭।

উল্লিখিত পতি ও উপপতি প্রত্যেকের বৃত্তিভেদে নায়ক চরিত্রকে

অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৮।

অনুকূল

একনারী রত হয় অন্য নারী ছাড়ি।
সীতার প্রতি রাম অনুকূল নামধারী ॥ ১৯॥
রাধায় অনুকূল হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অন্য নারী ছাড়ি হৈল রাধার শরণ ॥ ২০ ॥

পত্নীপ্রেমানুরক্ত রামচন্দ্রের জীবনে সীতা ভিন্ন অন্য নারীর স্থান ছিল না, তাই তিনি সীতার অনুকূল পতি। পত্নী এবং অন্যান্য নায়িকাসঙ্গ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র রাধারাণীর প্রেমকেই সার করেছিলেন। তাই তিনি শ্রীরাধার প্রেমমুগ্ধ অনুকূল উপপতি। শ্রীমতীর প্রতি বৃন্দার উক্তি—

গোকুল নগরে চতুরা নাগরী কত না যুবতী নারী।
তা সনে বিহরে কখন কখন নন্দের নন্দন হরি ॥
রাই তুঁহু সে জানসি রস।
সকলের কাছে যেমন তেমন হরি সে তোমারি বশ ॥

কত শত বুদ্ধিমতী, সুরসিকা, সৌন্দর্য-উজ্জ্বলা কামিনী এই গোকুলে আছে। কিন্তু হে চম্পকবর্ণা! তুমি পুণ্যবতী, তাই তোমার বিরহে অধীর হয়েও মুরারির চপল দৃষ্টি অন্যকোন রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ২১।

ধীরোদাত্ত-অনুকূল

যে নায়ক গম্ভীরপ্রকৃতি, বিনয়ান্বিত, ক্ষমাগুণশালী, দৃঢ়ব্রত, করুণ, আত্মশ্লাঘাশূণ্য এবং উদারচিত্ত, তাঁকেই ধীরোদাত্ত-অনুকূল নায়ক বলা যায়। ২২।

একদিন কৃষ্ণকে রাধার চিন্তায় তন্ময় দেখে, ললিতা দূর থেকে চিত্রাকে দেখিয়ে বলেছিলেন—ব্রজে নীলোৎপল নয়না যত রমণী আছে, তারা সকলেই কটাক্ষকৌশলে কন্দর্পকলা-নটীর প্রস্তাব

বারবার জ্ঞাপন করেছে মাধবের কাছে। কিন্তু কৃষ্ণ এত দৃঢ়ব্রত যে, শ্রীরাধার প্রেমব্রতে তাঁর কোন শৈথিল্য ঘটে না। ২৩।

ধীর-ললিতানুকূল

রসিক, নবযুবা, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত, প্রেয়সীর বশীভূত এবং প্রেয়সীর প্রতি অনুকূল নায়ককে ধীর-ললিতানুকূল নায়ক বলে।

যথা, নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

অনুদিন বিহরয়ে রাইক সঙ্গ। মানস নিমগন মনসিজ রঙ্গ॥
যমুনা তীরহি সতত বিহারি, পুণবতী ভৈগেল ভানুকুমারী॥
উপবন তরু সব করু বিভাসিত। শ্যাম জলদ তাহে রাই তড়িত॥ ২৪॥

ধীরশান্তানুকূল

শান্তস্বভাব, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদিগুণযুক্ত নায়ক যখন প্রেয়সী বা নায়িকার প্রতি প্রেমানুকূল ও একনিষ্ঠ হয়, তখন তাঁকে ধীরশান্তানুকূল নায়ক বলে।

ধীর, শান্ত, অনুকূল নায়ক অতি বিনয়ের সঙ্গে কৌশলে তাঁর প্রণয়াস্পদের সঙ্গে মিলিত হন। বিরুদ্ধ পরিবেশেও অচঞ্চল ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে প্রিয়ার চিত্তবিনোদনে কৃতকার্য হন।

শ্রীমতীকে সম্বোধন করে বিশাখা একদিন কানে কানে বলেছিল—হে মৃগাক্ষি! দেখ, সূর্যবন্দনার ছলে শ্রীকৃষ্ণ কেমন সুকৌশলে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দৃষ্টি ক্ষমাগুণে পরিপূর্ণ, বাক্য বিনয়ান্বিত, ধীরোজ্জ্বল মূর্তি যেন ধৈর্যগুণের আধার। এই শান্ত, উদার ও বিনয়ান্বিত মূর্তি দেখে জটিলার মনে সন্দেহের আর কোন অবসর রইল না। ২৫।

ধীরোদ্ধত-অনুকূল

যে ব্যক্তি মাৎসর্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষপরবশ, উদ্ধত এবং আত্মশ্লাঘাকারী অথচ প্রেমে অবিচলিত মানস, ক্ষণকালের

জন্যও প্রিয়তমা ব্যতীত অন্য প্রমদাজনের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেন না, তিনি ধীরোদ্ধত-অনুকূল নায়ক ॥ ২৬ ॥

ললিতাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন —

ললিতে, শুন মঝু সত্য এ বাণী।
রাইক পরিহরি আন যুবতীসহ স্বপনহি প্রেম নাহি জানি ॥
কেবল রাইত প্রেম হাম জানত রাই প্রাণধন মোর।
কো কহ সদ্‌গুণ সাগর নাগর আন যুবতী রসভোর ॥
তুঁহু বর চতুরী সবহু মঝু জানসি সম্বরু কোপতরঙ্গ।
মনমথ বিশিখে সতত তনু দাহই তুরিত দেহ রাই সঙ্গ ॥

দক্ষিণ

যে নায়ক পূর্বে এক নারীতে আসক্ত হয়ে, পরে অন্য নারীর প্রতি অনুরাগী হন, কিন্তু পূর্বপ্রণয়িনীর গৌরব, ভয় ও দাক্ষিণ্যাদি পরিত্যাগ করতে পারেন না, তাঁকে দক্ষিণ নায়ক বলা হয়।

নান্দীমুখী বলেছিলেন—চন্দ্রাবলী, তোমার প্রেমে আজও তাঁর হৃদয় সিক্ত। এখনো তিনি তোমার ভয়ে ভীত। তুমি যেন অন্যের কথায় প্রণয় ভঙ্গ করো না।

কুন্তলেশ্বরসুতা, পালী প্রভৃতি পুরসুন্দরীদের কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসেছিলেন। ২৭।

কিম্বা থাকে প্রেয়সীর প্রেমেতে সমান।
দক্ষিণ শব্দের হয় তাহাতে আখ্যান ॥

নান্দীমুখীকে কুন্দলতা বলেছিল—

দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ যখন সিংহাসনে বসেছিলেন এবং রুক্মিণীকে প্রসন্ন করে সুখে দিন যাপন করছিলেন, তখন একদিন এক দূত এসে সংবাদ দিয়েছিল যে,

পদ্মা করত হি নয়ন তরঙ্গ। কমলা জৃম্ভই মোড়ই অঙ্গ ॥
তারা বরশই ভুজ পরকাশি। শ্রুতিমূল কণ্ডুন করল সুকেশী ॥

শৈব্যা নীবি-উপর ধরুকর। বহুতর নারী করয়ে রসভর ॥
একই নাগর বহুতর নাগরী। কুণ্ঠিত মানস হৈয়ল মুরারি ॥

পদ্মার নয়নে তরঙ্গময় বিলোল দৃষ্টি। কমলা বারবার জৃম্ভন ও অঙ্গ মোড়ামুড়ি করে। তারা দু'হাত তুলে আলিঙ্গন-সংকেত ও কুচযুগ প্রদর্শন করে। সুকেশী গণ্ডদেশ কণ্ডুয়ন করে এবং শৈব্যা নীবিবন্ধন উন্মোচনের সংকেত করে। এই সকল সংবাদ দূতমুখে শুনে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব-নায়িকাদের মানসিক অবস্থা বুঝে কুণ্ঠিত হলেন। পদ্মা, কমলা, তারা, সুকেশী ও শৈব্যা প্রমুখ নায়িকাগণ মিলনা-কাঙ্খায় চঞ্চল ও অনঙ্গ যাতনাবিধুর হয়ে উঠেছে শুনে, তাঁর অন্তরে দাক্ষিণ্য জেগে উঠল। ২৮।

যে নায়ক তাঁর বর্তমান নায়িকাদের সঙ্গে সম্ভোগ-আনন্দে রত থেকেও পূর্বনায়িকাদের প্রতি দাক্ষিণ্যহীন হতে পারেন না, তাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ শিথিল হয় না, অন্তরে প্রেম ও সমবেদনা সমভাবে বজায় থাকে, তাঁকে 'দক্ষিণ' নায়ক আখ্যা দেওয়া হয়।

শঠ

যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়ভাষী কিন্তু পরোক্ষে অতি অপ্রিয় কাজ করেন, প্রণয়িণীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন, কিন্তু গোপনে অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম করেন ও পূর্বপ্রণয়িণীকে হেয় করেন, তিনি শঠ বা মিথ্যাচারী। ২৯।

শ্যামার কোন সখী নান্দীমুখীকে বলেছিল —

জাগরে বোলল তুঁহু মঝু প্রাণ, স্বপন হি তাকর বদনে শুনি আন।
পালি! পালি! বলি কহয়ে কতবার, বুঝল তা সহ করয়ে বিহার ॥
শ্যামাসখী শুনল স্বপন কি ভাব। ঘনঘন ছোড়ই দীঘল নিশাস ॥
এ মধু রাতি তিন যাম পরিমাণ, জাগরি হৈয়ল যুগ সমান ॥ ৩০ ॥

ধৃষ্ট

অন্য তরুণী সম্ভোগের লক্ষণ অঙ্গে সুস্পষ্ট তবুও নির্ভয়ে এগিয়ে আসেন প্রিয়ার কাছে, মিথ্যা বচনে অতিশয় দক্ষ; রতিচিহ্ন প্রকট থাকা সত্ত্বেও প্রণয়িনীর কাছে নানাভাবে সেগুলি গোপন করার চেষ্টা করেন, সে নায়ককে ধৃষ্ট বলা হয়। ৩১।

খণ্ডিতা রসে শ্যামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

কাঁহা নখ-চিহ্ন চিনলি তুঁহু সুন্দরী, এ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কাহে গঞ্জসি, মৃগমদ পদ পুন এহ॥
গৈরিক হেরি কিয়ে কর মানসি, উরুপর যাবক ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি, নিন্দসি সিন্দুর করি অনুমানে॥

শ্যামা, বিপরীত ধারণা করছো কেন? আমার অঙ্গের এই দাগ নখের বা সিঁদুরের নয়, ঘন-কুঙ্কুমের রেখা। আলতার রঙ কি তুমি চেনো না? এ রক্তরাগ আমারই গৈরিক বসনের। কস্তুরী চিহ্ন দেখে তোমার কাজল বলে ভ্রম হচ্ছে? কি আশ্চর্য! তুমি যুবতী, তাই তোমার মনে এই সব বিপরীত ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

নায়কের প্রকৃতিভেদ

প্রথমতঃ নায়ক চার প্রকার। যেমন,—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীরশান্ত। এঁদের প্রত্যেকে আবার পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভেদে বারো প্রকার। এই দ্বাদশ নায়ক আবার পতি ও উপপতি ভেদে চব্বিশ প্রকার হয়। তা ছাড়া, অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারটি পর্যায়ে ভাগ করে প্রকৃতিভেদানুযায়ী নায়ককে মোট ছিয়ানব্বইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ৩২।

অন্যান্য রসশাস্ত্রে 'ধূর্ত' প্রভৃতি যেসব নায়কভেদ কথিত আছে, সেগুলি নাট্যশাস্ত্রকার মহামুনি ভরত কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায়, উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে গৃহীত হয়নি।

সহায়ভেদ

সখা

প্রণয় বিষয়ে নায়কের পঞ্চবিধ সহায় থাকে। এঁরা নায়ক বা নায়িকার সখা। বিভিন্ন অবস্থায় এঁদের সাহচর্য নায়কের উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করে। রসশাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ সহায়ক চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও নর্মসখা নামে পরিচিত।

সহায়কের গুণ

নায়কের সহায় হতে হলে নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যথা—পরিহাসবাক্যে নিপুণ, নায়কের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগযুক্ত। দেশকালপাত্র বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। প্রণয়িনী রুষ্ট হলে, মধুর বাক্যে তাকে প্রসন্ন করে তার মানভঞ্জন করতে পটু ও গূঢ় মন্ত্রণাদানে বিশারদ।

এইসব গুণ যাঁদের থাকে, তাঁরাই নায়কের প্রকৃত বন্ধু ও সহায়। তাঁদের সাহায্যে নায়কের প্রেমের পথ সুগম হয় এবং সহসা প্রণয়ভঙ্গ ঘটে না।

চেট বা চেটক

যে ব্যক্তি সন্ধানী ও সুচতুর, যাঁর কার্যকলাপ সহজে কেউ জানতে পারে না, নিজেকে যিনি সর্বদাই রহস্যাবৃত করে রাখেন, সকল বিষয়ে গূঢ়রূপে কার্য সম্পন্ন করেন এবং আলাপে ও বাক্-পটুতায় তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন, তাঁকে চেট-সখা বা চেটক বলা হয়।

কৃষ্ণসখা ভৃঙ্গারকের উক্তি —

রাইক বচন কহলু বহু চাতুরি শুন শুন সুন্দরী রাই।
এ হেন অপরূপ কভু নাহি হেরল পেখহ বাহিরে যাই॥

উপনীত শরত সময় ইহ সুন্দর শারদ তরু বিকশিত।
অপরূপ অসময়ে কুসুমিত মাধবী কুঞ্জ কুহর বিভূষিত ॥
এ মঝু চাতুরী বচন শুনি সুন্দরী আওল কুঞ্জকি পাশ।
অব তুঁহু যহি রাইসহ মিলহ, পূরিব মনসিজ আশ ॥

ভৃঙ্গারক শ্রীমতীর কাছে কুঞ্জবনের অপ্রত্যাশিত শোভা ও শরৎকালীন মাধবী পুষ্পবিকাশের সৌন্দর্য বর্ণনা করে তাঁকে কুঞ্জ-দর্শনে পাঠিয়েছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিয়েছিলেন— সখা, কুঞ্জে যাও, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কৌশলে শ্রীরাধাকে আমি পাঠিয়েছি সেই কুঞ্জবিতানে।

বিট

বেশভূষার উপচার সম্পর্কে যিনি কুশল, ধূর্ত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি-কৌশলযুক্ত, পরিবারবর্গ যাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে না এবং যিনি কামতন্ত্রকলাবিদ্ অর্থাৎ বশীকরণতন্ত্র ও মন্ত্রৌষধি ইত্যাদি প্রয়োগে সুনিপুণ, তিনিই বিট নামে অভিহিত।

মানিনী শ্যামার প্রতি বিট সখার উক্তি —

এ ব্রজমণ্ডলে যত রহু নাগরী নিকর হাম সব জান।
সো বরনাগরী ইহ নাহি পেখতু যা মঝু বাত করে আন ॥
গোকুল ভূপতি নন্দননাগর তাকর হাম বর সঙ্গী।
সবিনয় ভাষে সোহ ইহ যাচই ছোড়হ কোপকি ভঙ্গী ॥
যাকর মুরলী সকল ব্রজনারীক লাজ ধৈরয হরি নেল।
সো হরি মানভয়ে তুঁহু তেজলি, ভাল যুকতি নাহি ভেল ॥

ব্রজমণ্ডলে সকল মৃগনয়নাই আমায় জানেন, সকলেই আমার কথা মেনে চলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন আমার প্রিয়সঙ্গী। যাঁর মুরলীধ্বনি শুনে নিখিলযুবতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তাঁকে সামান্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করো না। আমার অনুরোধ রাখো ২।

বিদূষক

যে ব্যক্তি ভোজনে অতি লোলুপ, কলহপ্রিয় এবং অঙ্গভঙ্গিমা ও বাক্যবিকৃতিদ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি করেন, তাঁকে বিদূষক বলা হয়। যেমন বিদগ্ধমাধবে মধুমঙ্গল, গোপগণের মধ্যে বসন্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ।৩।

বিদূষক ব্যক্তি নায়কের সখা হলে প্রণয়বিষয়ে সহায় হন ও আনন্দ বর্ধন করেন এবং নায়ক-নায়িকার মিলন-সংঘটনে সর্বদাই সাহায্য করেন।

শ্রীমতীর প্রতি বিদূষক বসন্তের উক্তি —

তুঁহু যারে আদরে নিতিনিতি পূজসি দেওসি কত উপচার।
সো অব দিনকর আদরে দেওল মুঝে পঙ্কজ উপহার॥
মানিনি, পঙ্কজে হাম নাহি নেল।
না করি সিনান আনি মুঝে দেওল ইথে লাগি দূরে ফেলি দেল॥
সো পরিচারণ তাহে ঘুচায়নু, রোখে ভরল তনু জোর।
সো অব হাম তোহে কত সাধই, বচন না মানসি মোর॥

দেবি! তোমার অভীষ্টদেব সূর্য প্রভাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম আমায় উপহার দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ক্রোধভরে সে বিকশিত পদ্ম অবজ্ঞা করেছি, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি মাটিতে। তোমার অভীষ্টদেব আমার উপাসনা করেন, আর তুমি আমার কথা শুনবে না!

হে স্মিত-অধরা! আমি তোমায় অভ্যর্থনা জানাই। প্রসন্ন হয়ে তোমার হাসির পুষ্প ছড়িয়ে দাও। হে মানিনি! অভিমান ত্যাগ কর। আমি যে গোকুলচন্দ্রের বিমান, তাঁরই ইচ্ছাবাহী মনোরথ। রাজা রথারূঢ় হলে আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে হয়। হে রূপগর্বিণী, রূপগর্বে কি তুমিও মৎসরী হলে? তাই, সহর্ষে কুসুম বর্ষণ করে আমার অভীষ্ট পূর্ণ করছো না।

পীঠমর্দ

যে ব্যক্তি নায়কতুল্য গুণবান হয়েও নায়কেরই অনুবৃত্তিকারী হন, তাঁকে পীঠমর্দ বলে। যেমন, কৃষ্ণসখা শ্রীদাম। নিজে অশেষ গুণরাশির অধিকারী হয়েও তিনি ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অতিবড় সহায় ছিলেন। ৪।

শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপে সন্দিহান ও অসন্তুষ্ট হয়ে গোবর্ধনমল্ল তাঁর স্ত্রী চন্দ্রাবলীকে সাবধান করেছিলেন, নিষেধ করেছিলেন যমুনা-পুলিনে যেতে।

সে কথা শুনে, কৃষ্ণসখা শ্রীদাম গোবর্ধনমল্লকে বলেছিলেন —

সুন্দর কালিন্দীতীরে মুকুন্দ বিহার করে, শুনি সব ব্রজনারীগণ
বিশ্বাস করিয়া তায়, সে লীলা দেখিতে ধায়, কৃষ্ণলীলা বড় বিস্মাপন ॥
সকলেই যায় তাহে, একা চন্দ্রাবলী নহে, সত্য জান আমার বচন।
তার প্রিয় সখা মোরা, নিতান্ত নির্বুদ্ধি তোরা, তেই কহি এ হিত বচন ॥
গোবর্ধন, তুমি না করিহ অন্যমন।
গিরি গোবর্ধন ধরি রক্ষা কৈল ব্রজপুরী, তুমি না ঘাটাও হেন জন ॥ ৫ ॥

গোবর্ধনের মাতা ভারুণ্ডাকেও শ্রীদাম বলেছিলেন—তোমরা আপনজন। তাই বলি যে, চন্দ্রাবলীকে বাধা দিও না। অবশ্য সে যমুনাপুলিনে যাক বা না-যাক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তবে ব্রজের সকল বরাঙ্গনা যে সৌভাগ্যে আজ ভাগ্যবতী, সে সৌভাগ্য থেকে তোমার পুত্রবধূ চন্দ্রাবলী বঞ্চিতা রইল।

শ্রীদামের কথা শুনে মল্লজননী ভারুণ্ডা বলেছিলেন —

তোমার বচন শুনিয়া এখন মনেতে বিশ্বাস হয়।
নন্দের নন্দন সে বড় সুজন তাহাতে নাহিক ভয় ॥
কুঙ্কুম চন্দন বনফুলমালা লইয়া আপন করে।
কুলবধূ সবে গহনে চলয়ে মহামায়া পূজিবারে ॥
দেখি খলজন কতেক বলয়ে কলহ করয়ে কুলে।
বধূ যেয়া কক ভবানী পূজন কি করিতে পারে খলে ॥

সমতুল গুণবান সখা শ্রীদাম এইভাবে নায়কের প্রণয় বিষয়ে সহায় হয়ে, তাঁদের মিলনের পথ সুগম করতেন। সর্ব অবস্থায় নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, উদ্দেশ্য সাধন করতেন। পীঠমর্দ সহায়ের এইটিই বৈশিষ্ট্য।

প্রিয় নর্মসখা

অতিশয় রহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত লীলাসহচর ও সখাদের মধ্যে যিনি অতিপ্রিয় তাঁকে প্রিয় নর্মসখা বলা হয়। নায়কের প্রণয়-জীবনে এঁরা সহায়ক এবং এঁদের সাহচর্যে রতিরস সম্ভোগের পথ সুগম ও মধুরতর হয়। গোকুলে সুবল এবং দ্বারকায় অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্মসখা। ৭।

সুবলের প্রতি অনুরক্তা কোন এক সখীকে সম্বোধন করে রূপমঞ্জরী বলেছিলেন—সুবল কৃষ্ণের কোন্ সেবার অধিকার না পেয়েছে! কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করতে করতে কৃষ্ণপ্রিয়ারা যদি কেউ কলহ করে, যদি অভিমান ভরে পালিয়ে যায়, সুবল গিয়ে নানা বিনয়বাক্যে তাকে প্রসন্ন করে ফিরিয়ে আনে, কুঞ্জগৃহে অপূর্ব কন্দর্পলীলার উপযোগী পুষ্পশয্যা রচনা করে দেয়। স্মরসমরে ক্লান্ত হয়ে মাধব যখম প্রেয়সীর বুকের উপর অবসন্ন দেহে ঢলে পড়েন, সুবল তখন চামর ব্যজন করে। ৮।

যো ব্রজনাগরী কুটিল দৃগঞ্চলে হরি মাধুরী করু পান।
ভুজ যুগে বেঢ়ি হৃদয়ে কুচ ধারই করই আলিঙ্গন দান॥
আপহি আসি গরবে হরিমুখবিধু অধর সুধা করে পান।
মাধব আদরে সাধ করি তোষঞি বিনয় বচন বহুমান॥
ঐছন ভাগী অব গোপিকা হৈয়ল বুঝয়তে সংশয় ভেল।
কাহে এত ধন্য পুণ্য করি হৈয়ল কোন গহনে তপ কেল॥

ব্রজাঙ্গনারা কি সৌভাগ্যবতী! কুটিল কটাক্ষে কংসারিকে আলেহন করে, কুচোপমর্দনের সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয় স্থাপন করে

ভুজবল্লরী দ্বারা বেষ্টন করে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হয় ও অধর সুধা আস্বাদনে আনন্দবিভোর হয়ে ওঠে। তারা যে কি সুমহান্ তপস্যা করেছে, তা কি তুমি জানো না? বলে দাও, আমি কেমন করে এ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হবো?

পূর্বোক্ত চতুর্বিধ সহায় বা সখার মধ্যে চেটক অধিক শুশ্রূষাকারী ও সেবাপরায়ণ। কামতন্ত্র-কলানুযায়ী সে নায়কের বেশ রচনা করে। তার সেবার সার্থকতা দেখে, কিঙ্করও তার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে ওঠে। আর পীঠমর্দ বীররসের সহায়ক; রণক্ষেত্রে ও শৌর্যপ্রকাশে সে নায়ককে সাহায্য করে। শৃঙ্গারসখ্য ও রৌদ্ররসে সুদাম ছিলেন মুকুন্দের সবচেয়ে বড় সহায়।

হরিপ্রিয়া প্রকরণে যে দূতীর কথা আলোচিত হবে, সেই দূতী যে প্রণয়বিষয়ে কত সহায়ক, সেকথা রসবিদ্‌গণ বিশেষ ভাবে জানেন। ৯।

দূতী

দূতী দুই প্রকার। স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী।

প্রথম স্বয়ংদূতী 'কটাক্ষ'। ১০।

কটাক্ষের দ্বারা নায়ক বা নায়িকার মনোগত ভাব প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিশাখা শ্রীমতীকে বলেছিলেন—

শুন সখি মাধব নয়ন তরঙ্গ আপহি করতহি দূতিক রঙ্গ।
যাকর উপর আসি পহু মিলে তবহি বজর পরে তাকর কুলে।
আন রহু দূর, তুহু ধীর বরনারী চঞ্চল হৈয়ল চরিত তোহারি।

মাধবের দৃষ্টি দূতীকর্মে অতি পটু। আশ্চর্য তার নৈপুণ্য! সেই দৃষ্টিতে এমন অসাধারণ বশীকরণের শক্তি আছে যে, অতি শুদ্ধচরিত্রা হয়েও তুমি সেই ভুবনমোহন কটাক্ষে তাঁর প্রণয়বদ্ধ হয়েছ। ১১।

আর দ্বিতীয় স্বয়ংদূতী 'বংশীধ্বনি' বা সংকেত।

গার্গী বলেছিলেন—

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির কি অলৌকিক শক্তি! তাঁর ওই সুমধুর বংশীধ্বনি স্বয়ং দূতী হয়ে আহ্বান জানায়। সে বংশীধ্বনির আকর্ষণে কুলকামিনীদের লজ্জা উচ্ছিন্ন হয়। সেই মোহনমুরলীর কলকাকলি শুনে, ঘর ছেড়ে শ্রীরাধা ছুটে যান বনে—মাধবের পাশে। ! ললিত মাধব।

আপ্তদূতী

বীরা ও বৃন্দা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী। বীরার প্রত্যুৎপন্নমতি, নিত্যনতুন প্রস্তাব রচনার শক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিষয়ে অতিশয় সহায়ক। বৃন্দার মনোজ্ঞ চাটুবচন নায়িকাদের মনে আনন্দ সঞ্চার করে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের অনুরাগ বর্ধন করে। বীরা প্রগল্‌ভ-বচনা, বৃন্দা চাটূক্তিকুশলা। ১২।

শ্রীমতীকে সম্বোধান করে বীরা বলেছিলেন—হে গরবিনি! আমার কথা শোন, মাধবের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ো না। পূর্বে তিনি গিরিগোবর্ধন ধারণ করে তোমায় রক্ষা করেছিলেন। এখন তাঁর নবীন বয়স, অফুরন্ত যৌবন! মূঢ়ে, ভুল করো না, অনুরাগিনী হয়ে অভিসারে যাও। ১২।

তাৎপর্য: শ্রীকৃষ্ণের নবীন বয়স। রতি-রসাস্বাদনের উপযুক্ত নায়ক তিনি। গর্বভরে তুমি দূরে সরে গেলে, অন্য কোন নায়িকার প্রতি তাঁর প্রণয়াসক্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, গিরি-গোবর্ধন ধারণে যিনি সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি যে অতিশয় বলশালী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রসশাস্ত্রমতে, বলবান্ পুরুষের সঙ্গ-লাভেই নারী অধিক পরিতৃপ্তা হয়। সুতরাং তুমি প্রণয় ভঙ্গ করে নির্বুদ্ধিতা করো না।

বীরা শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী—প্রগল্‌ভা ও প্রেমসহায়িকা। তাই তিনি কৌশলে নায়িকার মনে রতিরসাস্বাদনের আগ্রহ জাগিয়ে

দিচ্ছেন এবং অন্য নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেমসঞ্চারের সম্ভাবনা ইঙ্গিত করে তাঁকে অভিসারে উৎসাহী ও আগ্রহশীলা করে তুলছেন। প্রেমের দৌত্যক্রিয়ায় এই শ্রেণীর বান্ধবী নায়কের পক্ষে সহায়িকা।। ১৩।

বৃন্দার উক্তি—

হে সুন্দরি! হে খঞ্জননয়না! আমি বৃন্দা, তোমায় প্রণাম করি। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

তোমার ভ্রূভুজঙ্গীর দংশনে কালীয়দমন স্বয়ং আজ তীব্রজ্বালায় অধীর হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ পর্যন্ত ব্রজে প্রবেশ করতে পারছেন না। হে চঞ্চল-মঞ্জুল-নয়না! বলতে পারো, এ ভ্রূ-ভুজঙ্গী কে?

মহাকাল কালীয় সর্প যাঁর নিকট পরাজিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভ্রূরূপী ভুজঙ্গিনীর দংশনে কাতর হয়ে, তীব্র জ্বালায় আজ বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হে সুনয়না, সর্পবিষে জর্জরিত ব্যক্তি পুনরায় সর্পদংশনে নিরাময় হয়। সুতরাং তুমি আর বিলম্ব করো না; পুনরায় তোমার ভ্রূভঙ্গী ও কটাক্ষ দ্বারা মুকুন্দকে দংশন করে তাঁকে বিষমুক্ত কর। তোমার প্রিয়তমকে পরিতৃপ্ত করে সুস্থ কর। ১৪।

বীরা ও বৃন্দা প্রভৃতি যে সব অসাধারণী দূতী শ্রীকৃষ্ণের সহায় ছিলেন, তাঁদের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলা হলো। পরে শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা ও লিঙ্গিনী প্রভৃতি সাধারণী দূতীদের কথা আলোচিত হবে। ১৫।

কৃষ্ণবল্লভা

সাধারণ গুণাবলী যাহাতে আছয়।
শ্রেষ্ঠ প্রেম সুমাধুর্য সম্পদ আশ্রয়॥
কৃষ্ণপ্রিয়া সবাকারে করি নমস্কার।
অপূর্ব মাধুরী যার সৌন্দর্যের সার॥

যাঁদের কৃষ্ণের মত সুরম্য অঙ্গ, যাঁরা সর্বসুলক্ষণান্বিতা এবং গুণসম্পন্না, যাঁরা সুবিস্তৃর্ণ প্রেম এবং শ্রেষ্ঠ মাধুর্যসম্পদ আশ্রয় করেছেন, তাঁরাই কৃষ্ণবল্লভা বা কৃষ্ণের সুযোগ্যা নায়িকা। ১।

যাঁরা যৌবনগুরুর কাছে স্মরকেলিকৌশল অধ্যয়ন করেছেন, যাঁরা পরম মাধুর্যময়ী এবং পুণ্যবতী রমণী-শিরোমণি, যাঁদের অঙ্গ অতি সুমধুর এবং রতিরসাস্বাদন কর্মে অধিকতর আনন্দদানের কৌশল যাঁদের আয়ত্ত, তাঁরা প্রণম্যা। সেই সকল নায়িকাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—স্বকীয়া ও পরকীয়া। ২।

স্বকীয়া ও পরকীয়া দুই ভেদ হয়।
পরকীয়া রসশ্রেষ্ঠ রতিশাস্ত্রে কয়॥

শাস্ত্রমতে পাণিগ্রহণের বিধি অনুসারে পত্নীরূপে প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্তিনী পতিব্রতা ও পতিপ্রেমে অবিচলিতা যে নারী, তাকে স্বকীয়া নায়িকা বলা হয়। ৩।

যথা—

চিরাচরিত পাতিব্রত্য ধর্মের পথে থেকে যাঁরা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা ও পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহশীলা হয়ে, গৃহিণীরূপে গৃহে অবস্থান করেন, এবং নিয়ত স্বামীসেবায় রত থাকেন, তাঁরাই আনন্দদায়িনী স্বকীয়া রমণী বা নায়িকা। ৪।

রুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

হে মানিনি, তোমার মত প্রণয়িনী ও সুগৃহিণী আমি আর কোনো গৃহে দেখিনি। বিবাহকালে যে-সব নৃপতি সমাগত হয়েছিলেন, তাঁদের নগণ্য মনে করে, তুমি শুধুমাত্র আমার গুণকীর্তির কথা শুনে, নির্জনে আমার কাছে দূত পাঠিয়েছিলে। তুমি আমার অনুরক্তা প্রেমময়ী পত্নী।

দ্বারকাবিহার

স্বকীয়া নারীতে কৃষ্ণের দ্বারকা বিহার।
অষ্টোত্তরশত স্ত্রীয়া ষোড়শ হাজার॥

সখী ও দাসী

তাহাদের সখী দাসী অসংখ্য রূপসী।
তুল্য রূপগুণ সখী ন্যূন হয় দাসী॥

দ্বারকায় যদুপতির স্বকীয়া মহিষী ষোল হাজার একশো আট: এঁদের সকলের আবার অসংখ্য সখী ও দাসী আছে। যারা রূপে ও গুণে মহিষীদের তুল্য তারা সখী; আর যারা রূপে ও গুণে তাঁদের চেয়ে অল্পিয়সী, তারা দাসী। মহিষীগণের মধ্যে মুখ্যা বা প্রধানা আটজন। যথা—

রুক্মিণী, মাদ্রী ও সত্যা আর জাম্ববতী।
কালিন্দী, কৌশল্যা, ভদ্রা, শৈব্যা রূপবতী॥

এই আটজন প্রধান মহিষীর মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা সকলের চেয়ে বরণীয়া। রুক্মিণী ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠ, আর সত্যভামা সকলের চেয়ে সৌভাগ্যশালিনী।

তথা হরিবংশে—

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের আত্মজা রুক্মিণী কুটুম্বদিগের অধীশ্বরী ছিলেন। আত্মীয় স্বজন ও অতিথি অভ্যাগত যাঁরা গৃহে আসতেন,

তাঁদের আদরযত্ন-পরিচর্যা বিষয়ে রুক্মিণী ছিলেন খুব যত্নশীলা। সত্যভামা ছিলেন মহিষীদের মধ্যে উত্তমা এবং প্রেম ও প্রীতিতে পরম সৌভাগ্যবতী।

রুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

হে দেবি, কোনো সুরূপা আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। তুমি প্রিয়তমা। এই ষোড়শ সহস্র প্রিয়ার মধ্যে আমার প্রাণসমা।

এই সব মহিষীদের সখী ও দাসী সর্বাপেক্ষা গুণবতী। তাদের সংখ্যাও অনেক। উৎকৃষ্ট সখী ও দাসী প্রিয়ার সদ্‌গুণের পরিচয় দেয়।

যে সকল স্ত্রী শাস্ত্রসম্মত বিধিমতে পরিগৃহীতা হয়, তাঁরাই স্বকীয়া। কিন্তু বৃন্দাবনে যে সব ব্রজবালা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন, স্বজাতীয়া না হলেও, আপন আপন ধর্মনিষ্ঠা বা পতিপ্রেমে একনিষ্ঠতার জন্য তাঁরাও স্বকীয়া নায়িকা পর্যায়ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

ব্রজ কুমারীর উক্তি—

যশোমতী রাণী-পরাণসমান করিয়া আমারে জানে।
সখিগণ যত মোর অনুগত প্রাণের অধিক মানে॥
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া এ নব কানন মুনীর মানস হরে।
এ রূপযৌবন দেখিতে সুন্দর এ সবে কি কাজ করে॥
সকলি বিফল হইল কেবল কি হবে আমার গতি।
উমাব্রত ফলে যদি না হইল নন্দের নন্দন পতি॥

আর্যা যশোমতী আমার প্রতি বাৎসল্য-স্নেহপরায়ণা, সখীগণ প্রাণ অপেক্ষা আমায় ভালবাসে, বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠের চেয়েও মনোরম, আমার এত রূপ, এমন যৌবন! কিন্তু তাতে কি লাভ? যদি উমাব্রতের ফলরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে পতিরযোগ্য লীলা না করেন, তাহলে আমার সবই বিফল।

গান্ধর্ব ও অব্যক্ত বিবাহ

গান্ধর্ব বিবাহ হেতু স্বকীয়া কহিল।
অব্যক্ত বিবাহে কাম প্রচ্ছন্ন রহিল॥

গান্ধর্বরীতিতে যে ব্রজকুমারীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ স্বীকৃত, তাঁরা স্বকীয়া। তা ছাড়া, যাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শুধুমাত্র মনো-বিনিময় হয়ে অব্যক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হলো, এবং কাম প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল, বস্তুতঃ তাঁরাও স্বকীয়া নায়িকা। ৫।

পরকীয়া

যে সব নায়িকা ইহকাল-পরকালের ভয় না রেখে গভীর অনুরাগে দয়িতের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, ধর্মমতে বা সামাজিক অধিকারে পত্নীরূপে স্বীকৃতা না হলেও, প্রেমের অধিকারে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিতা। নায়িকা হিসাবে তাঁরাই পরকীয়া। ৬।

রাগে আত্মা সমর্পয়ে দুই লোক ছাড়ি।
ধর্মেতে গৃহীতা নহে পরকীয়া নারী॥

অনুরাগের উল্লাসে কোন্ ব্রজাঙ্গনা ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নি? অথচ অরুন্ধতী প্রভৃতি মহাসতীরা অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের অভিসার লীলার প্রশংসা করেছেন। তা ছাড়া, বনচারিণী হলেও তাঁদের মাধুর্যপরিমল লক্ষ্মীর সৌন্দর্যকেও ম্লান করে। ত্রিভুবন বিজয়িনী সেই সব কৃষ্ণপ্রিয়াগণ পরম আনন্দদায়িনী। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা সখ্যসুখ দান করেন। ৭।

কন্যা ও পরোঢ়া

পরকীয়া নায়িকা দ্বিবিধ—কন্যা ও পরোঢ়া। যে সব অবিবাহিতা বা কুমারী ব্রজবালা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমলীলায় রত হন, তাঁরা কন্যা পরকীয়া। যাঁরা লৌকিক ধর্মে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু গোপনে কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্তা ও পরম মাধুর্যরসে আনন্দদায়িনী

তাঁরা পরোঢ়া পরকীয়া। এঁদের কামক্রীড়া প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্নকামতা দ্বারা এঁরা গোকুলচন্দ্রের সহিত সখ্য সাধন করেন। ৮।

পরকীয়া সঙ্গে কৃষ্ণের অধিক আনন্দ।
ইহাতে প্র চ্ছন্ন ক্রীড়া করয়ে গোবিন্দ॥
সকলের শ্রেষ্ঠা হয় পরকীয়া নারী।
আপনি মহিমা তার কহেন শ্রীহরি॥

পরকীয়া নায়িকার সঙ্গে রতিসম্ভোগে যে আনন্দ ও মাধুর্যরস আস্বাদিত হয়, তার তুলনা হয় না। বিধিনিষেধের সকল বাধা লঙ্ঘন করে, আকুল আগ্রহ ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে পরকীয়া রতি আস্বাদন করতে হয়, তাই পরকীয়ার রসোৎকর্ষ অন্য সকল রসানুভূতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

যে মৃগাক্ষীদের লাভ করতে হলে অধিক নিষেধ ও দুর্লভতার গণ্ডী পার হতে হয়, এবং নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়, তাদের প্রতি নায়কের হৃদয় সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়। ৯।

তবে এই প্রেম সাধারণের জন্য নয়; শুধু মাত্র রতিরসস্বাদনের শ্রেষ্ঠতা ও আনন্দঘন মধুর রসের অনুভূতি বিশ্লেষণের জন্য উল্লিখিত হয়েছে। এই পরকীয়া প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক রূপে কল্পনা করে তাঁর ব্রজনারীসঙ্গ প্রসঙ্গে রতিরস আলোচিত হয়েছে। উদাহরণের জন্যই এই পরকীয়া প্রেমের আলোচনা; আচরণের জন্য নয়। কেন না, পরকীয়া প্রেমের আচরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে মারাত্মক। তাতে সমাজকল্যাণ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। পরকীয়া প্রেমের যে রসোৎকর্ষ, সেই রসোৎকর্ষ সঞ্চারিত হলে শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-প্রেম চিত্তে সঞ্জাত হয়। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, সংসারধর্মে রত থেকেও, নায়িকার মনে যেমন উপপতির প্রতি গভীরতম গোপন আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আকর্ষণ যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপজিত হয়, তখনই হয় শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-প্রেমের সঞ্চার। পরকীয়ার রসানুভূতি সকল প্রেমের চেয়ে নিবিড়, আকর্ষণ সকল

আকর্ষণের চেয়ে প্রবল। সেই তাৎপর্যে পরকীয়া প্রেমের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ১১—১৩।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে শুকদেবের উক্তি—

মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাসলীলা শুনে আপনি চঞ্চল হবেন না। দেহপরতন্ত্র সাধারণ মানুষের পক্ষে মনের দ্বারাও এ আচারণ উচিত নয়। বিষপান শঙ্করের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষ যদি সে কাজ করে, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরকীয়া প্রেমের লীলামাধুর্য শুধু উদাহরণের বস্তু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ ধারণ করে কেবল মাত্র ভক্তের প্রতি এই অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন প্রেমের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য। অনীশ্বর দেহমনে মানুষ আস্বাদন করেছে সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমের মধুরতম রস। ১৪—১৫।

সেই সকল গোপীগণের প্রেমের মাহাত্ম্য ভগবান স্বয়ং স্বীকার করেছেন।১৬।

গোপীগণের প্রেম অনবদ্য ও অতুলনীয়। যে প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে লজ্জা ভয় গৃহসুখ সবকিছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে, নায়িকাগণ আত্মসমর্পন করেছেন দয়িতের কাছে, সে প্রেম নিকষিত কাঞ্চনের মতই অনাবিল, শুদ্ধ ও সুন্দর—নির্মল ও গরীয়ান।

দয়িতকে আনন্দ দান করবার জন্য নায়িকা যখন সকল দুঃখ তুচ্ছ করেন, আত্মসুখের দিকে দৃক্‌পাতও করেন না, তখনই তাঁর প্রেম হয় সার্থক। অনাবিল প্রেমে আত্মসুখের কামনা থাকে না, দয়িতকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য নায়িকা নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেন।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম॥

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

হে সুন্দরীবৃন্দ! আমার সঙ্গে তোমাদের এই সংযোগ, এই অচ্ছেদ্য অনুরাগ ও প্রেম নিরবদ্য—অনিন্দনীয়। যদি আমার জীবন

অশেষ হয়, দেবতার পরমায়ু নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকি, তবুও কোনদিন তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্যের শেষ হবে না। আমি পারবো না তোমাদের এই প্রেমের পূর্ণ প্রতিদান দিতে। তোমরা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছেদন করে, আত্মদান করেছ আমার কাছে; করেছ আমার ভজনা। তুচ্ছ করেছ সকল বাধা ও বিঘ্ন। তাই প্রেম হয়েছে গরীয়ান। সেই অসামান্য প্রেমে তোমরা হয়েছ মহীয়সী। বিনিময়ের প্রত্যাশা করোনি; আপনার প্রেমে আপনি হয়েছ ধন্য। সার্থক হয়েছে তোমাদের ভালবাসা। কিন্তু আমি রইলাম তোমাদের কাছে চিরঋণী। ১৭।

পরম ভাগবত উদ্ধব ব্রজাঙ্গনাদের সৌভাগ্যের কথা কীর্তন করে বলেছেন, আমি যদি বৃন্দাবনের বনপথে লতাগুল্ম হয়ে জন্মাতাম, কৃষ্ণপ্রিয়াদের চরণস্পর্শে আমার জীবন ধন্য হতো। কি অতুলনীয় প্রেমসম্পদের অধিকারিণী তাঁরা! কুল, মান, স্বজন, সমাজ ও ধর্ম সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, তাঁরা অনুগমন করেছেন মাধবের। ১৮।

যদিও গোপীগণ পরোঢ়া ছিলেন, তবুও তাঁরা স্বচ্ছন্দে করেছেন অভিসার। মায়ামুগ্ধ গোপগণ গৃহে আপন পত্নীর অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারেন নি; তাই কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের মনে কোন কোপানল প্রজ্জ্বলিত হয় নি।১৯।

মায়াতে ছায়ার নারী পেয়ে গোপগণ,
কৃষ্ণ প্রতি নহে তারা কোপযুক্ত মন।
ব্রজদেবী সঙ্গে খেলে নন্দের নন্দন,
নিজপতি সঙ্গে রতি না করে কখন। ২০।

কন্যকা

যে অবিবাহিতা লজ্জাশীলা বালিকারা পিতৃগৃহে থেকে সর্বদাই সখীদের সঙ্গে খেলা করবার জন্য উৎসুক, অথচ তাদের অন্তরে জেগেছে নায়কের প্রতি বিমুগ্ধতা, মন আকৃষ্ট হয় তরুণের প্রতি, মুগ্ধা

নায়িকার গুণ তাদের প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছে পরকীয়া প্রেমে তারাই কন্যা বা কন্যকা নায়িকা। ২১।

এই কন্যাদের মধ্যে যে সব ব্রজকুমারী কৃষ্ণকে পতিভাবে কল্পনা করে কাত্যায়নীর অর্চনা করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের অভীষ্ট পূরণ করেছিলেন, তাঁরা ধন্যা নায়িকা। উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকা প্রকরণে তাঁদের বল্লভা বা কৃষ্ণবল্লভা বলা হয়েছে।

ধন্যা আদি কন্যা ব্রজে করে দুর্গার্চন।
তাহাদের কৈল হরি অভীষ্ট পূরণ ॥ ২২ ॥

যে সব কুমারী এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ করেছেন, তাঁদের পরিহাস করে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া বলেছেন—

সখীর সহিত ধূলির উপরে খেলহ যমুনাকূলে।
হৃদয়ে বসন না দিলে কখন অলপ বয়স বলে ॥
অলপ বয়স জানিয়া জনক না খুঁজে তোমার বর।
বিষম চরিত দেখিয়া এখন মনেতে লাগিল ডর ॥
কানু বনমাঝে মুরলী পূরই মধুর মধুর তানে।
তুঁহু সে কাঁপিয়া চপল নয়নে চাহিছ গহন পানে ॥

খেলাধূলাতেই তোমার বেশী মনোযোগ। এখনও বুকে কাপড় দাও না, তাই পিতা বরের অন্বেষণ করেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শিখিপিঞ্ছমৌলির মুরলীধ্বনি শুনে, তুমি উৎকম্পিত হৃদয়ে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে বৃন্দাবনের বনে বনে ঘুরে বেড়াও দয়িতের সন্ধানে। বাইরে প্রকাশ না পেলেও, কুমারী মনের গোপন অন্তরালে জেগেছে সঙ্গলিপ্সা, সঞ্চারিত হয়েছে প্রেম। দয়িতের অঙ্গসঙ্গ লাভের স্বাদ পেয়েছ কিনা, তাই।। ২৩।

পরোঢ়া

বিবাহিতা যে-সব গোপবধূর স্বামী আছে, তবুও তাঁরা সর্বদা সম্ভোগ লালসায় কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা, তাঁরাই পরোঢ়া নায়িকা। ২৪।

চন্দ্রাবলীকে পদ্মা বলেছিলেন—সখি, তুমি কাত্যায়নীর অর্চনার জন্য পুষ্পচয়ন করতে গহন বনের মধ্যে কেন গিয়েছিলে? কুঞ্জবনে কত কাঁটাগাছ! সেই সব কাঁটার আঘাতে তোমার বক্ষস্থল ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু ননদিনীরা তো তা বুঝবেন না। ওই দেখ, স্তনযুগে কণ্টকের সদ্য আঘাত দেখে, ননদিনী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারবার তোমার দিকে চাইছেন।

এইসব পারোঢ়া নায়িকা সৌন্দর্য, সদ্‌গুণ ও বিভাবে অতিশয় শ্রেয়; সকলের চেয়ে সৌভাগ্যশালিনী। প্রেমমাধুর্যে এঁরা মাধবের বক্ষলগ্না কমলার চেয়েও অধিক। ২৫।

রাস উৎসবে যাদের কণ্ঠে বাহু বেষ্টন করে শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন করেছিলেন, তারা কল্যাণময়ী ও সৌভাগ্যবতী। তাদের প্রতি তাঁর যে অশেষ করুণা প্রকাশ পেয়েছিল, এমন কি বক্ষস্থিতা একান্ত অনুরক্তা কমলার প্রতিও তাঁর তেমন প্রীতি কোনদিন প্রকাশ পায় নি। যে সব নারীর অঙ্গে পদ্মের সৌরভ, যাদের কান্তি মনোহর, সেই সব সুন্দরীরাই যখন এ-হেন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা, তখন আর অন্যান্য স্ত্রীগণের কথা কি? তাদের পক্ষে এ সৌভাগ্যলাভের আশা সুদূরপরাহত। ২৬—২৭।

উল্লিখিত পরোঢ়া নায়িকা তিন প্রকার:
সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া।

সাধনপরা নায়িকাদের আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—যৌথিকী আর অযৌথিকী।

যারা আপনজনের সঙ্গে সাধনরতা তাঁরা যৌথিকী। পুরাণ ও উপনিষদের মতভেদে যৌথিকী দু প্রকার। ২৮।

পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে, যে-সব দণ্ডকারণ্যবাসী গোপাল-দেবের উপাসনা করতেন এবং রামের সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু অভীষ্ট লাভ করতে পারেন নি, তাঁরা রতিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে

বৃন্দাবনে গোপীরূপে জন্ম লাভ করেছিলেন ও কৃষ্ণপ্রেমের রাগানুগা রতিরস আস্বাদন করেছিলেন। ২৯।

বৃহৎবামনপুরাণে বিশ্রুত আছে যে, রাস উৎসবের প্রারম্ভে কোনকোন গোপী শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেউ বা পতিদ্বারা গৃহে অবরুদ্ধা হয়ে সে আনন্দসম্ভোগ থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন। রতিসম্ভোগে বঞ্চিতা হলেও প্রেমের রসাস্বাদন থেকে তাঁদের চিত্ত বঞ্চিত হয় নি।

উপনিষদ্ মতে—

গোপীভাগ্য দেখি সূক্ষ্মবুদ্ধি শ্রুতিগণ
তপস্যা করিল কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ।
তপঃ করি শ্রুতিসব ব্রজে জন্ম নিল।
গোপিনী হৈয়া ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া হল ॥ ৩০ ॥

এঁরাই বল্লবী নামে অভিহিতা।

গোপীভাবের প্রতি অনুরাগী হয়ে যাঁরা সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বশতঃ যাঁদের রাগানুগা ভজনে গোপীভাব সিদ্ধ হয়, তাঁরাই অযৌথিকী। সময় সময় এই অযৌথিকী নায়িকারা একাকিনী বা যূথবদ্ধা হয়ে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এই অযৌথিকী নায়িকাদের আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, প্রাচীনা ও নবীনা।

প্রাচীনা অযৌথিকীরা সুদীর্ঘকাল সান্নিধ্য লাভ করে নিত্য-প্রিয়াদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে প্রেমরসাস্বাদনের সুযোগ পেয়েছেন। নবীনাগণ দেবতা, মনুষ্য বা গন্ধর্ব রূপে জন্মগ্রহণ করে ব্রজলীলার রসাস্বাদন করেছেন। ৩১।

দেবী

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য নিত্যপ্রিয়ারাও দেবী রূপে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। যে সব প্রিয়াগণ বৃন্দাবনে গোপকন্যারূপে জন্মেছিলেন তাঁরাই নিত্যপ্রিয়াদের প্রাণতুল্যা সখী হয়েছিলেন এবং ব্রজলীলায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ৩২।

নিত্যপ্রিয়া

বৃন্দাবনের মধ্যে শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী এই দু'জন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। এঁদের সৌন্দর্য এবং বৈদগ্ধ্যাদি গুণ অর্থাৎ রূপ ও রসানুভূতির যোগ্যতা ছিল শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য। ৩৩।

যিনি আপনার অসীম আনন্দ ও চিন্ময় রসঘন শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গোলোকে অবস্থান করেন, সকল আনন্দের ও রসানুভূতির আধার সেই অখিলাত্মা আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। নিখিল-বিশ্বে আপন রূপরাশি বিম্বিত করে কেলিকলা সম্ভোগরত সেই মহান্ পুরুষ চিন্ময় রসপ্রবাহে প্রতিভাবিত। ব্রহ্মসংহিতা। ৩৪।

শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রিয়াগণের মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং পালিকা প্রভৃতি প্রধানা নায়িকা। ৩৫।

চন্দ্রাবলীর অন্য নাম সোমাভা। শ্রীরাধার নাম গান্ধর্বী এবং ললিতার অপর নাম অনুরাধা। এই নিমিত্ত সেমাভা, গান্ধর্বী ও অনুরাধা সম্পর্কে পৃথকরূপে উল্লেখ করা হয় নি।

খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুঙ্কুমা প্রভৃতিও লোক-প্রসিদ্ধা নিত্যপ্রিয়াগণ মধ্যে পরিগণিতা। ৩৬।

এইসব ব্রজসুন্দরীদের শত শত যূথ আছে এবং এক-একটি যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা আছেন। শুধুমাত্র বিশাখা, ললিতা, পদ্মা এবং শৈব্যা—এই চার সখী ব্যতীত, রাধা থেকে কুঙ্কুমা পর্যন্ত সকলেই যূথেশ্বরী। কিন্তু পরম সৌভাগ্যবতী রাধা প্রভৃতি অষ্ট যূথেশ্বরী সখী প্রধানা নায়িকা রূপে পরিগণিতা। ৩৭।

যদিও ললিতা প্রভৃতি সখীগণ যূথেশ্বরীর যোগ্যা, তবুও তাঁদের অন্তরে শ্রীরাধার ন্যায় অভিসার ও সঙ্গলাভের লালসা ছিল, সেই হেতু তাঁরা যূথেশ্বরী পদবাচ্যা হতে পারেন নি। তাঁদের সখ্যরুচিই স্থায়ী হয়েছিল। ৩৮।

এই শ্রেণীর সখীরা স্বভাবতঃ মধুরা, এবং নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই প্রিয়বান্ধবী। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের আকাঙ্খা অন্তরে বিদ্যমান থাকায়, এঁদেরও হরিপ্রিয়া, কৃষ্ণপ্রণয়াভিলাষিণী বা কৃষ্ণবল্লভা পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

রাধা প্রকরণ

উল্লিখিত অষ্ট যূথেশ্বরীর মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীই সর্ববিষয়ে প্রধানা। এঁদের প্রত্যেকের যূথে অনুগামিনী কুরঙ্গিনীর মত অসংখ্য গোপিনী আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে রাসলীলা করেন, এই সব গোপিনীরা যোগদান করেন সেই নৃত্য-উৎসবে। নৃত্যের তরঙ্গহিল্লোল বয়ে যায় আকুলিতা প্রমদা গোপাঙ্গনাদের অঙ্গে অঙ্গে। আনন্দঘন চিন্ময় রস প্রতিভাবিত হয়। ১।

রাধা ও চন্দ্রাবলী—এই দুই প্রাধানা নায়িকার মধ্যে সর্ববিষয়ে শ্রীরাধাই শ্রেয়সী। শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিনী। তাই আনন্দঘন রতিরসাস্বাদনের আধাররূপা চন্দ্রাবলীর চেয়েও শ্রীরাধা বরীয়সা। গুণগরিমায় রাধা অতুলনীয়া। প্রেমধর্মের আধাররূপে যে সকল গুণাবলী নায়িকাকে পরিপূর্ণ করে তোলে, শ্রীরাধা তার সম্পূর্ণ অধিকারিণী। তাই বৃন্দাবনলীলায় শ্রীরাধার সমকক্ষ নায়িকা আর নাই। কৃষ্ণপ্রেমের বিকশিত শতদল শ্রীরাধা বিশ্বের মানসলোকে এক অলোকসামান্যা নায়িকা। ২।

অথর্ব বেদের অন্তর্গত গোপালতাপনী উপনিষদের উত্তর বিভাগে যাকে গান্ধর্বী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিই শ্রীরাধা। মাধবের সঙ্গে শ্রীরাধার সামঞ্জস্য ও গুণপ্রাধান্য ঋক্ পরিশিষ্টে কীর্তিত হয়েছে। দেবর্ষি নারদও পদ্মপুরাণে শ্রীরাধার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন :

শ্রীরাধা বিষ্ণুর অতিশয় প্রেয়সী। রাধাকুণ্ডও তাঁর তেমনি প্রিয়। গোপিনীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই সকলের চেয়ে প্রিয়। তিনিই বিষ্ণুর অত্যন্তবল্লভা—শ্রেষ্ঠা নায়িকা। ৩।

বৃহৎ গৌতমীয় প্রভৃতি তন্ত্রের মতে, যে হ্লাদিনী মহাশক্তি থেকে দিকেদিকে আনন্দধারা উৎসারিত, যার চেয়ে শ্রেয় শক্তি

আর নাই, সেই মহাশক্তির সারস্বরূপা হলেন শ্রীরাধা। তাই কৃষ্ণ-প্রেয়সিগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা। ৪।

এই বৃষভানুনন্দিনী সুষ্ঠুকান্তা ও অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী। ইনি ষোড়শ প্রকার শৃঙ্গার সজ্জা ও দ্বাদশবিধ আভরণ অঙ্গে ধারণ করেন।

সুষ্ঠু কান্তার রূপ :

কুঞ্চিত কুন্তল দীঘল নয়ান।
ও মুখ সুন্দর চাঁদ সমান॥
স্তনযুগ কঠিন কটি অতি ক্ষীণ।
নত স্কন্দর তুঁহু বয়স নবীন॥
নখবিধুরাজিত মৃণালভুজপাণি।
তুয়া রূপ ত্রিজগত গুণই জানি॥

হে রাধিকা, ত্রিজগতে উৎসারিত তোমার রূপের উৎস। তুমি অনুপমা। এমন অতুলীয় যার রূপ, তার অলঙ্কারের কি প্রয়োজন? সুকুঞ্চিত কেশদাম, বদনকমল চঞ্চল অথচ দীর্ঘায়ত নয়নে শোভিত। কঠিন কুচযুগে বক্ষঃস্থল সুরম্য, কটিদেশ অতিক্ষীণ, স্কন্ধদুটি নিম্ন, করপল্লব নখরত্নে অলঙ্কৃত। ৬।

ষোড়শ শৃঙ্গারবেশ :

সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজের পথে চলেছেন, উদ্যানমধ্যে শ্রীরাধাকে দেখে, সুবল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—সখা, বৃষভানুনন্দিনীর অঙ্গশোভা দর্শন কর—

সদ্যঃস্নাতা, নাসাগ্রে মণিখচিত রত্নালঙ্কার, পরিধানে নীল বসন, কটিতটে নীবিবন্ধ, শিরে বেণী, কর্ণে উত্তংশ, সর্বাঙ্গে চন্দন-লেখা, চিকুরদামে স্তরে স্তরে শোভিত পুষ্পগুচ্ছ, কণ্ঠে রত্নহার, পদ্মহস্তে লীলাপদ্ম, মুখকমলে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, উজ্জ্বল নয়নযুগলে কাজলের রেখা, গণ্ডস্থল মকরীপত্র রঞ্জিত, চরণে অলক্তকরাগ, ললাটে চন্দন-তিলক। সুচিত্রা রাধা ষোড়শ

শৃঙ্গারবেশে সজ্জিতা হয়ে আজ অসামান্য রূপলাবণ্যে উদ্ভাসিতা হয়ে উঠেছেন। ৭।

দ্বাদশ আভরণ :

চূড়ায় রত্ন, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে স্বর্ণ পদক, কর্ণের উর্ধ্বে—বেণীমূলে স্বর্ণশলাকা, প্রকোষ্ঠে বলয়, কণ্ঠে রত্নহার, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, বক্ষোদেশে নক্ষত্রতুল্য মণিমালা, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ননূপুর, পদাঙ্গুলিতে উত্তুঙ্গ অঙ্গুরীয়।

ষোড়শবিধ শৃঙ্গার-সজ্জার সঙ্গে এই দ্বাদশ আভরণ মিলিত হয়ে শ্রীমতীকে আজ সমুদ্ভাসিত করেছে। নয়নমনোমুগ্ধকর আশ্চর্য শোভা বিস্তার করে শ্রীরাধা অভিসার বেশে সজ্জিতা হয়েছেন সখা, সেই নয়নমনোহর রূপরাশি দর্শন কর। ৮।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার প্রধান গুণাবলী :

মধুরা, নববয়াঃ, সচল-নয়না, উজ্জ্বল-হাস্যময়ী, সুলক্ষণা, অঙ্গগন্ধে নায়ককে উন্মাদিত করেন, সঙ্গীত-পটিয়সী, মধুরভাষিণী, নর্মকুশলা, বিনীতা, করুণাময়ী, বিদগ্ধা, পটু, লজ্জাশীলা, সুমর্যাদাসম্পন্না, ধৈর্যশালিনী, সুবিলাসিনী, মহাভাবের উৎকর্ষসাধিকা, কৃষ্ণবিষয়ে অতিতৃষ্ণাবতী, গোকুল-প্রেমাধার—বৃন্দাবনের সর্বজনের প্রিয়া, জগদ্ব্যাপী যশের অধিকারিণী, গুরুজনের স্নেহের পাত্রী, সখীগণের প্রণয়বশীভূতা, কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, কেশব যাঁর মধুবাক্যের বশীভূত। এইসব অতুলনীয় গুণরাশিতে রাধা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষা। ৯।

শ্রীরাধার গুণাবলীকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

দেহ সম্বন্ধীয়—মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারু-সৌভাগ্যরেখাম্বিতা, গন্ধোন্মাদিতমাধবা।—এই ছয়টি শ্রীমতীর আঙ্গিক গুণ।

বাক্য সম্বন্ধীয়—সঙ্গীতকুশলা, রম্যবাক্, নর্মপটিয়সী।—এই তিনটি তাঁর বাচনিক গুণ।

মনঃ সম্বন্ধীয়—বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পটিয়সী, লজ্জাশীলা, মর্যাদাসম্পন্না, ধৈর্যশালিনী, গাম্ভীর্যময়ী, সুবিলাসিনী মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী বা কৃষ্ণপ্রেমে অবিচলিততৃষ্ণাবতী।—এই দশটি মানসিক গুণ।

পরসম্বন্ধীয়—গোকুলজনের প্রেমপাত্রী, জগদ্ব্যাপী যশের অধিকারিণী, গুরুজনের স্নেহের আধার, সখীগণের প্রণয়-বশীভূতা, কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁর কথার বশীভূত।—এই ছয়টি ব্যবহারিক গুণ।

এই পঞ্চবিংশতি গুণের সমন্বয়ে রাধিকার চরিত্র নায়িকাগণের মধ্যে অসামান্য ও অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। ১০।

মাধুর্য বলতে বুঝায় চারুতা বা মনোরমত্ব; মধ্যবয়ঃ অর্থে মধ্য-কৈশোর বা সদ্যোভিন্ন যৌবন; সৌভাগ্যরেখা অর্থে হস্তপদাদিস্থিত চন্দ্ররেখা প্রভৃতি সুলক্ষণ। সাধুমার্গ থেকে অবিচলিত থাকার নাম মর্যাদা; আভিজাত্য ও শালীনতাবোধ হেতু সম্ভ্রমকে বলে লজ্জা, দুঃখ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতার নাম ধৈর্য।

অন্যান্য গুণগুলির অর্থ সুস্পষ্ট। তাই পৃথক্‌ভাবে সেগুলির লক্ষণ বিশ্লেষণ করা অনাবশ্যক।

মধুরা

শ্রীরাধার মাধুর্যবর্ণনাচ্ছলে বিদগ্ধমাধবে পৌর্ণমাসী বলেছেন—

কি অপরূপ রূপমাধুরী! নয়নদুটির শোভা যেন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত নীলোৎপলকে নিষ্প্রভ করে, বদনকমল প্রফুল্ল কমলবনকে পরাজিত করে ও অঙ্গরুচি স্বর্ণকান্তিকে ম্লান করে। এমন নয়নাভিরাম রূপরাশি আর কার আছে! ১১।

নববয়াঃ

নববয়াঃ অর্থে নবীনা বা নবযৌবনসম্পন্না।

দূতী শ্রীরাধাকে বলছিল—

হে কৃশোদরি! তোমার শ্রোণীদেশ যেন রথ; কুচদ্বয় চক্র, ভ্রূলতা ধনু, নেত্রদ্বয় বাণ। বিজয়গর্বে গর্বিত শ্রীকৃষ্ণকে জয় করবার জন্য কামদেব যেন তাঁর রাজ্যভার তোমার হাতে তুলে দিয়ে তোমায় সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছেন। অস্ত্রক্ষেপণে তুমি বিলম্ব করো না। ১২।

চলাপাঙ্গা

শ্রীমতীকে সম্বোধন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

হে বিধুমুখি! আকাশের ওই চলচঞ্চল বিদ্যুৎ কি তোমার নয়নের কাছে গতিবিদ্যা শিক্ষা করেছে? না, তোমার নয়ন সে বিদ্যা শিক্ষা করেছে ওই তড়িতের কাছে! তা নয়, তোমার অপাঙ্গই এ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। তাই আমার এই অদম্য গতিশীল মনও তোমার নয়নের কাছে পরাজিত। ১৩।

উজ্জ্বলস্মিতা

কৃষ্ণ-সন্দর্শনে একদিন শ্রীমতীর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু কৃষ্ণের সান্নিধ্যে সখীদের দেখে, তিনি বারবার সে হাসি সংগোপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তবুও সে হাসি নিবৃত্ত হয় নি। স্মিতহাস্যে শ্রীরাধার বদনচন্দ্রিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সে অবস্থা দেখে বিশাখা বলেছিলেন—প্রিয় সখি, তোমার অধর হাস্যসুধায় পরিপূর্ণ দেখে, চকোররাজ আর অপেক্ষা করতে পারছেন না! ওই দেখ, সখীদের সঙ্গ ত্যাগ করে, মদিরাচঞ্চল মনে তিনি তোমার দিকে এগিয়ে আসছেন। অতএব এখন আমাদের এস্থান ত্যাগ করাই ভাল। ১৪।

চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা

শ্রীমতী কুঞ্জমধ্যে আত্মগোপন করলে মধুমঙ্গল বলেছিলেন—

হে মাধব, তুষ্ট হও। শ্রীরাধা কুঞ্জের ভিতরেই আত্মগোপন করেছেন। ওই দেখ, ইতস্ততঃ তাঁর চরণ-চিহ্ন আঁকা। চন্দ্ররেখা, বলয়, পুষ্প, বল্লী ও কুণ্ডল প্রভৃতি যে সব সৌভাগ্যরেখা তাঁর চরণ-তলে আছে, তিনি লুক্কায়িত হলেও, সেই সৌভাগ্যরেখাযুক্ত চরণচিহ্ন তাঁর গোপন উপস্থিতি প্রকাশ করে দেয়। ১৫।

যেমন চরণতলে তেমনি তাঁর করপদ্মে সকল প্রকার সৌভাগ্য-রেখা অঙ্কিত আছে। তাই শ্রীরাধা সর্বসুলক্ষণা ও সৌভাগ্যবতী। বাম চরণ-তলে যব, চক্র, ছত্র, বলয়, অর্ধচন্দ্ররেখা, কুসুমবল্লিকা, কমল, কমলতলে পতাকাযুক্ত ধ্বজ, ঊর্ধ্বরেখা, পুষ্প এবং অঙ্কুশ— এই একাদশটি সৌভাগ্যরেখা আছে। দক্ষিণ চরণে আছে শঙ্খ, বেদী, কুণ্ডল, পর্বত, মৎস্য, রথ, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অষ্টবিধ সুলক্ষণ চিহ্ন। বামহস্তে সুদীর্ঘ আয়ুরেখা এবং কুঞ্জর, অশ্ব, যূপ, বাণ, তোমর, মালা প্রভৃতি অষ্টাদশ চিহ্ন; আর দক্ষিণ করতলে পঞ্চশঙ্খ, চামর, অঙ্কুশ, মঠ, দুন্দুভি, বজ্র, শকট, ধনু, খড়্গ, ভৃঙ্গার প্রভৃতি সপ্তদশ সৌভাগ্য রেখা আছে। শ্রীমতীর উভয় হস্ত ও পদতলে মোট পঞ্চাশটি চারু-সৌভাগ্যরেখা আছে।

গন্ধোন্মাদিত-মাধবা

তুঙ্গবিদ্যা শ্রীমতীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

হে মাধবি, তুমি লতামণ্ডপে পত্রপল্লবের অন্তরালে আত্মগোপনের প্রয়াস করো না। অয়ি বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি! তুমি যে-ভাবে যেখানেই আত্মগোপন কর, তোমার অঙ্গগন্ধে উন্মাদিত হয়ে ভ্রমরাধিপ ধূর্ত শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার অনুধাবন করবেন। অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান মাধব তোমার অঙ্গপরিমলে উন্মাদিত হয়ে উঠলে, তাঁর আর স্থান-অস্থান সময় বা অসময় বিবেচনা থাকবে না; নিশ্চয়ই তিনি বলপূর্বক তোমাকে কম্পিত করে মধু পান করবেন। ১৬।

সঙ্গীত প্রসারাভিজ্ঞা

বৃন্দার উক্তি—

হে রাধিকা, তোমার কোকিলতুল্য পঞ্চম স্বরের সঙ্গীতলহরী শ্রীকৃষ্ণকে চঞ্চল করে। সেই সঙ্গীত-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে হয়তো তিনি তোমার পশ্চাৎ-ধাবন করবেন। সে অবস্থা দেখলে, তোমার কোপনস্বভাব পতি রোষান্বিত হয়ে অনুধাবন করবেন। অতএব ঐ সঙ্গীত বন্ধ কর।

রম্যবাক্

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

হে সুবদনি! তোমার সুন্দর দন্তরাজিশোভিত মুখে কি অপূর্ব শব্দমাধুরী ধ্বনিত হয়! সে মধুর ধ্বনিতে কোকিলকুলই আকুল হয়; অধিক আর কি বলবো! সে অমৃতময় বাণীর মাধুর্য সুধার স্বাদকেও পরাজিত করে। ১৭।

নর্মপণ্ডিতা

অর্থাৎ লীলাকৌতুক ও হাস্যপরিহাসপটিয়সী।

কৌতুকচ্ছলে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন—হে বংশীধারি, ওই বাঁশী তোমার গুরু, না তুমি ওই বাঁশীর গুরু? কুলকামিনীদের ধৈর্যহরণ করা ভিন্ন কি তোমার আর অন্যকোন কাজ নাই!

অথবা

শ্রীমতী নর্মচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন—

হে পুন্যবান ধর্মবর্ধন! তুমি প্রসন্ন হও। তোমার কীর্তিকলাপ অতি পবিত্র! সাধ্বীগণের স্তনরূপী শিবের অর্চনা করে তুমি নিত্য-পূত। অতএব তোমায় বিনয় করি, এখন আমায় স্পর্শ করো না। আমি সূর্যপূজার জন্য সদ্য স্নান করেছি। কাজেই তোমার ওই হস্ত এখন আমার অঙ্গে দিও না। ১৮।

এই সকল গুণ ছাড়াও রাধা বহুগুণের অধিকারিণী : বিনীতা করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, লজ্জাশীলা ও সুমর্যাদাসম্পন্না। তাই নায়িকা হিসাবে শ্রীরাধা অতুলনীয়া ও অনুপমা।

পূর্বরাগ অবস্থায় একদিন ক্ষীণকায়া তন্বী শ্রীরাধাকে দেখে নান্দীমুখী নর্মচ্ছলে বলেছিলেন—সখি, এত চেষ্টাতেও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটাতে পারলাম না। সুতরাং সে আশা পরিত্যাগ করে তুমি উপায়ান্তর চিন্তা কর।

একথা শুনে রাধা বলেছিলেন—প্রিয় বান্ধবী ! রাধা চাতকিনী, বরং জলপান না করে সে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হয়ে প্রাণত্যাগ করবে সেও ভাল, তবুও সে ঘনকৃষ্ণ মেঘের অমৃত বর্ষণধারা ব্যতীত অন্যকোন জল পান করবে না।

নর্মপ্রসঙ্গে হলেও এ উক্তি রাধার সুমর্যাদার লক্ষণ।

বিনীতা

গোকুলমধ্যে শ্রীরাধা প্রসিদ্ধা। তবুও তাঁর মত বিনীতা নারী দেখা যায় না। গুরুজনেরা বারম্বার ভ্রূভঙ্গি দ্বারা তাঁকে নিষেধ করেন। তবুও তিনি দূর থেকে ভদ্রাকে দেখে, বিনয়ের সঙ্গে আসন পরিত্যাগ করে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন।

বিনয়াদি গুণে মধুররস পরিপুষ্ট হয়। —আনন্দ চন্দ্রিকা।

বিদগ্ধমাধবে বর্ণিত আছে যে,

কলহান্তরিতা অবস্থায় শ্রীরাধা সখীকে সম্বোধন করে বললেন, হে কৃশোদরি ! আমি লীলাকলহে মাধবকে প্রত্যাখ্যান করে বারবার অপরাধ করি। তবুও সগৌরবে আমি আবার অঙ্গীকৃতা হই। তার প্রধান ও একমাত্র কারণ এই যে, তোমরা আমার প্রতি করুণা বিস্তার করে আমোদ-প্রমোদে আমাকে উৎফুল্ল কর।

শ্রীরাধার এই বিনয় সখীদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে। ১৯।

করুণাপূর্ণা

বৃন্দা বললেন, পৌর্ণমাসি! শ্রীরাধার মত করুণাময়ী নারী দেখা যায় না। কান্তের প্রিয় দুগ্ধবতী ধেনুর সদ্যোজাত বৎসটির মুখে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ দেখে, তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তিনি দুঃখে কাতর হয়ে সেই বৎসের ক্ষতস্থানগুলিতে কুঙ্কুম লেপন করেছিলেন। ২০।

বিদগ্ধা

কুন্দলতা গার্গীকে বললেন—দেবি! শ্রীমতীর বিদগ্ধগুণের কথা কি আর বলবো! ধাতুচিত্রে তিনি সকলের গুরুস্থানীয়া, বিবিধ রন্ধনকার্যে অতিকুশলা, বিরচন-সুচতুরা, চারুচিত্তা, বাক্‌পটুতায় শ্রেষ্ঠবাগ্মী শ্রীকৃষ্ণকেও মুগ্ধ করেন, মাল্যরচনায় সুনিপুণা, পাঠে শুকশারীর ন্যায় পটিয়সী। দ্যূতক্রীড়ায় অজিতকেও জয় করেন, বিদ্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারিণী, রতিকলাশালিনী ও সুরসিকা। ২১।

পাটবান্বিতা বা চাতুর্যশালিনী

যথা বিদগ্ধমাধবে—

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলেছিলেন—রাধা পাটবান্বিতা বা বিশেষ চতুরা। একদিন গুরুজনদের সম্মুখে যখন তিনি বসে ছিলেন, আমায় দেখেও আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। হঠাৎ তিনি চাতুর্যের সঙ্গে কণ্ঠের মণিহার ছিন্ন করে ফেলেছিলেন এবং ভূপতিত মুক্তাগুলি কুড়িয়ে নেবার ছলে, মুখখানি ফিরিয়ে প্রণয়ভরে মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিলেন। ২২।

লজ্জাশীলা

শ্রীমতী লজ্জাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

ব্রজরাজনতনয় নির্জনে এসেছেন। তাঁর দর্শন অতি দুর্লভ। তাঁকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় আমার চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

হে লজ্জা, তুমি ক্ষণকালের জন্য নিবৃত্ত হও, আমি একবার আবরণ উন্মোচন করে অপাঙ্গ নিক্ষেপ করি। ২৩।

সুমর্যাদা

সুমর্যাদা তিন প্রকার। যেমন—স্বাভাবিক, শিষ্টাচারগত এবং স্বকল্পিত। ২৪।

স্বাভাবিক সুমর্যাদা

তৃষ্ণায় প্রাণ গেলেও, যেমন চাতকী মেঘবারি ভিন্ন অন্যবারি পান করতে পারে না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ বিহনে প্রাণ গেলেও শ্রীরাধার পক্ষে অন্যনাগর কল্পনা করা সম্ভব নয়। উত্তমা নায়িকার এই মর্যাদাবোধ স্বাভাবিক। ২৫।

শিষ্টাচারগত সুমর্যাদা

বৃন্দা শ্রীরাধাকে অভিসারের জন্য অনুরোধ করলে, শ্রীরাধা বলেছিলেন, সখি! ব্রজেশ্বরী আমায় আহ্বান করেছেন। গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলা করে, অভিসারে যাওয়া আমার উচিত নয়। তাতে.মঙ্গল হবে না।

স্বকল্পিত সুমর্যাদা

'আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা। এই পুণ্য তিথিতে মুকুন্দ নিখিলমাধুর্যের উৎসেক বিস্তার করে, শ্রীরাধাকেই কামনা করছেন। আজ সকল কামনা সিদ্ধ হবে। অতএব সখি, তুমি অভিসারে যাও।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত কোন দূতী রাধাকে এই কথা জানালে, রাধা নিজে না গিয়ে কুমারী চিত্রাকে প্রেরণ করেছিলেন। দূতী ফিরে এসে শ্রীরাধার সেই সুচিন্তিত মর্যাদাবোধের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। ২৭।

ধৈর্যশালিনী

পদ্মার ছলবাক্যে রুষ্ট হয়ে, বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন গৃহস্বামী তর্জন গর্জন করেছিলেন; ননদিনী কুটিলা তার শিক্ষিত বানরের দ্বারা

শ্রীমতীর কৃষ্ণ-প্রদত্ত হার অপহরণ করিয়েছিল, শৈব্যা তার ছাগী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মল্লীলতার (বেলফুলের) পল্লবগুলি খাইয়েছিল। রাধা সে সব দেখেও, ধৈর্যের সঙ্গে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন ; বিচলিতা হন নি।

গাম্ভীর্যশালিনী

রূপমঞ্জরী তাঁর সখীকে বললেন—সখি ! দেখ, শ্রীরাধার কি আশ্চর্য গাম্ভীর্য ! কলহান্তরিতা অবস্থায় যখন তাঁর মন শান্ত, তখনো বাইরের রূপ দেখে মনে হয় যে, তিনি যেন 'মান' করেই আছেন। গাম্ভীর্যের জন্য শ্রীমতীর অন্তরের প্রকৃত অবস্থা তাঁর মুখ দেখে অনুমান করা যায় না। ২৮।

সুবিলাসা

শ্রীরাধার কোন সখী বলেছিলেন—দেখ, শ্রীমতীর চঞ্চল দৃষ্টি কেমন তির্যকভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ! ভ্রূলতা উল্লাসভরে নৃত্য করে, কুন্দপুষ্পের মত শুভ্র হাসিতে মুখচন্দ্রিমা অতিশয় উজ্জ্বল, গণ্ডযুগে কুণ্ডল দোলে ! বিধুবদনে এমন সুমধুর বাক্য যে, কন্দর্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধমন্ত্র যেন আভাসে প্রকাশ পায়। বক্ষঃস্থলে মনোরম রত্নহার ! শ্রীমতীর এই অসামান্য রূপ ও বিলাসতরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় নিঃশেষে অপহৃত হয়। ২৯।

মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী

শ্রীরাধার কলহান্তারিতা অবস্থা উপস্থিত দেখে, কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন—

হে মাধব ! তোমার অদর্শনে শ্রীমতীর নয়নে নেমেছে অবিরল অশ্রুনির্ঝর। সে অশ্রুপ্রবাহে যমুনার স্রোত দ্বিগুণ হয়েছে। দেহ যেন চন্দ্রকান্তমণির মত স্বেদসিক্ত হয়ে, পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে। অস্ফুটস্বরে বারবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, তাঁর কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ

হয়েছে। পুলকশিহরণে কদম্বপুষ্পের মত বরতনু রোমাঞ্চিত হয়েছে। কখনো বা কৃষ্ণপ্রেম-ঝঞ্ঝায় প্রকম্পিত কদলীবৃক্ষের মত ধরাশায়িনী হয়ে পড়েছেন। ৩০।

গোকুল-প্রেমবসতি

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীরাধাকে দেখে ব্রজেশ্বরী বললেন—

সখি, বিধাতা কি প্রেমের যাবতীয় উপকরণ একত্র করে বৃষভানু নন্দিনীর অঙ্গসমূহ গঠন করেছেন? কেন না, তাকে দেখলে আমাদের সকলের এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীর মন নিবিড় স্নেহরসে আপ্লুত হয়। ৩১।

জগৎশ্রেণীলসদযশাঃ

পৌর্ণমাসী বললেন—

শ্রীমতীর যশোরাশি সারা জগৎ পরিব্যাপ্ত। সে যশঃকৌমুদী যেন ত্রিভুবনের কুবলয়সমূহকে উৎফুল্ল করে, ইন্দ্রপত্নী শচীর কর্ণে শোভিত ওই শুভ্র কুন্দপুষ্পেরও বিভ্রম জন্মায়, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীকে হর্ষরোমাঞ্চিত করে। হে ভদ্রাঙ্গি! তোমার এই যশশ্চন্দ্রিমাদ্বারা কর্ণভূষণের চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয় দেখে, বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীও যেন চকিতা হয়ে ওঠেন। ৩২।

গুর্বর্পিত গুরুস্নেহা

শ্রীরাধা গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী। যশোদার সম্মুখে একদিন যখন শ্রীমতী লজ্জাবনতমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি সস্নেহে বলেছিলেন—তুমি তো কীর্তিদার কন্যা নও, আমারই কন্যা। শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করে আমার নয়ন যেমন তৃপ্ত হয়, তোমার মুখচন্দ্রিমা দেখেও যেন তেমনি পরিতৃপ্ত হচ্ছে। ৩৩।

সখীপ্রণয়াধীনা

শ্রীমতী বলেছিলেন, হে সখিবৃন্দ! তোমরা গিয়ে ব্রজরাজতনয়কে বল যে—আমি সকল সখীদের অধীনা, আমায় যেন তিনি বৃথা

বেদনা না দেন। মানিনীদের মন্দির থেকে তাঁকে সরে যেতে বল। নইলে, আশঙ্কা আছে। তিনি কি ললিতার পরাক্রম জানেন না! সে দেখলেই যে-কোন ছলে তাঁকে আক্রমণ করবে। ৩৪।

কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে শ্রীমতী অতিশয় প্রধানা। তাই মাধব বলেছিলেন—হে খঞ্জন-নয়না, নিরন্তর ঘূর্ণায়মান নয়ন ও নানা অপাঙ্গভঙ্গিযুক্তা লালাময়ী সুন্দর-ভ্রূ-বিশিষ্টা নারী অনেকেই আছেন, কিন্তু খরতর রবিকরতাপিত জ্যৈষ্ঠ মাসের আকাশ যেমন তারা পরিবৃত হলেও চন্দ্রকিরণ ভিন্ন মনকে স্নিগ্ধ করতে পারে না, তেমনি তোমা ব্যতিরেকে ওই অসংখ্য সুন্দরীগণ ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার মনকে প্রসন্ন করতে পারে না। ৩৫।

সন্ততাশ্রবকেশবা

অর্থাৎ কেশব সর্বদা যার আজ্ঞাধীন।

শ্রীমতী বলেছিলেন—হে মাধব! তোমার ওই নবপল্লবরচিত চূড়া তেমন সুদৃশ্য হয় নি। ভ্রমরের অভুক্ত কুসুমদাম ও ময়ূর-পুচ্ছ সংগ্রহ করে নিয়ে এসো, আমি স্বহস্তে তোমার মোহন-বেশ রচনা করে দিই। শ্রীরাধার কথামত মাধব তন্মুহূর্তেই সেইসব জিনিস আহরণ করে এনে, বলেছিলেন—বলো প্রিয়তমে, বশম্বদজনের প্রতি আর কি আজ্ঞা?

শ্রীরাধার সর্বোত্তম যূথমধ্যে আর যে-সব সদ্‌গুণমণ্ডিতা সুন্দরী আছেন, তাঁরাও ছলকলায় সর্বতোভাবে মাধবকে আকর্ষণ করেন। এই সকল সখী পাঁচ প্রকার হয়, যথা—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী। তন্মধ্যে কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখীরূপে পরিগণিতা। ৩৬।

কস্তুরিকা ও মণিমঞ্জরিকা প্রভৃতি কয়েকটি গোপীকে নিত্যসখী বলা হয়। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। এঁরা

প্রায়ই শ্রীরাধাস্বরূপিনী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা ও শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখীমধ্যে গণ্যা। আর পরমপ্রেষ্ঠসখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই আটজন সর্বগুণভূষিতা।

এই ললিতাদি অষ্টসখী রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা বশতঃ কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমতী হন, কখনো বা শ্রীরাধার প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করে থাকেন। খণ্ডিতা অবস্থায় শ্রীরাধা যখন ব্যথিত অন্তরে থাকেন, তখন তাঁরা শ্রীমতীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে, মাধবের সম্পর্কে দোষারোপ করেন। আবার মান অবস্থায়, শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণকে অনাদর করেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, শ্রীমতীকে দোষারোপ করেন। ৩৭।

নায়িকা ভেদ

উল্লিখিত যূথমধ্যে যেমন সখী, নিত্যসখী ও প্রিয়সখী প্রভৃতি নানাবিধ 'সখীগণ' আছেন, তেমনি তাঁদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আবার প্রকৃতি এবং বিবিধ গুণের পর্যায়-ইত্যাদিক্রমে নানা গণভেদ (group) আছে। ১।

নাট্য ও শৃঙ্গার রসে পরোঢ়া নায়িকা নিষিদ্ধা। কিন্তু এই নিষেধ শুধু প্রাকৃত বা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গোপীগণের যে প্রেম লোকাচারের অতীত, সে ক্ষেত্রে এই পরকীয়া প্রেম নিন্দনীয় নয়। সেখানে প্রেমের পরকাষ্ঠাই একমাত্র লক্ষণীয় বস্তু। ২।

মুখ্যরসে কবিগণ পরকীয়া রমণী অবাঞ্ছিত মনে করেছেন। কিন্তু ব্রজদেবীগণের বিষয়ে তার অন্যথা হয়েছে, কারণ এই বিশেষ রসের আস্বাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ওই সকল পদ্মলোচনা নারীর অবির্ভাব করিয়েছিলেন। ৩।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের যে অনির্বচনীয় ভাবনিষ্ঠা, সেই ভাবের পরাকাষ্ঠারহস্য ভক্তজনেরাও সম্যক্ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। এই দুর্গম ভাবরহস্য একমাত্র বৈকুণ্ঠনাথ ব্যতীত অন্যের অধিগম্য নয়। ৪।

গোকুলের যে-সব নারী নন্দনন্দনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই সর্বাধিক। একদিন পরিহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম আপন শক্তিতে তাঁকে দ্বিভুজ করেছিল। প্রণয়-সহচর স্বাভাবিক মানব মূর্তিতে তিনি ধরা না দিয়ে পারেন নি। ৫।

গোপেন্দ্রনন্দনের নারায়ণমূর্তি দেখে গোপবালাগণ প্রার্থনা করেছিলেন—'ভগবান্, যাতে আমরা গোপিকারমণের দর্শন পাই সেই অনুগ্রহ কর।' তাঁদের কামনা সফল হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য!

গোপবালাগণ দূরে সরে গেলে, যখনই শ্রীরাধা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর প্রেমের সুগভীর আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আর পারলেন না চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে থাকতে। তাঁকে দ্বিভুজ মূর্তি ধারণ করতে হলো। ৬।

নায়িকার প্রকারভেদ

কবিগণের মতে নায়িকা তিন প্রকার—স্বকীয়া, পরকীয়া, ও সাধারণী বা সামান্যা।

সামান্যা নায়িকা ও রসাভাস

সামান্যা নায়িকার স্বভাব বহুনায়কনিষ্ঠ হয়, সেইজন্য রসাভাসের প্রসঙ্গ আসে। রসাভাস বলতে বুঝায় নীচ বা নিম্নস্তরের রস অর্থাৎ যে রস শিষ্টজনের অযোগ্য। কিন্তু সৈরিন্ধ্রী বা কুব্জা সাধারণী নায়িকা হলেও, অন্য নায়কের প্রতি তার প্রীতির সঞ্চার হয় নি। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চন্দন লেপন করতে গিয়ে, কুব্জার অন্তরে প্রীতি সঞ্চারিত হয়। সেইজন্য কৃষ্ণের উত্তরীয় বসন আকর্ষন করে সে রতি প্রার্থনা করে। তাই সামান্যা বা সাধারণী হলেও কুব্জা পরকীয়া নায়িকা রূপে পরিগণিতা। ৭।

সামান্যা নায়িকাকে বেশ্যা বলা চলে। নির্গুণ নায়কের প্রতি যেমন তার কোন অনাদর নাই, গুণবান্ নায়কের প্রতিও তেমনি কোন অনুরাগ নাই। সামান্যা নায়িকা শুধুমাত্র বিনিময়ের প্রত্যাশা করে—দ্রব্য বা অর্থ। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে শুধু শৃঙ্গারাভাস মাত্র হয়, প্রকৃত শৃঙ্গাররসের পুষ্টি হয় না।

পূর্বে যে স্বকীয়া এবং পরকীয়া—এই দুই প্রকার নায়িকার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যেমন—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা। ৮।

কোন-কোন বিদগ্ধজনের মতে, স্বকীয়া নায়িকাদের তিনটি প্রকার ভেদ হয়। কিন্তু পরকীয়া নায়িকাদের এই তিনটি শ্রেণী বিভাগ সর্বজন স্বীকৃত নয়। ৯।

কোন-কোন কবি অবশ্য ওই দ্বিবিধ নায়িকারই তিনটি করে প্রকারভেদ স্বীকার করেছেন। ১০।

মুগ্ধা

নবীন বয়স, অল্পমাত্র কাম, রতিবিষয়ে অনাগ্রহশীলা, সখীদের অনুগতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জা বোধ করে—অথচ গোপনে প্রেমাস্পদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীলা, প্রিয়তম অপরাধী হলে, তাঁর প্রতি সজল নয়নে চেয়ে থাকে, প্রিয় বা অপ্রিয় বচন বলতে পারে না, মান বিষয়ে সর্বদাই বিমুখী, কথায়-কথায় রাগ বা অভিমান করে না। এই প্রকার নায়িকাকে মুগ্ধা নায়িকা বলে।

নববয়াঃ

দূর থেকে অভিসারিকা বিশাখাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

বিশাখার মধুর যৌবন-বসন্তের আবির্ভাব হলো; তার শৈশব শিশিরের অবসান হয়েছে। তাই লোচনপদ্মে বিকশিত হয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য! অধরচন্দ্রিমায় লাবণ্যরাশি বিস্ফুরিত। ১১।

একদিন পরিহাসচ্ছলে শ্যামলা বলেছিল—

শ্রীরাধার তনুদ্বীপ হতে বাল্যরূপী অন্ধকার অপসৃত হয়ে, এখন তারুণ্যতপনের বিজয় আরম্ভ হওয়ার সময় হলো। ওই দেখ, কৃষ্ণবর্ণ গগনমণ্ডলে ভাস্করের প্রকাশ! নয়নতারা চঞ্চল হলো, বক্ষে উদয়গিরির শোভা বর্ধিত হয়েছে, বদনকমলে প্রফুল্লতা সূচিত হয়েছে, মুখাম্বুজে স্মিতহাসি ফুটে উঠেছে। কাজেই, হে বাল্য! এ-অঙ্গে এখন আর তোমার স্থান নাই। ১২।

নবকামা

নান্দীমুখী ধন্যাকে বলেছিলেন—অয়ি বালা! প্রৌঢ়া আভীর-বধূগণ ছল করে কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার কন্দর্প-উৎসব-রসের কথা প্রস্তাব করলে, তুমি মধুর লজ্জায় অবনতমুখী হয়ে, দুই কানে হাত

চাপা দাও ; ছল করে, উল্লাসভরে বনমালা গাঁথতে মনোযোগিনী হও। প্রিয়তমে ! বলো দেখি, তোমার হৃদয়মধ্যে এ কি নবতম রঙ্গ আবির্ভূত হলো ? । ১৩ ।

রতিবামা বা রতিবিষয়ে পরাঙ্মুখী

দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণ যখন পথ অবরোধ করে ধন্যার গতিরোধ করেছিলেন তখন ধন্যা বলেছিল—

হে শিখিপিঞ্ছচূড় ! পথ ছাড়ো, আমি নববালিকা, আমার সঙ্গে এ ধরণের কৌতুক করো না। ওই দেখ, তোমার আচরণ দেখে, যমুনাতীরে বিচরণশীলা সুনয়না সুন্দরীরা সকলে আঁখি নত করেছেন। ১৪।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেছিলেন—সখা ! একদিন যমুনাপুলিনে আমায় দেখে শ্রীরাধা পলায়ন-উদ্যতা হয়েছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর হাত ধরলে, ঈষৎ হাস্যসহকারে তিনি অতিশয় চঞ্চলনেত্রা হয়ে গদ্‌গদকণ্ঠে বলেছিলেন—'গোকুলনাথ, আমার হাত ছাড়ো।' আমি খঞ্জনলোচনার সেই মধুর রতিবামা মূর্তি সর্বদাই স্মরণ করি।

সখীবশা

অভিসারিকা শ্রীরাধাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করবার জন্য উৎসুক হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, তাঁর কঠিন করদ্বয় দেখে ললিতা বলেছিলেন—কোন কুশল ব্যক্তি হস্তীর করাল কবলে কোমল পদ্মমৃণাল সমর্পণ করে ? হে ব্রজরাজ, তোমার কর্কশ হস্তে সুকুমারী রাধাকে আমি অর্পণ করবো না।

ধন্যার উক্তি—

সখি ! এই যে কৃষ্ণের দেওয়া কুন্দমালা দেখছো, এ-মালা আমি স্বীকার করে নিই নি। তুমি রোষভরে আমার প্রতি অমন বিকট ভ্রূকুটি করো না। বিপক্ষ-পক্ষপাতিনী চটুলা বৃন্দা আমার বসন-পেটিকায় এ মালা ছুঁড়ে দিয়েছে। আমি কি করবো, বলো ? এতে আমার কোন অপরাধ নাই।

সব্রীড়রতি-প্রযত্না

কুঞ্জকি নিকটে আসি পদ দুইচারি নাগর মিলন আসে,
কম্পিত অঙ্গ রঙ্গ করি ফিরল ধৈরয লাজবিলাসে।
সখিগণ সাধি সেজপর নেওল নাগর আসি করু কোর।
রাধা মাধব কুঞ্জভবন মাঝে দুঁহু রহু আনন্দভোর॥

রতিবিষয়ে আগ্রহশীলা, কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দেয়। এই ব্রীড়ারতপ্রযত্না মধুরা নায়িকার প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেছিলেন—সখে, সেই হরিণাক্ষী শ্যামলার লজ্জাজড়িত রতিপ্রয়াস আমার চিত্ত হরণ করেছে। ১৫।

রোষ-কৃতবাষ্পমৌনা

হে কদম্ববনভুজঙ্গ! তুমি অদক্ষিণ। তোমার অপরাধ সপ্রমাণ হয়েছে, তাই প্রিয়সখী রোষবশে বাষ্পমৌনা হয়ে আছেন। তিনি তোমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না। বসনে মুখ ঢেকে তিনি কাঁদছেন; তাঁকে কাঁদতে দাও। আর বিড়ম্বিত করো না।

মাধব মানস চঞ্চল তোর। তোহে নাহি বাণী কবহু সখী মোর॥
না কর বিড়ম্বন ছাড় অভিলাষে। রোদন করু ধনী মুখঝাঁপি বাসে॥

মানে বিমুখী

মানেতে বিমুখ হয় দুইত প্রকার।
কেহ নাহি সহে মান, কেহ মৃদ্বী আর॥

মৃদ্বী

মৃদ্বী বা মৃদুস্বভাবা নায়িকা প্রিয়তমের প্রতি অভিমানিনী হলেও নিষ্ঠুর হতে পারেন না। কঠিন বাক্য উচ্চারণ করতে গিয়ে তাঁর জিহ্বা মিষ্টবাক্যই বলে; ভ্রূকুটি করতে গিয়ে, নয়ন মুগ্ধ-দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকে। দূরে সরে যেতে গেলে, চরণ ওঠে না। ১৬।

অক্ষমা

কোন এক কৃষ্ণবল্লভা আক্ষেপ করে বললেন—

উঃ! পদ্মলোচনা আভীরললনাগণ কি সাহসিকা! কেশবের প্রতি তারা ক্ষণকালের জন্যও মান করতে পারে? কি আশ্চর্য! 'মান' এই অক্ষর দুটি যদি একবার আমার কর্ণে প্রবেশ করে, আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। মান করতে আমি অক্ষমা।

মধ্যা

যে নায়িকার লজ্জা ও রতিলিপ্সা দু-ই সমান, অথচ তারুণ্য-শালিনী ও কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা; যতক্ষণ মূর্চ্ছিতা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সুরত-সম্ভোগে সক্ষমা এবং মানবিষয়ে কখনো খুব মৃদু, কখনো বা কঠিন, তাকেই মধ্যা বলে।

সমানলজ্জামদনা

শ্রীকৃষ্ণ যখন সতৃষ্ণ নেত্রপদ্ম নিক্ষেপ করেন, রাধা ঈষৎ হাস্য সংবরণ করে বদন অবনত করেন; আবার শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলে, শ্রীরাধা প্রীতনয়নে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে থাকেন। এইভাবে সরসিজনয়না শ্রীমতী তাঁর নায়কের আনন্দ বর্ধন করেন। এখানে নায়িকার এই আচরণে মান, লজ্জা ও মদন-লিপ্সার সমন্বয় ঘটে।

প্রদ্যোত্তারুণ্যশালিনী

শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি—

তোমার ভ্রূভঙ্গি মীনধ্বজ কামদেবের ধনুকেও পরাজিত করে, তোমার উরুযুগলের সৌন্দর্য কদলীবৃক্ষের শোভাকেও মলিন করে, তোমার কুচযুগ যেন রূপের চকা-চকী। হে তরুণি-মণি-চূড়ামণি, বর-উরু-বিশিষ্টা বরাঙ্গনা! সকল সুন্দরীর শিরোমণি তুমি। ১৭।

কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা বা প্রত্যুৎপন্নমতি

গৃহসমীপবর্তী উদ্যানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, গুরুজনসন্নিহিতা শ্রীমতীর সংকেতোক্তি—

ও হে কৃষ্ণভ্রমর! মুখপদ্মের মধুপানে তৃষ্ণার্ত হয়ে কেন পতি-সেবার বিঘ্ন ঘটাচ্ছো? যদি তৃষ্ণায় অধীর হয়ে থাকো, পাণ্ডুবর্ণ পুন্নাগকুঞ্জে গিয়ে অসংখ্য পুষ্পের মধুপান করো। ১৮।

মোহান্ত-সুরতক্ষমা

শ্রমজল নিবিড় পূরল সব অঙ্গ। তৈখন বিরমল নয়ন তরঙ্গ॥
বিগলিত চিকুর, বাহু নহে বশ। রতি শয়নে ধনি হোয়ল অলস॥

রতিশ্রমে রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বেদসিক্ত, নয়নদ্বয় নিমীলিত, কেশপাশ আলুলায়িত ও বাহুলতা বিবশ হয়েছিল। তবুও তাঁর মনে আনন্দের পূর্ণতা সঞ্চারিত হয় নি। সেই মোহান্ত-সুরতক্ষমা নায়িকা শ্রীরাধার রতিশয়নের কথা শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃত হতে পারেন না। সেই রতিক্লিষ্টা অথচ সঙ্গলিপ্সাতুরা রাধার মূর্তি সর্বদাই তাঁর মনে পড়ে। ১৯।

মানে কোমলা

তোরে লুকাইতে কিছু নাহি মোর তুমি সে আমার প্রাণ।
নাগরের সনে অনেক যতনে রাখিতে নারিব মান॥
এস এস যাঞ কালিন্দীর কূলে কুঞ্জগহন মাঝে।
কুসুম আনিতে ছলেতে যাইঞা ভেটিগা নাগর রাজে॥

মানবশে নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকতে পারলেন না। তাই দয়িত-সন্দর্শনের আকাঙ্খায় অধীর হয়ে, পুষ্পচয়নের ছলে যমুনাতীরে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন।

মানে কর্কশা

হে কঠিনে!

মিছাই মান করি অঙ্গ মলিন ভেল কাহে কোপহ মধু বচনে।
নাগর কাতর পতিত অব অকূলে ফিরি চাহ চঞ্চল নয়নে॥

মানময়ী নায়িকা তিন প্রকার। যথা—ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা। তাদের আবার মধ্যাগৌণাদি প্রকারভেদ আছে।

যে অভিমানিনী নায়িকা অপরাধী প্রিয়কে উপহাসের সঙ্গে বক্রোক্তি করে, তাকে ধীরা বলা হয়। ২০।

ধীর-মধ্যা

যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খণ্ডিতা রাধা :

লাগল অঞ্জন যাবক রঙ্গ। অব তুঁহু নীললোহিত ভেল অঙ্গ॥
সমুচিত চন্দক ধাবনি দেহে। ইহ এক অনুচিত লাগল মোহে॥

চন্দ্রাবালীর কুঞ্জে নিশিযাপন করে, প্রভাতে যখন শ্রীকৃষ্ণ রাধার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, শ্রীমতী সবিস্ময়ে দেখলেন যে—তাঁর অঙ্গে কজ্জলচিহ্ন, তাম্বুলরাগ, দ্রবীভূত অলক্তরেখা ও নখক্ষত অঙ্কিত। অভিমানিনী রাধা রূঢ় আচরণ করলেন না, শুধু পরিহাসের সঙ্গে বক্রোক্তি করে বললেন—আহা! এ যে দেখছি নীললোহিত রুদ্র-মূর্তি! স্বামিন! উৎকৃষ্ট বেশ হয়েছে। কিন্তু হে পশুপতি, দেহার্ধে তোমার দয়িতা রুদ্রাণীকে বহন করে আনলে না কেন?

'নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে, কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিনু দিন যাবে আজ ভাল॥'
'অধরের তাম্বুল অধরে লেগেছে ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি!
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, নয়ন ভরিয়া দেখি॥'
'সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্বগায়, মোরা হলে মরি লাজে।'

—চণ্ডীদাস

অধীরমধ্যা

যে নায়িকা রোষপরবশ হয়ে নিষ্ঠুরবাক্য-প্রয়োগে দয়িতকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে অধীরা বা অধীরমধ্যা নায়িকা বলে। ২১।

যথা—'ওহে কংসারি! তুমি আর মিথ্যা কথার ঝংকার তুলে ঘণ্টাধ্বনি করো না। ধূর্ত আভীরবধূরা তোমায় বুদ্ধিভ্রষ্ট করেছে। তাদের উচ্চকুচযুগের সহচর মণিহার তোমার গলায় দোদুল্যমান। রজনী-বিলাসের আর কি প্রমাণ প্রয়োজন! যাও, এস্থান তোমার উপযুক্ত নয়।'

ধীরাধীরমধ্যা

যে অভিমানিনী নায়িকা অশ্রুবিমোচন করে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি করে, তাকে ধীরাধীরমধ্যা বলা হয়। ২২।

শ্রীরাধার উক্তি—

ওহে গোপেন্দ্রনন্দন! যাও যাও, এখানে থেকে আর আমায় কাঁদিও না। তুমি যদি এখানে অধিকক্ষণ থাকো, তাহলে তোমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী রুষ্ট হবেন। তোমার শিরোভূষণ মাল্যের দ্বারা তাঁর চরণপদ্মের অলক্তক-রাগ অপহৃত হয়েছে, সেই মাল্যদ্বারা আজ তাঁর চরণপদ্ম আবার বিভূষিত করো।

মধ্যা নায়িকা সকল রসেরই উৎকর্ষ-ক্ষেত্র ও উপযুক্ত। কেন না, মধ্যা নায়িকার চরিত্রে মুগ্ধা এবং প্রগল্‌ভা—এই দুইটিরই সংমিশ্রণ আছে। ২৩।

মধ্যাত্ব ও ধীরাধীরাত্ব—এই দুই-ই শ্রীরাধার স্বাভাবিক ধর্ম। কেউ কেউ বলেন—তিনটিই শ্রীরাধার স্বাভাবিক ধর্ম। মানের তারতম্য বশতঃ এক-এক সময় এক-একটি ভাব প্রকাশ পায়। যথা—

যাহি মাধব, যাহি কেশব, মা বদ কৈতববাদং।

—গীতগোবিন্দ।

এখানে শ্রীমতীর অধীরা ভাব অধিক প্রকাশিত হয়েছে।

প্রগল্‌ভা

পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, বিপরীত রতি-সম্ভোগে উৎসুক, বিবিধ ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, প্রেমাত্মক রসের দ্বারা বল্লভকে আক্রমণ করে, প্রৌঢ়া নায়িকার মত পটিয়সী, বচনকুশলা, প্রেমকৌশলে অতিশয় যত্নবতী, কিন্তু মানবিষয়ে অত্যন্ত কঠিনা—এই শ্রেণীর নায়িকাকে প্রগল্‌ভা বলে। ২৪। তন্মধ্যে—

(ক) পূর্ণতারুণ্যা

স্তনযুগ জিতল করিবর কুম্ভা। গুরুতর উরুযুগ জিতল রম্ভা॥
কটিতট জিতল নদীতট শোভা। লোচন করই সফরী জয়লোভা॥
এ চন্দ্রাবলী তরুণিম রঙ্গে। আভরণ বিনহি ঝলক সব অঙ্গে॥

অতএব হে চন্দ্রাবলি! অঙ্গে অঙ্গে তোমার পূর্ণ তারুণ্যের অমৃত সম্পদ সমধিক উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

(খ) মদান্ধা

কুঞ্জবিলাসের কথা জিজ্ঞেস করলে, চন্দ্রাবলী তাঁর সখীকে বলেছিলেন—গৌরি! রতিকুঞ্জ হতে সখীরা সকলে চলে গেলে, অচ্যুত আমায় শয্যায় শায়িত করে, রিরংসা পরবশ হয়ে এমন দীর্ঘ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন যে, নিমেষে আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম; উত্তাল প্রমোদলহরী মুহূর্তে আমাকে অভিভূত করেছিল! তারপর সেখানে যে কি ঘটেছিল, তা আমি জানি না। ২৫।

(গ) উরুরতোৎসুকা

যে রতিক্রীড়ায় অতিশয় উৎসুক হয়ে, নায়িকা কখনো কখনো নায়কের ভাব ধারণ করে; কখনো বা নায়কের মনে উদ্গত হয় নায়িকাভাব; যাতে নায়িকার করদ্বয় হতে বলয় ভ্রষ্ট হয়, এবং উভয়েরই গাত্রে নখক্ষত চিহ্নিত হয়; রতিরণে ময়ূরপুচ্ছ ও অঙ্গাভরণ স্খলিত হয়; সখি! আমার মন সেই অনঙ্গ-ক্রীড়ারই অন্বেষণ করছে।

(ঘ) ভূরিভাবোদ্গম-অভিজ্ঞা

প্রেমাস্পদকে দেখে নায়িকার চিত্তে যখন একসঙ্গে বিবিধ ভাবের উদ্গম হয়, তখন তাকে ভূরিভাবোদগম-অভিজ্ঞা বলে।

শ্যামলার প্রতি বকুলমালার উক্তি।—হে নমিতাঙ্গি! তোমার অপাঙ্গের শৃঙ্খল যে শিথিল হয়েছে! ঈষৎ বক্র ভ্রূলতা বিস্ফারিত; বদনে অভিলাষযুক্ত হাস্যকলিকা; তনু রোমাঞ্চিত। বীণাবিনিন্দিত

কণ্ঠস্বর! ভ্রমরগুঞ্জিত কুঞ্জে বহুক্ষণ যাবৎ বিরাজ করছো। কারণ কি? আমার আশঙ্কা হয়, অয়ি বন্ধুর-গাত্রি! তুমি কৃষ্ণহরিণকে আকর্ষণ করতে চাও। ২৭।

(ঙ) রসাক্রান্তবল্লভা

অপরূপ কুসুম আনহ ইহ গহনে। বনফুল কর মঝু অঙ্গকি ভূষণে॥
মাধব তুহু যদি মানসি বচনে। আনি কুসুম কুরু ভূষণ রচনে॥
হাম ভুয়া প্রেয়সী গোকুল নগরে। ইহ যশ ঘোষিবে কামিনী নিকরে॥

এখানে নায়িকা নায়ককে আদেশ করছেন যে, রম্য কানন থেকে সুন্দর সুন্দর পুষ্প চয়ন করে এনে, তুমি আমায় সুসজ্জিতা করো। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা দেখে, গোকুলের সুন্দরীরা বিস্মিত হোক। এই উদাহরণে রসাক্রান্তবল্লভা, সন্ততাশ্রবকেশবা ও স্বাধীনভর্তৃকা—এই ত্রিবিধ নায়িকাকেই বুঝায়।

নায়ক যদি সর্বদা নায়িকার নির্দেশানুযায়ী চলতে আগ্রহান্বিত হন, তাহলে সেই নায়িকাকে 'সন্ততাশ্রবকেশবা' বলে। নায়িকা যদি সব সময়ই নায়ককে নিজের আজ্ঞানুবর্তী করে রাখতে আগ্রহান্বিতা হন, তাহলে সেই নায়িকাকে 'রসাক্রান্ত-বল্লভা' বলে। আর স্থান-কাল-অবস্থাবিশেষে নায়ক যদি নিজেই কোন নায়িকার নির্দেশানুবর্তী হন, তাহলে সেই নায়িকাকে 'স্বাধীনভর্তৃকা' বলে। অর্থাৎ নায়িকাই সেখানে স্বাধীনা। ২৮।

(চ) অতিপ্রৌঢ়োক্তি

প্রৌঢ়া অভিভাবিকার ন্যায় নায়িকা যে ভীতি প্রদর্শন করেন এবং নায়কের প্রতি শাসনবাক্য প্রয়োগ করেন, তাকেই বলে অতি-প্রৌঢ়োক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ এসে শ্যামলার গৃহকোণে লুকিয়ে আছেন দেখে, সে অত্যন্ত প্রীতমনা হয়েছে। তবুও বলে—

ধীরে ধীরে আসি গৃহকোণে বসি অঙ্গ ঢাকিয়া তৃণে।
বিনয় করিয়া কি আর কহিছ, কে তোমার কথা শুনে॥

কোথা গেল আজি সে সব চাতুরি। সেদিন যমুনা তীরে
ভাঙ্গা তরী পাঞা গোপীগণ লঞা যে দুখ দিয়াছ মোরে ॥

বৃথা আর মিনতি কেন? সেদিন তুমি ভীতচিত্তা আভীরবধূদের জীর্ণ তরীতে তুলে, ইতস্তত চালনা করে, বিড়ম্বিত করেছিলে। তোমার সেই চাতুরি আজ কোথায়?

(ছ) অতিপ্রৌঢ়-চেষ্টা

চন্দ্রাবলীর সমক্ষে পদ্মা এসে উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ পদ্মাকে বলেছিলেন—

পদ্মা, আজ অনঙ্গোৎসবে তোমার এই সখীর উচ্চ-কুচোপরি অবস্থিত মুক্তাহার যেন নৃত্য করছিল। সেই হারের মধ্যস্থিত মণিটি চঞ্চল হয়ে, আমার বক্ষস্থিত কৌস্তুভমণিকে বারবার প্রহার করেছে।

এই ধরণের প্রচেষ্টাকে অতিকুশল প্রচেষ্টাও বলা চলে। এখানে এক প্রিয়তমা নায়িকার সমক্ষে অন্য-এক প্রিয়তমা নায়িকার প্রতি এই উক্তি। অভিজ্ঞ প্রেমিক নায়কের পক্ষে অতিকুশল প্রচেষ্টা। এই উক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য—চন্দ্রাবলীকে পদ্মার সম্মুখে লজ্জা দেওয়া, এবং পদ্মার অন্তরে সম্ভোগলিপ্সা জাগিয়ে তোলা। এতে নায়িকার মনে প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সঞ্চারিত হয়।

(জ) মানে অত্যন্ত-কর্কশা

উদ্ধবসন্দেশে শ্যামলার প্রতি বকুলমালার উক্তি—

তুয়া প্রিয় মালতী ধরণীপর লুটই দ্বারহি নাগর কান।
সখীগণ কোই, কোই নিশি বঞ্চল, তভূ নাহি ছোড়লি মান ॥

তোমার প্রিয় মালতীলতা অনাদরে ভূলুণ্ঠিতা ও ম্লানপুষ্পা। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ তোমার দ্বারে বিমনা হয়ে খেদোক্তি করছেন। তোমার চোখেও রাত্রে ঘুম নাই। অকারণ নিজে ব্যর্থরাত্রি যাপন করে, সখীদের কাঁদাচ্ছো। তোমার এই মানের নবমাধুর্য তো কিছু দেখি না। ২৯।

মান হৈতে প্রগল্‌ভা হয় তিন প্রকার।
পূর্ব্বমত জানিবে ধীরাদি ভেদ তার ॥ ৩০ ॥

মান অবস্থায় প্রগল্‌ভা নায়িকাও তিন প্রকার হয়—ধীর প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা এবং অধীরপ্রগল্‌ভা।

ধীরপ্রগল্‌ভা

ধীরপ্রগল্‌ভা মানিনী নায়িকা সুরতসম্ভোগে উদাসীনা হন। আদরান্বিতা হলেও, তিনি প্রেমাত্মক আকার-ইঙ্গিত সংগোপন করে চলেন, এবং নায়কের অনুরোধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

ভদ্রা মানিনী হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—ভদ্রে! আজ তাম্বুল আস্বাদন কর নি কেন?

বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রা বলেছিলেন—গোকুলনাথ, আমার এখনো দেবী-অর্চনা হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—প্রিয়তমে! আমি মালা গেঁথে এনেছি, তুমি পরো।

ভদ্রা বলেছিলেন—কৃষ্ণ! তোমার শিল্প-পরিচয় পেয়ে আমার গৃহপতি পরিতাপযুক্ত হন। অতএব তোমার গাঁথা এই মালা আমি অঙ্গীকার করতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন—কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তুমি আমার কথা শোন।

ভদ্রা বললেন—ব্রজেশ্বরী আমায় আহ্বান করেছেন। আমায় এখনই যেতে হবে। তোমার কথা শুনবার অবকাশ আমার এখন নাই।

এই প্রকার বিনয়ের দ্বারা ভদ্রা তাঁর মানকেই প্রমাণিত করেছিলেন। প্রগল্‌ভা হলেও, তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি। ৩১।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পালীর উক্তি।

এ বনমাল কণ্ঠে নাহি ধারব বরত-নিয়ম হয় নাশ।
দ্বিজগণ কঠিন মৌন বুঝে দেওল তহিলাগি বচন নিরাশ ॥

গুরুজন পুনপুন মুঝে কত ডাকই তুহু লাগি করলু পয়াণ।
ঐছন চাতুরী বচন শুনি মাধব বুঝল তাকর মান ॥

এ বনমালা কণ্ঠে ধারণ করলে, আমার ব্রতের কঠিন নিয়ম নষ্ট হবে। ব্রাহ্মণেরা আমায় কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করতে বলেছেন, তাই কথা বলা নিষেধ। হে মধুভাষি! তোমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে কার ইচ্ছা করে! খলস্বভাবা শাশুড়ী আমায় এক্ষুণি ডেকেছেন। তাই আর আমি নির্বিঘ্নে অপেক্ষা করতে পারলাম না। ৩২।

চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ—

যব হাম কুচতটে দেয়লু হাত। করে নাহি ঠেললি না কহলি বাত ॥
পুন পুন চুম্বনে মুখ রহু ধীর। নিবিড় আলিঙ্গনে তনু রহু থির ॥
কিয়ে চন্দ্রাবলী মানতরঙ্গ। ঐছন নাহি দেখি মানকি রঙ্গ ॥

এখানেও নায়িকার নিষ্ক্রিয়তা এবং মৌন মান ধীর-প্রগল্‌ভতা (silent arrogance) সূচক।

অধীর প্রগল্‌ভা

যে কান্তা ক্রোধভরে নায়ককে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না ও তিরস্কার করেন, তাঁকে অধীর-প্রগল্‌ভা বলে।

মনোবেদনায় অধীরা হয়ে গৌরী বলেছিলেন— হে কংসারি! আমরা মুগ্ধা নারী, তাই তোমার উচিত প্রতিবিধান করতে জানি না। প্রিয়সখী শ্যামলার চরণ বন্দনা করি ; সে প্রকৃত নীতি জানে, তাই মধুকরগুঞ্জিত মল্লিকাদামে তোমার কণ্ঠদেশ বন্ধন করে, সে উপযুক্ত তিরস্কার করেছিল এবং কর্ণোৎপলদ্বারা বারবার তোমায় প্রহার করেছিল।

উত্তমা স্ত্রী অপরাধী কান্তের প্রতি অভিমানিনী হয়ে, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে পারে। কিন্তু তাঁর অঙ্গে

আঘাত করতে পারে না। তবুও উদাহরণ দিয়ে সে বুঝিয়ে দেয় যে, সেই শাস্তি যাঁরা দিয়ে থাকেন, তাঁরা নমস্য।

ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা

ধীরাধীরা নায়িকার যে সকল গুণ থাকে, ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা নায়িকারও সেই সকল গুণ বিদ্যমান থাকে। ৩৩।

মঙ্গলা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল—আমার চিত্তে ক্রোধের গন্ধও নাই। ব্রত উপলক্ষ্যে আমি মৌন অবলম্বন করেছি। তবুও প্রীতি বশতঃ তোমায় বলছি যে, নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করবার চেষ্টা পরিত্যাগ করে, শীঘ্র পলায়ন করো। সখীরা তোমায় মাল্যরজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়; শেষে আপন প্রিয়তমাকে আর দেখতে পাবে না। ৩৪।

মাধব যখন অপরাধী হয়ে মঙ্গলার স্তুতি আরম্ভ করেছিলেন, মঙ্গলা ভ্রূলতা কুঞ্চিত করে কর্ণভূষণ পদ্মটি হাতে নিয়েছিল। সেই পদ্ম দিয়ে তাঁকে সে প্রহার করে নি, তবে 'এখানে কেন, যাও যাও' বলে মুখ ফিরিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই 'যাও যাও' বলা পর্যন্ত নায়িকার অধীর ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটুকু তার ধীর ভাবই প্রতিপন্ন করে। ৩৫।

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা

কিশোরীদের আকৃতি ও প্রকৃতির ভিতর একটা প্রগল্‌ভ চঞ্চলতা থাকে, কিন্তু একটু বয়স বাড়লেই কারো কারো প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়।

নায়িকাগণের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা—এই দুই প্রকারভেদ হয়। যেমন, জ্যেষ্ঠা-মধ্যা ও কনিষ্ঠা-মধ্যা এবং জ্যেষ্ঠা-প্রগল্‌ভা ও কনিষ্ঠা-প্রগল্‌ভা।

নায়কের দিক থেকে প্রণয়ের আধিক্য ও অল্পতা হেতু নায়িকাগণের ভিতর ওই প্রকার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদ হয়। যার প্রতি নায়কের প্রীতি বেশী—সে জ্যেষ্ঠা, এবং যার প্রতি তার চেয়েও কম প্রীতি, সে কনিষ্ঠা। ৩৬।

'মধ্যা প্রগল্‌ভা হয় দুইত প্রকার।
কেহ কৃষ্ণপ্রেমে জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা কেহ আর ॥'

মধ্যার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-ভেদ

বৃন্দা দেবী নান্দীমুখীকে বললেন—

দেখ, কুঞ্জগৃহে লীলা ও তারা দুজনে মুখোমুখি ঘুমিয়ে আছে। দুজনেই কৃষ্ণের প্রিয় নায়িকা। তবুও শ্রীকৃষ্ণ লীলার নয়ন-পল্লবে পুষ্পরেণু ছড়িয়ে দিয়ে, তার ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছেন; আর শীতল তালবৃন্তের ব্যজনী দিয়ে বাতাস করে, তারার নিদ্রাকে গভীরতর করবার চেষ্টা করছেন।

লীলা ও তারা—দুজনেই কৃষ্ণপ্রিয়া। কিন্তু লীলার প্রতি প্রণয়ের আতিশয্য হেতু শ্রীকৃষ্ণ তারার নিদ্রাকে গাঢ়তর করে, লীলার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার সঙ্গে অবাধ সম্ভোগলীলায় রত হতে চান। দুজনেই জেগে উঠলে, সেই সম্ভোগের সুযোগ বিঘ্নিত হবে। তাই, যে অধিকপ্রিয়া তার নিদ্রা ভঙ্গ করে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকার নিদ্রা গভীরতর করবার চেষ্টা করলেন। এখানে লীলা জ্যেষ্ঠামধ্যা ও তারা কনিষ্ঠামধ্যা নায়িকা রূপে পরিগণিতা। ৩৭।

প্রগল্‌ভা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা

পৌর্ণমাসীর প্রতি বৃন্দার উক্তি—

দেবি! গৌরী ও শ্যামলা দুজনে কৌতুকচ্ছলে পাশা-খেলায় বসেছিল। উভয়েরই পণ এই যে, পাশা খেলায় যে পরাজিত হবে, সে তিনদিন কৃষ্ণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হবে। খেলা আরম্ভ হতেই কৃষ্ণ এসে মধ্যস্থ হলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গি দেখে, তাঁর মনোভাব নির্ণয়

করা কঠিন। তিনি ইসারায় গৌরীকে অক্ষচালনার উপদেশ দিতে লাগলেন। গৌরীর জয়লাভ আসন্ন হয়ে উঠলো। কিন্তু অক্ষচালনায় শ্রীকৃষ্ণের নৈপুণ্য এত অসামান্য যে, শেষের কয়েকটি সংকেতে গৌরীর পরাজয় ঘটলো। শ্যামলা হলো সেই খেলায় বিজয়িনী।

দুজনেই কৃষ্ণপ্রিয়া। তবু একজনকে অক্ষচালনার উপদেশ দিয়ে খুসী করলেন, অন্যকে সুখী করলেন বিজয়িনী করে। বাহ্যতঃ গৌরীকে সমর্থন করলেও, বস্তুতঃ প্রেমতাৎপর্যে এখানে শ্যামলা হলো জ্যেষ্ঠা, গৌরী হলো কনিষ্ঠা। অবশ্য এই দুইটি প্রকার-ভেদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ৩৮।

পঞ্চদশবিধ নায়িকা

কন্যার প্রকারভেদ

কন্যা সর্বদাই মুগ্ধা হয়, তার কোন অবস্থান্তর নাই। কিন্তু ওই মুগ্ধাকে স্বীয়া ও পরোঢ়া এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা—এই তিনটি আবার স্বীয়া ও পরোঢ়া ভেদে ছয় প্রকার হয়। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ধীরাদি তিনটি শ্রেণীভেদে ছয় প্রকার হয়। তা ছাড়া, কন্যা, স্বীয়া ও পারোঢ়া ভেদে মুগ্ধা তিন প্রকার। পর্যায়ক্রমে নায়িকার মোট সংখ্যা পঞ্চদশ। কন্যা-মুগ্ধা এক, এবং স্বীয়া ও পরোঢ়া উভয়েই সাতটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে মোট চতুর্দশ। যথা—

স্বীয়া	পরোঢ়া	
মুগ্ধা, ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, ধীরপ্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা, ধীরাধীর প্রগল্‌ভা	মুগ্ধা, ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, ধীরপ্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা ধীরাধীর, প্রগল্‌ভা	এবং কন্যামুগ্ধা

নায়িকার অষ্টাবস্থা

অভিসারিকা বাসকসজ্জা আর উৎকন্ঠিতা,
খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা ও কলহান্তরিতা,
প্রোষিতভর্তৃকা আর স্বাধীনভর্তৃকা।
এই অষ্ট অবস্থাতে রহয়ে নায়িকা ॥

অভিসারিকা

যে নায়িকা প্রেমাস্পদকে অভিসার করায়, অথবা নিজে অভিসার করে, তাকে অভিসারিকা বলে। অভিসারিকা নায়িকা জ্যোৎস্না বা অন্ধকার রাত্রে শুক্ল বা কৃষ্ণ বর্ণের বসনে অঙ্গ আবৃত

করে অভিসারে যায়। শুক্লপক্ষে শুভ্রবাসপরিহিতা নায়িকাকে বলে জ্যোৎস্নাভিসারিকা আর কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবসনে আবৃতা অভিসারিকাকে বলে তমোঽভিসারিকা। লজ্জায় অঙ্গে অঙ্গ আবৃত করে, অবগুণ্ঠিতা নায়িকা নিঃশব্দে প্রিয়তমের নিকটে যায়; সঙ্গে থাকে স্নিগ্ধা একটি সখী। ৩৯।

অভিসারয়িত্রী

অর্থাৎ কান্তকে যে অভিসার করায়।

শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন—সখি! তুমি সত্বর কৃষ্ণের নিকটে যাও। তিনি যেন আমার মনের সম্ভোগ-লিপ্সা জানতে না পারেন। তুমি সস্নেহ-কৌশলে এমন ভাবে প্রার্থনা ক'রো যাতে আমার প্রতি প্রীতিমান্ হয়ে তিনি নিজে অভিসার করেন। কৃষ্ণা চতুর্থীর অন্ধকার রাত্রি, আমার প্রাণহরণকারী চাঁদ পূর্বাকাশ চুম্বন করবার পূর্বেই যেন তিনি এসে মিলিত হন। ৪০।

জ্যোৎস্নায় স্বয়মভিসারিকা

বিশাখা শ্রীরাধাকে বললেন—সুন্দরি! চন্দ্র আজ বৃন্দারণ্যে নিবিড় জ্যোৎস্নারাশি ছড়িয়েছে। তাই দেখে, ব্রজরাজনন্দন উদ্যান-বীথিকা পানে চেয়ে আছেন। তুমি চন্দনচর্চিতা হয়ে, শুভ্র পট্টবাস পরিধান করে, কেন সেই পথে তোমার চরণারবিন্দ পরিচালনা করছো না!

তমোঽভিসারিকা

সখি! পুণ্যবতীরা তিমির-কৃষ্ণ বসনে অঙ্গ আবৃত করে কদম্ব বনে চলেছে কৃষ্ণ-অভিসারে। কিন্তু হায়! তুমি যে নিজেই নিজের বৈরী হয়েছ। তোমার অঙ্গের বিদ্যুৎ-বর্ণদ্যুতি নীলবসনে ঢাকা পড়ে না। এই তামসী নিশার ঘন অন্ধকার ভেদ করে, সে বর্ণচ্ছটা আত্মপ্রকাশ করছে। ৪১।

বাসক সজ্জা*

কান্তের আগমন প্রতীক্ষায়, তাঁর অভিলাষ অনুসারে কুঞ্জভবনে থেকে, নিজদেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করে রাখা, হলো বাসকসজ্জা। আর এইভাবে যে নায়িকা স্মরক্রীড়া-সংকল্প করে প্রিয়তমের পথপানে চেয়ে থাকে, এবং সখীদের সঙ্গে মধুর আলাপনে রত হয়, ও মুহুর্মুহুঃ দূতীর পানে চায়, সেই নায়িকাকে বলে বাসকসজ্জিকা। যথা—

শ্রীমতীকে দেখে রূপমঞ্জরীর উক্তি—

মদন কুঞ্জপর বৈঠল সুন্দরী নাগর মিলব আশে।
নবনব কিসলয়ে সেজ বিছাওল কুসুমনিকর চারুপাশে॥
সুন্দরী সাজল বাসক সাজ।
প্রেম জলধিজল নিগমন ভাবই আওব নাগর রাজ॥
কত কত আভরণ নেওল অঙ্গহি বদনে সুধাসম হাস।
দেখ দূতী নাগর কতদূর আয়ত ঘন কহে ঐছন ভাষ॥

সুন্দরি! ওই দেখ, শ্রীরাধা রতিক্রীড়ার যোগ্য কুঞ্জগৃহ, পুষ্প-শয্যার উজ্জ্বল রুচি, এবং অলঙ্কারভূষিত নিজদেহ সন্দর্শন করে, হাস্য করছেন। বার বার তিনি চিন্তা করছেন, কি প্রকারে সঙ্গমবিধির সমৃদ্ধিসাধন করবেন। বাসকসজ্জিকা শ্রীমতী আজ মদনমদে উন্মত্তা হয়ে আছেন। ৪২।

উৎকণ্ঠিতা

বহুক্ষণ যাবৎ প্রিয়তম না এলে, বিরহে যে নায়িকার চিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হয় এবং সেইজন্য তার হৃদয়ের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, অঙ্গ বেপথুমান হয়, সে অকারণ বিতর্ক করে, চোখের জল মোছে ও আপনার অবস্থা অন্যকে বলতে চায়, সেই নায়িকাকে বলে উৎকণ্ঠিতা। ৪৩।

*সেই ত বাসকসজ্জা হয় অষ্টভেদ। অন্নই সঙ্কেপে কহ এ বিভেদ॥
মোহিনী, জাগ্রতী আর হয় ত রোদিতা। মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্ভা, বিনীতা॥
সুন্দরা উদ্দেশা—এই অষ্টপ্রকার। শ্লোক পদ্যগীতে হয় ইহার বিস্তার॥ —রসমঞ্জরী,

যথা—চন্দ্রাবলী পদ্মাকে বললেন, সখি! ব্রজেন্দ্রনন্দন কি আজ শ্রীরাধার কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ হলেন! না অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো? আমি যে কিছুই অনুমান করতে পারছি না। আজ কৃষ্ণাষ্টমী, ওই দেখ. পূর্ব গগনে নিশানাথ উদিত হয়েছে। কিন্তু প্রাণনাথ যে এখনো আমায় স্মরণ করলেন না! কারণ কি?। ৪৪।

বাসকসজ্জা অবস্থায় দয়িতের সঙ্গে মিলন না হলে, নায়িকার অন্তরে মান বা অভিমান সঞ্চারিত হয়। তারপর সেই মানের বিরতি হলেও, যদি নায়কের পারতন্ত্র্য বা পরাধীনতার জন্য পূর্ণ মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, তখন জাগে 'উৎকণ্ঠা'।

নাগর গমনে পড়ল বুঝি বাধা। নিজগুণে বান্ধি রাখল বুঝি রাধা॥
কি এ ব্রজমণ্ডলে আওল সুনারী, তা সনে সঙ্গম করয়ে মুরারি॥
দেখ শশী হোওল এ আধ রাতি। গহনক ঘেরল হিমকর ভাতি॥
বিরহ বেদনে অব মঝু প্রাণ যায়। অবহি না আওল নাগর রায়॥

খণ্ডিতা

সময় পার হয়ে গেলেও নায়কের দর্শন মেলে না। কিন্তু সেই নায়ক অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে, সম্ভোগ-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে, যদি পরদিন প্রভাতে এসে উপস্থিত হন, তাহলে প্রেয়সীর খণ্ডিতা অবস্থা হয়। এই অবস্থায় নায়িকার রোষ, দীর্ঘনিশ্বাস ও তূষ্ণীভাবাদি সঞ্চারিত হয়। ৪৫।

যথা কৃষ্ণের অবস্থা দর্শনে বকুলমালার প্রতি শ্যামলা—

যাবক রঙ্গে রঙ্গায়লি নিজশির ভুজে বহু কঙ্কণ চিণ।
কুচতট-কুঙ্কুম-রঞ্জিত-হৃদিতট বনফুলমাল মলিন॥
ঘূর্ণিত-লোচন ব্রজপতিনন্দন আওল নিশি পরভাতে।
শ্যামলার বদনে রহল তব মুনিগুণ রওল রুদ্রগুণ চিতে॥

অন্য নায়িকার সঙ্গে রতিসম্ভোগের চিহ্ন দয়িতের অঙ্গে দেখে, সুমুখীর মুখ নীরব হলো, কিন্তু অন্তর দগ্ধ হলো রুদ্ররোষে। ৪৬।

---

* উৎকণ্ঠিতা অষ্টবিধ—উন্মত্তা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, প্রগল্ভা ও নির্বন্ধা।

পীতাম্বরের রসমঞ্জরী মতে খণ্ডিতা বিবিধ রকমের। যথা—ধীরা, অধীরা, সমা, বিদগ্ধিকা, নিন্দয়া, ক্রোধ-প্রগল্‌ভা, মধ্যা, মুগ্ধা, রোদিতা, প্রেমমত্তা ইত্যাদি।

বিপ্রলব্ধা

সংকেত করা সত্ত্বেও যদি নির্দিষ্টস্থানে প্রাণনাথ না আসেন, তা হলে যে নায়িকার অন্তর অত্যন্ত বেদনার্ত হয়, মনীষিগণ তাকেই বিপ্রলব্ধা বলেন। এ অবস্থায় বৈরাগ্য (নির্বেদ), চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও দীর্ঘনিশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যথা, বিশাখার প্রতি শ্রীমতী—

চান্দ উদয় ভেল অম্বর মাঝ। অবহু না আওল নাগররাজ ॥
সো বর নাগর বঞ্চল মোহে। কোন যুবতী রসে বান্ধল তাহে ॥
বিরহ দহনে অব মঝু প্রাণ যায়। কি করব সখি, কহ না উপায় ॥

এই বলে মৃগাক্ষী রাধা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। ৪৭।

কলহান্তরিতা

'যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ॥'

সখীদের সমক্ষে পাদপতিত বল্লভকে রোষভরে প্রত্যাখ্যান করে, পরে যে নায়িকা পরিতাপ করে, তাকে কলহান্তরিতা বলে।

প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার প্রয়াস বা লক্ষণ। কলহান্তরিতার বিবরণ অষ্টবিধ। যথা—আগ্রহান্বিতা, ধীরা, বিকলা, অধীরা, কোপবর্তী, সখ্যুক্তিকা, সমাদরা ও মুগ্ধা।

যথা, শ্রীমতী সখীদের বললেন—

করিয়া আদর সে বর নাগর আনি দিল মোরে মালা।
মানের ভরমে দূরেতে ফেলিনু করিয়া পরম হেলা ॥

---

* বিপ্রলব্ধা অষ্টবিধ হয়—নির্বন্ধা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নিন্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদর্চর্চিতা।—রসমঞ্জরী।

কৃষ্ণ নিজে পুষ্পমাল্য এনে আমায় উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি অবজ্ঞাভরে সে মালা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তিনি মধুর বচনে আমায় তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত করি নি। তিনি আমার চরণোপান্তে শিখিচূড়া বিলুণ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু আমি একবারও দৃক্‌পাত করি নি। তাই আজ আমার অন্তর পুটপাকের ভিতরে গলিত ধাতুর মত ফুটছে ।৪৮।

প্রোষিতভর্তৃকা

কান্ত দূরদেশে গেলে যে নায়িকা বিধুরা হয়ে পথ চেয়ে থাকে, তাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে।

প্রিয়তমের গুণকীর্ত্তন, আপন অন্তরের দীনতা, দেহের কৃশতা, রাত্রি-জাগরণ, ম্লানচিত্তে অবস্থান, জড়তা, চিন্তামগ্নতা প্রভৃতি প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার অবস্থা।

প্রোষিতভর্তৃকা তিন পর্যায়ের হতে পারে। যেমন—ভাবী (পতি প্রবাসে যাবেন), ভবন (প্রবাসে যাচ্ছেন), আর ভূত (পতি বিদেশে গিয়েছেন)। এই তিন ক্ষেত্রেই নায়িকার দশ অবস্থা হতে পারে। নিষ্প্রয়োজনবোধে, তার পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ দেওয়া হলো না। ভাবী, ভবন ও ভূত এই তিন অবস্থাতেই বিরহ সঞ্জাত হয়।

যথা (উজ্জ্বলে) ললিতার প্রতি শ্রীমতীর উক্তি—

সখি! মধুরিপু স্বচ্ছন্দে বিলাসপরতন্ত্র হয়ে মথুরায় বাস করতে লাগলেন। এখন আমি কি উপায় করি, বল! আমি যে আর বসন্তের সন্তাপ সহ্য করতে পারছি না; আমায় সকল দিক দিয়ে পদেপদে যাতনা দিচ্ছে। জানি দুরাশা! তবুও মনে হয়, যদি তিনি আসেন! তাই মরণের সঙ্কল্প করেও আমি মরতে পারি না। এ অবস্থায় আমি কার আশ্রয় গ্রহণ করি, বল?

ভানুদত্তের রসমঞ্জরীতে 'প্রোষ্যৎপতিকা' নামে নবম নায়িকার উল্লেখ আছে। যার পতি অচিরে প্রবাসে যাবেন, তারও মিনতি-

কাতর দৃষ্টি, খেদ, দীর্ঘশ্বাস এবং মূর্চ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে এগুলি ভাবী বিরহেরই অন্তর্গত।

স্বাধীনভর্তৃকা

দয়িত যার অধীন হয়ে সর্বদাই আয়ত্তে থাকেন, সে নায়িকাকে বলে স্বাধীনভর্তৃকা। সলিলে এবং অরণ্যে, নায়ক প্রিয়তমার সঙ্গে নানা ক্রীড়া করেন ও বিবিধ পুষ্প চয়ন করে তার অঙ্গভূষণ রচনা করেন। ৪৯।

যথা (উজ্জ্বলে) পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বললেন—

শ্রীমতীর প্রেমাধীন হয়ে, কেশিদমন তার পীন-কুচযুগে অনুপম পত্রাঙ্কুর স্থাপন করছেন, দুটি কর্ণে মধুপচিত্তলোভা নালপদ্ম পরিয়ে দিয়ে, লীলাভরে ধম্মিল (ঝুঁটি) বা কবরীতে শুভ্র কমল সংস্থাপন করছেন এবং অবাধ রতিসম্ভোগে রত হচ্ছেন।

যথা বা—শ্রীমতী কৃষ্ণকে আদেশ করলেন :

'রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং
…পদে কুরু নূপুরাবিতি।'

—গীতগোবিন্দ

শ্রীরাধার আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কুচদ্বয়ে কস্তূরীপত্র, জঘনে কাঞ্চি, কবরীতে পুষ্পমাল্য, করযুগে বলয় ও চরণে নূপুর পরিয়ে দিলেন।

মাধবী

প্রেমবশ হয়ে দয়িত যদি কোন নায়িকাকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে সেই স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাকে 'মাধবী' বলা হয়।

হৃষ্টা ও খিন্না

অষ্টবিধ নায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা—এই তিন প্রকার নায়িকা সতত হৃষ্টচিত্তা ও ভূষণাদি

স্বাধীন ভর্তৃকা লক্ষণানুযায়ী অষ্টবিধা। যথা—কোপনা, মানিনী, মধ্যা, মুগ্ধা, উৎকণ্ঠা, উন্মনা, অনুকূলা ও অভিষেকা। রসমঞ্জরী : পীতাম্বর

মণ্ডিতা হয় ; এরা হৃষ্টা নায়িকা। আর বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও কলহান্তরিতা—এই পাঁচপ্রকার খিন্না নায়িকার অঙ্গ ভূষণশূণ্য হয়। তারা বামগণ্ডে হাত দিয়ে, ম্লানমুখে বসে থাকে ও খেদ করে। তাদের অন্তর চিন্তা-সন্তপ্ত হয়। ৫০।

উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা

ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমের তারতম্য অনুযায়ী পূর্বোক্ত নায়িকাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা।

উত্তমা প্রভৃতি নায়িকাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যার যেমন ভাব, সেই নায়িকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও তেমনি প্রীতি।

উত্তমা

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন, আমার প্রতি শ্রীরাধার কি আশ্চর্য প্রীতি! যদি ক্ষণকালের জন্যও আমার সুখবিধান করতে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হয়, তাও সে করে। আমি যদি খেদের কারণ হই, তবুও তার অন্তরে দ্বেষ জন্মায় না। যদি তার সামনে কেউ ছল করেও আমার কিঞ্চিৎ-মাত্র পীড়ার কথা বলে, তার হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে। এইসব গুণের জন্যই শ্রীরাধা সুন্দরীগণের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়া হয়ে আছে। ৫১।

মধ্যমা

দুরপনেয় মান যার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং দয়িতের আর্তি সত্ত্বেও যে দূরে সরে যায়, সে মধ্যমা নায়িকা। যথা—

রঙ্গ নাম্নি যূথেশ্বরীর প্রতি তার সখীর উক্তি :

রঙ্গে! মান ভরে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তরঙ্গায়িত হচ্ছে ; কৃষ্ণের হৃদয় পীড়িত জেনেও, তুমি চলে যাচ্ছ? দুষ্ট মানকেই তুমি এত সম্মান দিচ্ছ? কি আশ্চর্য! এই কি বরাঙ্গনার অনুরাগ চিহ্ন! এ তো অনুরাগের মুদ্রা নয়। ৫২।

কনিষ্ঠা

অভিসার-মন্থরা কোন গোপাঙ্গনার প্রতি বৃন্দার উক্তি—

কি গো, গোপাঙ্গনা! পূর্বে যখন অভিসারের জন্য প্রস্তুত হতে, তখন কামনা করতে ঘনবর্ষণ; যাতে পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়। বর্ষা দেখে তুষ্ট হতে। আর এখন আকাশে একটুখানি মেঘ দেখলেই জৃম্ভণ কর, কুঞ্জের পথে যেতে পরাঙ্মুখী হও। কেন? এ-তো তোমার প্রেমের লক্ষণ নয়। ৫৩।

মিলন বিষয়ে এই মন্থরতা দ্বারা নায়িকার কৃষ্ণ-প্রীতির অল্পতা সূচিত হয়। তাই এই শ্রেণীর নায়িকাকে 'কনিষ্ঠা' বলে।

উদাহরণ :—

যবহি বরিষ নহে তবহি কহলি তুঁহু বরিষে উচিত অভিসার।
ঘন বরিষণে জন বাহির ন হোয়ই অব তাহে ঘন আন্ধিয়ার॥
অবহি জলদঘন আন্ধিয়ার যামিনী বরিষণ দরশন দেল।
দ্রুত অভিসার ছোড়ি ধনী কুতুকিনী কাহে তুঁহু মন্থর ভেল॥

নায়িকার প্রকারভেদ

পূর্বে যে পঞ্চদশবিধ নায়িকার কথা বর্ণিত হয়েছে, তারা আবার প্রত্যেকে অভিসারাদি আটটি অবস্থা ভেদে, মোট একশো কুড়িটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। এই সব নায়িকা আবার উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে, মোট তিন শো যাট রকম হয়। ৫৪।

শ্রীরাধা

নিখিল নায়কের যাবতীয় অবস্থা বা গুণ যেমন মাধবে বিদ্যমান, তেমনি শ্রীরাধাতেও কনিষ্ঠা নায়িকা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার নায়িকার সর্ববিধ অবস্থাই বিদ্যমান। সেই জন্যই শ্রীরাধা নিখিল নায়িকাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকারূপে পরিগণিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতমা লীলাসঙ্গিনী।

যূথেশ্বরী ভেদ

যূথ সখী

সদ্‌গুণযুক্তা ও সুন্দরভ্রূবিশিষ্টা যে-সব বরনারী রাধার দলভুক্তা ও অনুগামিনী, যাঁরা রূপে ও গুণ-গরিমার বিভ্রমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বোতোভাবে আকর্ষণ করেন, তাঁরাই শ্রীরাধার যূথসখী। এই যূথসখীদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—সখী, নিত্য-সখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী।

কুসুমিকা, বিন্ধ্যা এবং ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখী মধ্যে পরিগণিতা।

উল্লিখিত যূথেশ্বরীদের বিশেষ বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হলেও, পুনরায় তাদের সুহৃদাদি ব্যবহার—অর্থাৎ তটস্থ, বিপক্ষ ও স্বপক্ষ ভেদ স্পষ্টরূপে বর্ণিত হলো। ১।

যূথেশ্বরীদের সৌভাগ্যাদি ক্রমে, অর্থাৎ নায়কের প্রেম ও রূপগুণ ইত্যাদির আধিক্য, সাম্য এবং লঘুতা অনুযায়ী, অধিকা, সমা ও লঘ্বী—এই তিনটি প্রকার-ভেদ হয়। ২।

তা ছাড়া, প্রত্যেকের প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী—এই তিনটি স্তরভেদ আছে। তার মধ্যে যে নায়িকা প্রগল্‌ভ বাক্য বলে, বা দম্ভোক্তি করে, এবং যার বাক্য কেউ খণ্ডন করতে পারে না, তাকে প্রখরা বলে। বাক্য ও আচরণে সমতাযুক্তা হলে মধ্যা, এবং তার চেয়ে মৃদু বা কম হলে মৃদ্বী বলে সে নায়িকাকে অভিহিত করা হয়।

অধিকা

অধিকা দ্বিবিধ—আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী। ৩।

সর্বতোভাবে যার সমান বা যার চেয়ে অধিক আর কেউ নাই, তাকে আত্যন্তিকী অধিকা বা আত্যন্তিকাধিকা বলে। ৪।

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই আত্যন্তিকী-অধিকা এবং তিনিই মধ্যা; কারণ, ব্রজে তাঁর সদৃশ বা সমকক্ষ অন্যকোন

গোপাঙ্গনা নাই। তাই নায়িকাগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা এবং প্রধানা। ৫।

ভদ্রা চটুলা, পালী প্রফুল্লা, বিমলা শালীনতা রক্ষা করতে পারে না, শ্যামলা অহঙ্কার প্রকাশ করে, চন্দ্রাবলী শির উন্নত করে চলে। কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ কর্ণে রাধা নামের মন্ত্রটি প্রবেশ না করে। শ্রীরাধার নাম উচ্চারিত হলে, সকলেই অধোবদন হয়। ৬।

উদাহরণ—

ভদ্রা তদবধি হরি সনে কহতহি চঞ্চল বাত।
পালী তদবধি কত রস বিতরই বিমলা দোলই হাত॥
শ্যামা তদবধি গরব করি চলতহি চন্দ্রাবলী করু সাধা।
যদবধি কেশব শ্রুতি নাহি পৈঠল অমৃত আখর রাধা॥

যূথেশ্বরীগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যে নায়িকা অন্যতমার চেয়ে অধিকা হয়, তাকে আপেক্ষিকী অধিকা বলে। ৭।

অধিক প্রখরা

কোন এক যূথেশ্বরী অন্য যূথেশ্বরীকে বলেছিলেন—সুন্দরি! ওই দেখ, পর্বত হতে কৃষ্ণভুজঙ্গরাজ এগিয়ে আসছেন। তুমি মন্ত্র জানো না, ভীরু সখীদের নিয়ে পালাও। আমি বেদেনী, ভোগী রমণীবৃন্দের বৃন্দাটবীতে ঘুরে বেড়াই; সাপের চিকিৎসা ভাল জানি। ভুজঙ্গ বশীকরণের মন্ত্রপ্রয়োগেও আমার বিলক্ষণ পটুতা আছে। হে কামিনি! আমি মন্ত্রদ্বারা ওই কৃষ্ণভুজঙ্গকে বশীভূত করেছি। আমায় সে কি করবে?

এখানে যূথেশ্বরী নায়িকা তাঁর সৌভাগ্যের আধিক্য প্রকাশ করতে গিয়ে, দুর্হৃৎ বা অধিক প্রখরা হয়ে উঠেছেন। ৮।

অধিক মধ্যা

কোন এক যূথেশ্বরী অন্য একজনকে বললেন—আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। আত্মগোপনের চেষ্টায় অত পটুতা দেখিয়ে আর

কি হবে ? হে ধূর্তে ! পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, আমি গোপীদের নিয়ে জোর করে, আমার গৃহে তোমার পরিজনসহ তোমায় অবরুদ্ধ করে রাখবো। কুঞ্জরাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমার পথপানে চেয়ে, প্রহর গণনা করে, রাত্রি জাগরণ অভ্যাস করুন।

এই উক্তি দ্বারা অপরা নায়িকার সৌভাগ্যের আধিক্য প্রকাশ পায়। কিন্তু আকার-ইঙ্গিত গোপনের প্রচেষ্টা সংকোচের সূচনা করে। সেই হেতু এখানে প্রখরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পটুতার কথা উল্লিখিত হওয়ায়, মৃদুত্বেরও অভাব ঘটে। সেই জন্য এখানে নায়িকার 'মধ্যাত্ব' প্রতিপন্ন হচ্ছে। আর যে যূথেশ্বরী রোষবশে অন্য নায়িকাকে তাঁর গৃহে পরিজনবর্গসহ ধরে রাখবেন বলছেন, নায়কের উপর তাঁর প্রাধান্য এবং সৌভাগ্য—এই দুটিরই অভাব ঘটছে এবং অন্য নায়িকার প্রতি প্রণয়বিদ্বেষ (Jealousy) প্রকাশ পাচ্ছে। সেই হেতু ইনি 'লঘু' ও সুহৃৎ।

অধিক মৃদ্বী

কোন এক যূথেশ্বরী তাঁর সখীকে বললেন—

প্রিয়সখি ! দূর থেকে আমায় দেয়ে, মুখ নীচু করে সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ কেন ? তুমি তো আমারও প্রেমপাত্রী ; অমন গোপনে চলে যেও না। তুমি তোমার কবরীতে ওই যে ফুলের মালা জড়িয়েছ, সে তো আমারই গাঁথা। আমি কৃষ্ণের সঙ্গে পাশা খেলায় ওই মালা পণ রেখেছিলাম। তিনি আমায় জয় করে, ওই মালা পেয়েছিলেন এবং তাই তোমায় দিয়েছেন। আমার কলা-কৌশল তো তোমার পরিচিত।

অঙ্গ সংগোপন করে যে নায়িকা চলে যেতে চান, তিনি সৌভাগ্যবতী এবং 'অধিক মৃদ্বী'। যিনি তাঁকে সম্বোধন করে অঙ্গ-সংগোপনের কথা বললেন, তিনি 'লঘুমধ্যা' সুহৃৎ।

সমাত্রিকা বা সমা

দুই অধিকা এবং দুই লঘুর মধ্যে পারস্পরিক সমতা আছে। তাই তাদের সমাত্রিকা বা সমা বলা হয়। ৯।

সমপ্রখরা

কৃষ্ণের উদ্যানে পুষ্পচয়নরতা এক গোপাঙ্গনাকে দেখে, কোন যূথেশ্বরী বলেছিলেন—যদিও তোমার পাশে অন্য কোন সখী নাই, তবুও ভয় কি? হৃৎকম্প পরিত্যাগ কর। কৃষ্ণ তোমার কি করবেন? প্রিয়সখি! আমি অতি চতুরা, তোমার পথের সামনে দুস্তর বাহুদ্বয় প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছি। এই বাহুনদী সন্তরণ না করে, কৃষ্ণ তোমার সমীপবর্তী হতে পারবেন না। ১০।

এখানে যূথেশ্বরীর উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় সখীর মধ্যে একটা সাম্য বা সমাত্রিক ভাব আছে। যিনি কথাগুলি বললেন, তিনি সমা এবং প্রখরা সুহৃৎ।

সমমধ্যা

দুই সখীর মধ্যে উক্তি ও প্রত্যুক্তি—

প্রথমা—অয়ি লোলে! আমায় স্পর্শ করো না। তোমার ললাটে ধাতুগৈরিক রঙ লেগে আছে। অতএব তুমি অস্পৃশ্যা, কৃষ্ণকর্তৃক উচ্ছিষ্টা।

দ্বিতীয়া—তুমিও তো ভুজঙ্গরমণী, অভিসার করেছিলে। তাই তোমায় দূর থেকে বর্জন করলাম।

প্রথমা—হে সম্ভুক্তা, তুমি যে স্বয়ং কুহকপ্রিয়া (কামরূপী নাগের প্রেয়সী)। নিজের দোষ না দেখে, কেন বাঁকা কথা বলছো? ওই দেখ, তোমার অঙ্গ থেকে কাঁচুলি খুলে পড়েছে; কাম-সর্পিণীর খোলস ছেড়েছে। তোমায় ধিক্!

প্রথমার সৌভাগ্য অনুমিত; দ্বিতীয়ার অঙ্গে ভোগচিহ্ন সুস্পষ্ট হওয়ায়, তার অধিক সৌভাগ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরা কেউ প্রখরা

নয়, নিতান্ত মৃদুস্বভাবা বা মৃদ্বীও নয়। কাজেই এই দুই নায়িকা 'সমমধ্যা' ১১।

সমমৃদ্বী

তারা যখন মান করেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয়বান্ধবী লীলাবতীকে পাঠিয়েছিলেন মানভঞ্জনের জন্য।

তারা বলেছিল—কল্যাণি, আমি ধর্মের নামে শপথ করে বলছি, তুমি আমার প্রাণসমা। আমি বলছি, তুমি মান পরিত্যাগ করো। আমি জানি যে, আমার কথা তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। তবে কৃতাঞ্জলিপূর্বক আমি একটি প্রার্থনা তোমার কাছে করছি। তুমি তোমার বল্লভকে এমন শিক্ষা দাও যে, তিনি যেন জীবনে আর কোনো সরলার প্রতি ছলনা না করেন।

মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণ লীলাবতীকে তারার নিকট পাঠিয়েছিলেন, এতে তারার সৌভাগ্যাধিক্য সূচিত হচ্ছে। আর—আপন কান্তকে শিক্ষা দাও, এই উক্তিদ্বারা লীলাবতীরও সৌভাগ্যের আতিশয্য প্রকাশিত হলো। কিন্তু চরিত্রগত লক্ষণে তারার 'মৃদুতা', এবং কৃষ্ণকে শাসন করবার কথা উল্লেখ করায়, লীলাবতীর কিছুটা 'প্রখরতা' প্রকাশ পায়। তবে চরিত্রগতভাবে উভয়েই 'সমমৃদ্বী'। ১২।

সমপ্রখরা

কোন প্রখরা সখীর সখীর উক্তি—

সুন্দরি! গুরুজনের মর্যাদা রক্ষা না করে, তুমি সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশ্যভাবে বনের পথে চলেছ। তোমার কি ভয় নাই?

উত্তরে অভিসারিণী বললেন—কঠিনে, এত বিভীষিকার আড়ম্বর করছো কেন? যদি ইচ্ছা হয়, বান্ধবীদের পাঠিয়ে যেমন করে পার আমার শাশুড়ীর মন বিগড়ে দাও। তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। গুরুজনেরা আমায় প্রদোষ কালে বনে গিয়ে শিবা-

ভোজন করাবার আজ্ঞা করেছেন। তাই সখীর সঙ্গে যমুনার তীরে যাচ্ছি। তুমি অন্য কোন আশঙ্কা করো না।

এই উক্তিতে সৌভাগ্যসূচক কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় উভয়েরই লঘুত্বের সমতা প্রকাশ পাচ্ছে।

লঘুত্রিক

আপেক্ষিক ও আত্যন্তিক ভেদে লঘু দু প্রকার। আপেক্ষিকী লঘু ও আত্যন্তিকী লঘু।

আপেক্ষিকী লঘু

যদি যূথেশ্বরীদের মধ্যে তুলনায় একজনের চেয়ে অন্যজনের লঘুতা কম হয়, তা হলে তাকে আপেক্ষিকী লঘু বলে।

লঘু প্রখরা

কোন মানিনী যূথেশ্বরী তার বান্ধবীকে বলেছিল—

প্রিয়সখি! তুমি মিথ্যা গুণকীর্তন করে, বৃন্দাবনতস্কর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে সন্তোষ লাভ করেছিলে। কিন্তু এখন যে তুমি নিজেও তটস্থা হয়ে উঠেছ। হে চটুলে! সেই বনচোর জোর করে আমার লজ্জা ও ধৈর্য সম্পদ হরণ করে নিয়ে, আত্মসাৎ করেছেন। হায়! আমার মত দুঃখিজন যাঁর দ্বারা বঞ্চিত হয়েও আবার বঞ্চিত হচ্ছে, তাঁর গুণকীর্তন করা কি তোমার উচিত?

লজ্জা, ধৈর্য—সবকিছু শ্রীকৃষ্ণ হরণ করেছেন, এই উক্তি দ্বারা প্রেমের আধিক্য বুঝায়। আবার বঞ্চিতজন পুনরায় বঞ্চিত হচ্ছে, এই কথায় নায়িকার লঘুত্বের অভাব সূচিত হয়। কিন্তু 'মিথ্যা গুণকীর্তন' ও 'চটুলা' শব্দের প্রয়োগদ্বারা তার প্রখরতা ও লঘুত্ব দু-ই প্রকাশ পাচ্ছে।

লঘুমধ্যা

কোন প্রিয়বান্ধবীর উক্তি—

দেবী চন্দ্রাবলি! যদিও গোষ্ঠরাজতনয় শ্রীকৃষ্ণ নবনব প্রেয়সী-প্রিয়, তবুও রাধার বশীকরণ মন্ত্রের শক্তি আছে। কারণ, যে পর্যন্ত

শ্রীরাধা তাঁর নয়নগোচর না হন, সেই পর্যন্তই তোমার প্রতি তাঁর দাক্ষিণ্য বজায় থাকে। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞেস করো? আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই আমি শুধু ক্লেশই ভোগ করি। ১৩।

লঘুমৃদ্বী

যদিও আমরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখতে চাই, তবুও চলো আমরা এখন এখান থেকে সরে যায়। ওই দেখ মাধবের সাহচর্য কামনায়, আপন গৌরদীপ্তিতে যমুনাতটে শোভাবিস্তার করে, চন্দ্রাবলী একাকিনী পর্যটন করছেন।

গোপাঙ্গনার এই উক্তিতে তার লঘুত্ব এবং মৃদুস্বভাব দু-ই প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে নায়িকা লঘুমৃদ্বী।

আত্যন্তিকী লঘু

অন্যান্য নায়িকাগণ যার চেয়ে ন্যূন নয়, অর্থাৎ তুলনায় যে সকলের চেয়ে লঘু, সে-ই আত্যন্তিকী-লঘু। এর অধিকাদি তিনটি প্রকারভেদ হলেও, মৃদুতাই বিশেষ লক্ষণ। ১৪।

কোন এক যূথেশ্বরী বললেন—গোষ্ঠদেবীগণ! আজ আমার জন্মতিথি উৎসবে আমার পিতামাতা মাধবকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আমিও আমার সখীদের আগ্রহে, সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে কুঞ্জগৃহে আমন্ত্রণ করেছি। তাই তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা, তোমরা করুণা-পরবশ হয়ে, ক্ষণকাল অপেক্ষা করে আমার কুঞ্জ গৃহের শোভা সম্পাদন কর; নইলে আমি অত্যন্ত লজ্জা পাবো।

এখানে, সখীদের আগ্রহে মাধবকে আমন্ত্রণ করেছি—এই উক্তিতে নায়িকার আপন অযোগ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে। আর প্রত্যেক যূথেশ্বরীর কাছে সখীপাঠিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ না করে, বিনয়ের সঙ্গে তাদের উপস্থিতির জন্য অনুনয় করায়, নিজের অত্যন্ত লঘুতা প্রমাণিত হচ্ছে। অযোগ্যতার অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের অভাব (want

of personality), এবং অত্যন্ত লঘুতা (light nature) বশতঃ নায়িকার মর্যাদাবোধ (sense of dignity) ক্ষুণ্ণ করেছে।

পর্যায়ক্রমে আঢ্যা বা প্রথম শ্রেণীর নায়িকা হলো আত্যন্তিকী অধিকা। এরা মর্যাদা ও শালীনতাবোধ-সম্পন্না (dignified) হয়। সমা ও লঘু প্রকৃতির নায়িকা যেমন আঢ্যা বা প্রথম শ্রেণীর হয় না, তেমনি 'অধিকা' পর্যায়ভুক্ত নায়িকাও কখনো অন্তিম শ্রেণীর (lowest grade-এর) হয় না। আবার আধিকা, সমা ও লঘ্বী—এই ত্রিবিধ নায়িকাদেরও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ১৫।

'আত্যন্তিকা অধিকা' ব্যতীত সকল নায়িকার মধ্যেই লঘুত্ব থাকা সম্ভব। এবং 'আত্যন্তিকী লঘু' ভিন্ন অন্য সকল প্রকার নায়িকার মধ্যেই 'অধিকার' গুণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব। ১৬।

'আত্যন্তিকী-অধিকা' নায়িকার একটি মাত্র সংজ্ঞাই হয়, তার বিবিধ প্রকারভেদ হয় না। 'আত্যন্তিক লঘু'র মধ্যে 'অধিকার' কোন গুণ থাকে না। এ ছাড়া, 'সমা-লঘু' চরিত্রের নায়িকাও হয়। অধিকা, সমা ও লঘু প্রকৃতির নায়িকাদের (যূথেশ্বরী) প্রখরাদি তিনটি পর্যায়ভেদে নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই ভাবে যূথেশ্বরী নায়িকাদের মোট বারোভাগে বিভক্ত করা যায়। ১৭।

যথা—

আত্যন্তিকা-অধিকা	অধিক-প্রখরা	অধিক-মৃদ্বী
আত্যন্তিকী-লঘু	সম-প্রখরা	সম-মৃদ্বী
সমা-লঘু	লঘু-প্রখরা	লঘু-মৃদ্বী
অধিক-মধ্যা		
সম-মধ্যা		
লঘু-মধ্যা		

দূতীভেদ

পূর্বরাগাদি অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে নায়িকাদের মিলন বিষয়ে প্রস্তাব বা বক্তব্য উপস্থাপনে যে সহায়তা করে, সে দূতী। দূতী দ্বিবিধ—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী। ১।

স্বয়ংদূতী

ঔৎসুক্য বশতঃ যাদের লজ্জা-সরম থাকে না, এবং অনুরাগে অতিশয় বিমোহিতা হয়ে নিজেই দয়িতের কাছে প্রস্তাব, অভিযোগ বা বক্তব্য উপস্থাপন (propose) করে, তারাই স্বয়ংদূতী।

প্রস্তাব বা অভিযোগ তিন প্রকার—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ। ২।

বাচিকের অন্য নাম ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গ শব্দের গূঢ় তাৎপর্য অর্থভেদে দু'রকম হয়। অর্থাৎ শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ। শব্দব্যঙ্গ বলতে বুঝায় ব্যঙ্গাত্মক শব্দ প্রয়োগ বা উচ্চারণ। আর অর্থব্যঙ্গ বলতে বুঝায়—এমন কথা বলা, যার গূঢ় তাৎপর্যে ব্যঙ্গ নিহিত থাকে। ব্যঞ্জনা বৃত্তি ও অভিধাবৃত্তি, এই উভয়বিধ ব্যঙ্গের দ্বারাই সম্ভোগতৃষ্ণা ব্যক্ত হয়।

এই দুই ব্যঙ্গ আবার দু'রকমের হয়। একটি সাক্ষাৎ, আর একটি ব্যপদেশ। একটি direct, আর একটি indirect ব্যঙ্গ। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গে কৃষ্ণ বিষয়ক কথা কৃষ্ণকেই বলা হয়, আর দ্বিতীয়টিতে কৃষ্ণের 'পুরস্থ' অর্থাৎ সম্মুখস্থ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সম্বোধন করে, ব্যপদশে (in pretext) বা ছল করে, প্রকারান্তরে কৃষ্ণকে বলা হয়।

সাক্ষাৎ

সাক্ষাৎ অভিযোগ বিবিধ রকমের হয়; যথা—গর্ব, আক্ষেপ, যাচ্ঞা। ৩।

গর্বাত্মক শব্দব্যঙ্গ

মাধব! আমি সাধ্বী রমণীদের শীর্ষস্থানীয়া, ললিত-লাবণ্যে বা ললিতার সঙ্গ হেতু গর্বিতা। তাই তোমায় ভাল কথা বলছি যে, পথের মাঝখানে আমার সঙ্গে ভুজঙ্গতা (কামুকতা) করো না। ৪।

গর্বাত্মক অর্থোত্থ ব্যঙ্গ

তমালশ্যামাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে শ্যামা বলেছিল—

হেদে হে কালীয় কানু এ ঘোর গহনে।
বারে বারে চাও কেন কুটিল নয়নে।
আমি শ্যামা নামে নারী সতীর প্রধান।
বনমাঝে না করিহ মোর অপমান॥

আমায় দুঃখ দিলে বনহরিণীরা কুপিত হয়ে তোমায় তাড়ন করবে। ৫।

আক্ষেপার্থক অর্থোত্থ ব্যঙ্গ

যথা—

হে কদম্ববনবিহারি!

আমার আঁচলে মল্লিকা ফুল কেমনে দেখিলে তুমি।
নিকটে আসিয়া কাড়িয়া লইলে কি করিতে পারি আমি॥
যে দেখি তোমার বিপরীত রীত কাছে আসি কোন ছলে।
আমার গলার মুকুতার হার কাড়িয়া লইবে বলে॥
গহন কাননে নাহি কোন জন অতিদূরে মোর ঘর।
কাহার শরণ লইব এখন হৃদয়ে লাগিছে ডর॥ —শচীনন্দন।

এখানে আক্ষেপোক্তির দ্বারা (by suggestions) নায়িকা প্রকারান্তরে এই কথাই বুঝাতে চান যে, এই নির্জন বনে আমি একাকিনী। আঁচলের ভিতর থেকে মল্লিকা ফুল বা গলা থেকে মুক্তাহার কেড়ে নিলেও, আমার কিছু করবার নাই। আমার বাড়ী দূরে, সুতরাং হঠাৎ কেউ এসে পড়বার সম্ভাবনাও নাই। এ অবস্থায় আমায় নিয়ে তুমি যা খুসী তাই করতে পারো।

॥ আক্ষেপার্থক শব্দোত্থ ব্যঙ্গ

কোন এক যূথেশ্বরীর উক্তি—

ওহে ব্রজধূর্ত ! তুমি আমার পথরোধ করো না। ওই অম্বরের দিকে চেয়ে দেখ ! সম্মুখে উদিত নিবিড় মেঘ। আর চাঁদ দেখা যাচ্ছে না ; মেঘে তার সৌন্দর্য ঢাকা পড়েছে। এখনই বৃষ্টি নামবে। আমি লাল সূক্ষ্মবস্ত্রের কাঁচুলি পরেছি। হে কুটিল, তুমি দূরে সরে দাঁড়াও। আমার নতুন কাঁচুলি-পরা উজ্জ্বল তনুশ্রী যতক্ষণ সিক্ত হয়ে বিবর্ণ না হয়, ততক্ষণ কি তুমি পথ ছাড়বে না !। ৬।

এখানে শব্দোত্থ ব্যঙ্গ এই যে, আমার বসনান্তে উন্নত পয়োধরের দিকে চেয়ে দেখ। তুমি কি আমার অঙ্গবাস সিক্ত না করে ছাড়বে না !

যাচ্ঞা

- যাচ্ঞা দু'রকমের হয়। এক, স্বার্থে অর্থাৎ নিজের জন্য। আর এক, পরার্থে অর্থাৎ অন্যের জন্য। ৭।

স্বার্থ যাচ্ঞা--শব্দোত্থ ব্যঙ্গ

শ্রীরাধার উক্তি—

আমি পুষ্পের সন্ধানে এখানে এসেছি। কিন্তু তোমার মঞ্জুলতা আমার পথ রোধ করছে। তুমি অনুমতি কর, আমি তোমার মঞ্জুলতায় বিকশিত কুসুমচয় চয়ন করি।

নিগূঢ় অর্থ—হে কৃষ্ণ ! তোমার মঞ্জুলতা (সৌন্দর্য) আমার পুষ্পচয়নের পথে বাধা দিচ্ছে। তুমি ওই সৌন্দর্য সম্ভোগের সুযোগ দিয়ে, আমার নিরুদ্ধ গতি অবাধ কর।

যাচ্ঞা --অর্থোত্থ ব্যঙ্গ

এই বৃন্দাবনের গহন অরণ্যে ভুজঙ্গেরা আমায় আক্রমণ করেছে ; সেইজন্য আমি ভীত হয়ে উঠেছি। তুমি কালীয় নাগের উদ্ধত ফণা অবলীলাক্রমে জয় করেছ। তাই আমি শ্রদ্ধানত হৃদয়ে

তোমার শরণাপন্ন হলাম। তুমি এই নির্জন প্রদেশে একান্তে এমন একটি বিষহরী মন্ত্র আমায় দাও, যাতে আমার সর্পভয় দূর হয় নইলে আজ কাত্যায়নীর জন্য আমার পুষ্পচয়ন করা হবে না।

নিগূঢ় তাৎপর্য—এই নির্জন বনে আমি কাম-ভুজঙ্গের আক্রমণে জর্জরিত। হে দয়িত, তুমি বিষহরণকারী মন্ত্র দিয়ে আমায় সেই কন্দর্প সর্পের দংশন থেকে রক্ষা কর। ৮।

যথা বা

শ্রীমতী বললেন—

হে যদুনাথ! লোকে তোমায় শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান বলে গণ্য করে। সকলের সংরক্ষণের জন্য তুমি এই নিবিড় অরণ্যে ঘুরে বেড়াও। আমি অবলা বধূ, পথভুলে এই গভীর বনে প্রবেশ করেছি। তুমি দয়া করে পথ দেখিয়ে দাও, যাতে এই বধূজন নির্বিঘ্নে ব্রজে পৌঁছতে পারে। ৯।

তাৎপর্য—নির্জন বনে এককিনা শ্রীমতী 'পথ দেখিয়ে দাও' বলে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ও সাহচর্য যাচ্ঞা করছেন। আপন সম্ভ্রম রক্ষা করে, দয়িতের সঙ্গ-লিপ্সা প্রকাশ করছেন। এখানে যাচ্ঞা তাঁর আপন স্বার্থে সাধিত হলো। এই ধরণের প্রস্তাবকেও ছল বা অছিলা বলা চলে।

পরার্থ যাচ্ঞা—শব্দোত্থ ব্যঙ্গ

কোন সখীর উক্তি—

হে কংসারি! আমার প্রিয়সখী তোমার বংশীধ্বনির নবসুধা কর্ণাঞ্জলি ভরে পান করে বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। লঘুচিত্ত লোকের উত্তেজনায় সে আরো উত্তাল হয়ে উঠেছে। অনঙ্গ-জ্বালায় তার রূপলাবণ্য অত্যন্ত বিবর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে তুমি ধন্বন্তরি, এ কথা নিশ্চিত, তাই তোমার কাছে এলাম। তুমি তার এই বিষম ব্যাধির মহৌষধি দাও।

এখানে নায়িকা দূতী হয়ে পরের জন্য ঔষধি প্রার্থনা করছে। কিন্তু ওই কন্দর্পদাহ রোগের ঔষধ লতাগুল্ম নয়। সে ঔষধ আঙ্গিক, সুতরাং সেই অনঙ্গদাহনাশক ঔষধি প্রলেপ দূতীর অঙ্গেই দিতে হয়।

পরার্থ যাচ্ঞা - অর্থোত্থ ব্যঙ্গ

কোন যূথেশ্বরীর উক্তি—

হে মাধব! আমি অসূর্যম্পশ্যা, কখনো ঘরের বাইরে আসি না। প্রিয়সখীর প্রণয়বশতঃ আজ দূতীর কাজে নিযুক্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু এখানে আমার বেশীক্ষণ থাকা চলবে না; কারণ, রাত্রি হলে শশিকলাভ্রমে কোন দুষ্ট চকোর এসে আমার মুখচন্দ্রিমার জ্যোৎস্নাসুধা পান করবে। ১০।

পরের জন্য দৃত্য কাজে এসে, আপন রূপগরিমা প্রকাশ করে নায়িকা প্রকারান্তরে জানাতে চায় যে, সে সুন্দরী এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগযোগ্যা।

ব্যপদেশ

অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে, ছল করে কোন কথা বলার নাম ব্যপদেশ। অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্য বা অভিলাষ জানাবার জন্য, অন্য কোন বর্ণনা বা ঘটনার অবতারণা করা। ১১।

শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গব্যপদেশ

কোন এক যূথেশ্বরী বিপক্ষীয়া অন্য-এক সখীর কথা বলবার ব্যপদেশে নিজের উৎকর্ষ প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

হে মদমত্ত করীবর! তোমার সামনে ঘনরসপ্রিয় উল্লাসিনী সুরতরঙ্গিণী বিরাজিত। যেখানে প্রফুল্ল কুবলয় (নীলপদ্ম) সকল শোভা পাচ্ছে ও মত্ত হংসদল মধুর কলনিনাদ করছে। হায়! তুমি সেই সুরতরঙ্গিণী (গঙ্গা) পরিত্যাগ করে পঙ্কিল সলিলা কর্মনাশা নদীতে ক্রীড়া বা অবগাহন করছো কেন?

এখানে নায়িকা স্বয়ং দূতী হয়ে, অন্য নায়িকার সঙ্গে নিজের তুলনা করে, নিজেকে স্বচ্ছতোয়া কুবলয়-শোভিতা সুরতরঙ্গিণী বলে অভিহিত করছেন, এবং বিপক্ষা নায়িকাকে বিদগ্ধ রসসম্ভোগের অযোগ্যা বলে উল্লেখ করছেন। এখানে প্রসঙ্গ-ব্যপদেশে নায়িকা এই কথাই বুঝাতে চান যে, বিদগ্ধ রস সম্ভোগের জন্য তিনিই সর্বোত্তমা নায়িকা। সুতরাং দয়িত অন্য নায়িকাকে পরিত্যাগ করে, তাঁকে নিয়েই সম্ভোগে রত হোন। অন্য নায়িকা গুণহীনা এবং কর্মনাশা।

অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গব্যপদেশ

হে কোকিল, তুমি মধুপগণের অনাঘ্রাত মধুময় অম্রমুকুল ত্যাগ করে, কেন বৃন্দাবনের চতুর্দিকে কাকলিমত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

ব্যপদেশে বক্তব্য, ইতস্তত পরিভ্রমণ না করে, এই অনাঘ্রাত চূতমঞ্জরীর মধুপানে রত হও। অর্থাৎ আমার সঙ্গে রসসম্ভোগে লিপ্ত হও। অন্য কেউ আমার অঙ্গ স্পর্শ করে নি। আমি রসপূর্ণ উত্তমা নায়িকা।

লুবুধ মধুপ যার নাহি পায় গন্ধ। ফলফুলে বিকসিত সেইত মাকন্দ।
হেদে হে কোকিলবর ইহ রস ছাড়ি। কেন বা ফিরিছ তুহু এ কানন বেড়ি।
—শচীনন্দন।

পুরস্থ বিষয়

কৃষ্ণ শুনছেন, তবুও তিনি যেন শোনেন নি, এমনি ভাব নিয়ে নায়িকা যখন তাঁকে শুনিয়ে সামনের কোন বস্তু বা জীবজন্তুর প্রতি কোন কথা বলে, বা প্রসঙ্গতঃ ব্যাজস্তুতি করে, তখন তাকে 'পুরস্থ বিষয়' বলে। ১২।

শব্দোত্থ ব্যঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আছেন দেখে, কোন স্বয়ং-দূতী যূথেশ্বরী নায়িকা মালতীলতাকে সম্বোধন করে বললেন—হে মালতি! অলিগুঞ্জনে

আমায় আহ্বান জানিয়েছ, তোমার পুষ্প চয়ন করবার জন্য। কিন্তু আমি যে প্রমত্ত চিত্তে কমনা করছি সম্মুখের ওই আমোদপূর্ণ কুসুমিত নাগকেশর (পুন্নাগ)।

এই উদাহরণের তাৎপর্য এই যে, নায়িকা মালতী বা মাধবী পুষ্পের জন্য আগ্রহান্বিতা নন। তিনি সম্মুখে অবস্থিত ওই নাগকেশর বা কুসুমিত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষিণী।

অর্থোত্থ ব্যঙ্গ—স্বয়ংদুতী পুরস্থ বিষয়

যথা-

কোন এক যূথেশ্বরী সম্মুখবর্তী শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, ছল করে গিরি গোবর্ধনের উদ্দেশে বললেন—তোমার লতাগুলির পুষ্প চয়ন করা হয়নি, তাই সেগুলি মনোহর শোভা ধারণ করেছে। নিখিল বিহঙ্গ নিঃশঙ্কচিত্তে সেখানে বাসা বেঁধেছে। তাই আমার অভিলাষ হয়, কিছুক্ষণ তোমার অঙ্কে বিচরণ করি। তুমি এমন কোন উপায় কর, যাতে আমার মনোরথ পুর্ণ হয়।

এখানে অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গ এই যে, গিরিগোবর্ধনকে উপলক্ষ্য করে নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের গোচরে স্বয়ংদূতী হয়ে, রতি প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণও লতাপুষ্প-সুশোভিত গিরিকন্দরে গিয়ে গোবর্ধন দেবের উপাসনা করবার জন্য নায়িকাকে উপদেশ দিলেন। বললেন, তিনিই অভিলাষ পূর্ণ করবেন; অর্থাৎ সেই সুরম্য নির্জন গিরিকন্দরে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে মিলিত হয়ে, নায়িকার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

অথবা—পুরস্থ বিষয়ে

কোন যূথেশ্বরী তাঁর সখীকে বললেন—

ব্রজপতিতনয় শ্রীকৃষ্ণ সাধ্বীগণের সতীত্ব-ব্রত হরণে প্রসিদ্ধ। তুমি অতি মৃদুলা, মুখের কথা বলেও তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। সামনের বন অতি ভয়ঙ্কর, শতশত গ্রন্থিল (জটিল গ্রন্থিযুক্ত) লতায়

সমাচ্ছন্ন, পথ অতি দুর্গম (সহসা কোন ব্যক্তির পক্ষে সে বনে প্রবেশ করা সম্ভব নয়)। হায়! আমি মূঢ়, তাই এই লতাসঙ্কুল পথের শত বাধা অতিক্রম করে এসে, শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আর বাড়ী ফিরতে পারবো না। কি করি? এখানে যে তাঁরই সম্মুখে ঘুরে বেড়াতে হবে!

অর্থোদ্ভব ব্যঙ্গ এই যে, নায়িকাকে তার সখীর সঙ্গে এই ধরণের কথা বলতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে অভয় দিয়ে বলবেন—তোমার কোনো ভয় নেই। কুঞ্জের ভিতরে এসে কিছুক্ষণ পুষ্প-শয্যায় বিশ্রাম কর। আমি অঙ্গসেবা করে তোমার শ্রান্তি দূর করে দিই।

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সখীকে উদ্দেশ করে, নায়িকা যে কথাগুলি বলেছেন, তাতে পুরস্থ বিষয় অবলম্বন করে নিজের সম্ভোগলিপ্সার প্রতি নায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে প্রতীত হয়েছে।

আঙ্গিক

নায়কের (শ্রীকৃষ্ণের) সম্মুখে নায়িকার কতকগুলি অঙ্গ সঙ্কেত, ইঙ্গিত বা ব্যবহারিক লক্ষণ প্রকাশ, যা মিলনের অভিলাষ প্রকাশ করে, তাকে আঙ্গিক বলে।

আঙুল ফোটানো, কৃত্রিম সম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হওয়া, বা ত্বরিত গতিতে চলে যাওয়া, শঙ্কা বা লজ্জাবশতঃ বারবাব গাত্র-আবরণ বিন্যস্ত করা, পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে লেখা বা দাগ কাটা, কর্ণ-কণ্ডুয়ন, ললাটে তিলক আঁকা, বেশ বা কেশরচনা বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা, বুকের বসন যথাযথ ভাবে থাকা সত্ত্বেও বারবার সংস্থাপন করা, বা কবরীতে হাত দিয়ে বারবর সেটি সুবিন্যস্ত রাখবার চেষ্টা, ভ্রূভঙ্গি, সখীকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করা, অধর দংশন, কণ্ঠহার ওষ্ঠের উপর তুলে গুম্ফ রচনা করা, অলঙ্কার শিঞ্জন, বাহুমূল অনাবৃত করা, দয়িতের নাম লেখা, কোন

বৃক্ষের গায়ে লতা জড়িয়ে দেওয়া, ইত্যাদি কাজ যদি দয়িতের সামনে বা তাঁর গোচরে করা হয়, তাহলে সেগুলিকে প্রেম নিবেদনের আঙ্গিক বলে।

অঙ্গুলি স্ফোটন

সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

সখা এই সতীপ্রবরা সুনেত্রা বিশাখার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তার অঙ্গসঙ্গলাভের লোলুপতায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমায় দেখে, সে হাতের আঙুলগুলি ফোটাতে লাগলো ; সেই সঙ্গে আমার সম্ভোগলিপ্সার ব্যসনগুলিতেও যেন সে মোচড় দিচ্ছিল।

আঙুলের ফাঁকে আঙুল দিয়ে, নায়িকা যখন নায়কের সামনে তার বরাঙ্গুলিগুলি ফোটান, তখন নায়কের চিত্তে অনঙ্গনিবেদন সঞ্চারিত হয়। নায়ক মিলনপিয়াসী হয়ে ওঠেন।

ব্যাজসম্ভ্রমাদিবশত : অঙ্গসম্বরণ

ব্রজহরিণাক্ষী আমায় সামনে দেখে, তাঁর বস্ত্রাবৃত বুকের উপর আবার বসন টেনে দিয়ে আচ্ছাদন করছেন ; অবগুণ্ঠিত মুখে আবার অবগুণ্ঠন টেনে দিচ্ছেন। এই ভাব দেখে মনে হয়, অনঙ্গশরে পরাভূত হয়ে তাঁর চিত্ত বিকল হয়েছে। ১৩।

চরণদ্বারা ভূলেখন

সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

বন্ধু, আমার নয়ন যখন নতুন করে ব্রজসুন্দরীর কাছে অতিথি হলো, তখন দেখলাম যে আমার দেখে তিনি নম্রমুখী হয়ে কমনীয় ভঙ্গীতে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মাটিতে কি লিখছেন ! সে লিখন সামান্য নয়। মনে হলো, অনঙ্গনির্দেশে তাঁর দেহের উপর আমায় অধিকার দিয়ে, তিনি পাট্টা লিখে দিচ্ছেন। আমার চিত্তকে তাঁর

কুচশৈলতটের সন্ধিস্থলে নিক্ষেপ করে, তিনি যেন কীলকের দ্বারা অবরুদ্ধ করলেন।

কর্ণকণ্ডূয়ন

রত্নাঙ্গুলীর অগ্রভাগ কর্ণবিবরে স্থাপন করে, শ্রীমতী কর্ণকণ্ডূয়ন করছিলেন। কঙ্কনের শিঞ্জনধ্বনিতে যেন কামদেবের তূর্যনাদ উঠছিল ; উচ্চলিত কনককুণ্ডলে অপরূপ সৌন্দর্য লীলায়িত হচ্ছিল ; সেই কথাই বারবার আমার মনে হচ্ছে।

নায়কের সামনে নায়িকার কর্ণকণ্ডূয়ন অনঙ্গ নিবেদনের একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত।

তিলকক্রিয়া

কুন্দবল্লীর উক্তি :

হে শিখণ্ডশেখর ! তোমায় দেখে, গান্ধর্বিকা তাঁর শরদিন্দুনিভ সুন্দর মুখখানি সিন্দুরবিন্দুতে উজ্জ্বল করছেন। গ্রীবা ঈষৎ বক্র করে, বারবার তোমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। দোদুল্যমান কুণ্ডলদুটি গণ্ডযুগে নিপতিত হচ্ছে ; মনে হয়, তাঁর চিত্তে অনুরাগ-অঙ্কুর নিহিত আছে। সেই অনুরাগের রেখাই যেন ফুটে উঠছে ওই সিন্দুর তিলকে।

বেশক্রিয়া

দয়িতকে দেখে, হৃষ্টচিত্তা কমলনয়না পালী কর্ণে মধুস্রাবী লবঙ্গপুষ্পস্তবক ধারণ করছে এবং বেশবিন্যাসে মনোযোগিনী হচ্ছে। নায়িকার এই প্রকার বেশক্রিয়া অনঙ্গ-নিবেদনের দ্যোতক। ১৫।

ভ্রূকম্পন

নায়ককে দেখে, নায়িকা যখন তার অনঙ্গধনু সদৃশ ভ্রূযুগল কম্পিত করে বা নাচায়, তখন নায়কের চিত্তে মদনবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। নায়কের মত্ত হস্তীর মত দুর্দম চিত্ত নায়িকার মুখচন্দ্রিমায় আবদ্ধ হয়।

সখীআলিঙ্গন

রতিমঞ্জরীর প্রতি রূপমঞ্জরীর উক্তি—

দেখ, চিত্রার নয়নপথে মাধব নূতন অতিথি হয়েছেন। চিত্রা অপাঙ্গ বিস্তার করে, তার কঠোরকুচযুগশালী বক্ষে সখীকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করছে। আলিঙ্গনকালে, তার হাতের কঙ্কণ রিনিঝিনি শব্দে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে সম্ভোগ লিপ্সা বৃদ্ধি করছে।

সখীতাড়ন

সুবলের উক্তি—

সখা, বিশাখার প্রতি আর বশীকরণ প্রয়োগের উপায় খুঁজতে হবে না। উনি তোমায় আত্মমন সমর্পণ করেছেন। কারণ, তোমার পাদপদ্মের প্রান্তে তড়িৎ অপেক্ষাও চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তিনি পুষ্পের আঘাতে আপন সখীকে তাড়না করছেন।

অধরদংশন

নায়ক যখন নায়িকার দৃষ্টিপথে পতিত হন, এবং নায়িকা নায়ককে দেখে কৃত্রিম কোপে অধর দংশন করে, তখন সুস্পষ্ট সম্ভোগ-নিবেদন সূচিত হয়। ১৬।

হারগুম্ফন

যার সুন্দর নেত্রপদ্ম শরৎ-পদ্মকেও হার মানায়, গ্রীবা বক্র করে সেই নায়িকা যখন দয়িতের প্রতি বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং আপন কণ্ঠহার তুলে ওষ্ঠের উপর রাখে, নায়কের চিত্ত অনঙ্গ উত্তাপে দ্রবীভূত হয়।

অলঙ্কার শিঞ্জন

নায়িকা যখন নায়ককে দেখে নিজের কঙ্কণ প্রভৃতি শিঞ্জিত করে, তখন নায়কের মনে মনোভবের বা কামদেবের শাসন ডঙ্কা মুহুর্মুহু বেজে ওঠে।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—শ্যামলা আজ দূর থেকে আমায় দেখে তার মণিকঙ্কণের ঝংকার তুলতে লাগলো। সেই ঘনঘন অলঙ্কার শিঞ্জনের ডমরু-নিনাদে আমি অনঙ্গরাজের শাসনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ১৭।

বাহুমুল প্রকাশ

বৃন্দাবনের বনে বনে যেসব ফলযুক্ত লতা মনোহর শোভা বিস্তার করে কোকিলদের আনন্দ বর্ধন করছে, কল্যাণি শ্যামা, তুমি তার চেয়েও অধিক সৌন্দর্য বিকাশ করছো তোমার বলয়শোভিত বাহুলতাদুটি ঊর্ধ্বে তুলে। সেই উদগ্র বাহুমূলে শোভিত ফল দুটি কৃষ্ণ কোকিলের আনন্দিত চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলছে।

নায়কের সামনে নায়িকা যখন অকারণ বারবার খোঁপায় হাত দেয়, বা অন্য কোন অছিলায় বাহুমূল প্রদর্শন করে, তখন নায়কের চিত্ত নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নায়িকার এরূপ কার্যকলাপও অনঙ্গনিবেদনের একটি বিশেষ আঙ্গিক। ১৮।

নামাভিলেখন

থাক বৃন্দে! এখানে আর তোমার দৌত্যের প্রয়োজন নেই। কারণ, তোমার ওই ইন্দুমুখী প্রিয়সখী আমায় দেখে তার গণ্ডফলকে কুঙ্কুম দিয়ে আমার নাম লিখছেন। ১৯।

নায়ক বা নায়িকার চিত্ত যখন রতিনিবেদনে উৎসুক হয়, তখন আনমনে নায়ক দয়িতার বা দয়িতা নায়কের নাম আপন অঙ্গে লেখে। কখনো দেউল-গাত্রে, প্রস্তর ফলকে, বৃক্ষকাণ্ডে, গিরি-কন্দরে বা এখানে-ওখানে প্রেমাস্পদের নাম বা উভয়ের নাম পাশাপাশি লেখে।

তরুগাত্রে লতাস্থাপন

হে গোপসখা অর্জুন! ব্রজপদ্মিনীর রূপ দেখে আমি যখন আর্ত হয়ে উঠেছিলাম, তখন তিনি আমায় দেখে, তমাল তরুতে যুঁইলতা জড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

নায়িকা যখন এইভাবে দয়িতের সামনে বৃক্ষের গায়ে কোন লতা জড়িয়ে দেয়, দয়িতের অঙ্গসংলগ্ন হয়ে সম্ভোগলিপ্সা মিটাবার পর্যাপ্ত ইঙ্গিত প্রকাশ পায়।

ঠিক এই ধরণের আঙ্গিক প্রকাশ পায়, আবার নায়িকা যখন নায়ককে দেখে, বা তার সম্মুখীন হয়ে, শাড়ীর আঁচল থেকে সূতা টেনে নিয়ে আনমনে আঙুলে জড়ায়। কখনো বা চুলের গুচ্ছ নিয়েও নায়িকা আঙুলে গ্রন্থি বাঁধে।

তরুগাত্রে লতাস্থাপন, আঙুলে শাড়ীর আঁচলের সূতা জড়ানো বা চুলের ফাঁস দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলি যখন নায়িকা করে, তখন তার চোখের দৃষ্টি অধিকতঃ নায়কের দিকেই থাকে। এরূপ কাজের দ্বারা নায়িকার নিভৃত মনের অনঙ্গনিবেদন সূচিত হয়।

চাক্ষুষ

চোখের হাসি, চোখের অর্ধমুদ্রা, নেত্র ঘূর্ণয়ন, নেত্রকোণ সঙ্কুচিত করা, বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ, বামচক্ষে নায়কের দিকে দৃষ্টিপাত করা, এবং কটাক্ষ ইত্যাদির নাম চাক্ষুষ।

নায়িকার চোখের দৃষ্টি তার মনোভাবের একটি বৃহত্তম মাধ্যম। বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গিতে নায়িকার প্রেমনিবেদনের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। সম্ভোগলিপ্সা প্রকাশে চোখের এই দূত্যক্রিয়া শুধু নায়িকার পক্ষেই প্রযোজ্য নয়, নায়কের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য। এই চাক্ষুষ ভাব নিবেদনকেই 'কটাক্ষ' বলা হয়। ২০—২৪।

পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে চোখের নীরব ভাষা (Speechless message) প্রেমনিবেদনের শ্রেষ্ঠ দূত্যক্রিয়া করে এসেছে।

কটাক্ষ

চোখের তারার যে গতি লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত গিয়ে, আবার ফিরে আসে, এবং ক্ষিপ্র যাতায়াতের মধ্যে অল্পক্ষণ লক্ষ্য সংলগ্ন হয়ে,

মাধুর্য, বৈচিত্র্য বা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, সেই দৃষ্টি-বিবর্তনকে রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কটাক্ষ বলেন। ২৫।

যথা

শ্রীরাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :

হে গৌরি! তোমার আঁখিতারকার কি বিচিত্র গতি! কালো ভ্রমরীর মত আমার কর্ণোৎপল পর্যন্ত এসে, আবার ফিরে যাচ্ছে। তার শক্তি সবকিছুকেই পরাভূত করেছে। তার অপরূপ গতি লীলায় আমার চিত্ত আকুলিত হচ্ছে। হে গান্ধর্বিকে! তোমার ওই কটাক্ষের চমৎকারিত্বে আমি নিজেই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। চন্দ্রাবলীর কথা কি! তাকে তো ভুলতেই পারি।

স্বয়ংদূতীর যে লক্ষণগুলির কথা বলা হলো, অসংখ্য লক্ষণের মধ্যে সেগুলি দিগ্‌দর্শন মাত্র। এই লক্ষণগুলি যথোচিতভাবে প্রণিধান করলে দেখা যাবে যে, স্বয়ংদূতীর মত শ্রীকৃষ্ণ নিজেও কখনো কখনো অভীষ্ট প্রার্থনা করেছেন। এখানে শ্রীমতীর আঁখি তারকাকে ভ্রমর বলে অভিহিত করে, মাধব প্রকারান্তরে তাঁর প্রণয়বশ্যতা স্বীকার করছেন। ২৬।

উল্লিখিত বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ ইত্যাদি স্বয়ংদূত্যক্রিয়া যদি নায়িকার চেষ্টিত বা বুদ্ধি প্রয়োগে সাধিত হয়, তাহলে সেগুলিকে 'স্বাভিযোগ' বলা হয়। আর উক্ত প্রণয়নিবেদনের ইঙ্গিত বা লক্ষণগুলি যদি স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) হয়, তা হলে রসজ্ঞগণ সেগুলিকে 'অনুভাব' বলে অভিহিত করেন। ২৭।

অনুভাব বলতে সাধারণতঃ মনোভাব-প্রকাশক ভঙ্গীকে বুঝায়। অর্থাৎ, রতিভাবের অনুগামী ভাবস্ফূর্তি, যার ভিতর দিয়ে মনের বাসনা প্রতিফলিত হয় (symbolic expression of desires).

'অনুভাব' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আপ্তদূতী

যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না, এবং স্নিগ্ধা ও বাগ্মিনী অর্থাৎ স্নেহশীলা ও বাক্যনিপুণা, সেই দূতীকে গোপসুন্দরীদের আপ্তদূতী বলে।

নায়ক ও নায়িকার মিলন বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে ঘটকালি করাই আপ্তদূতীর লক্ষণ।

আপ্তদূতী তিন প্রকার—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী।

অমিতার্থা

নায়ক বা নায়িকার মধ্যে যে-কোন একজনের ইঙ্গিতের দ্বারা তার মনোভাব জেনে, যে দূতী দুজনকে মিলিত করবার উপায় উদ্ভাবন করে, তাকে অমিতার্থা বলে। ২৮।

নিসৃষ্টার্থা

নায়ক বা নায়িকার যে-কোন একজন কর্তৃক নিয়োজিতা হয়ে বা তার কাছ থেকে কার্যভার পেয়ে, যে দূতী আপন যুক্তি-প্রয়োগের দ্বারা উভয়ের মিলন ঘটায়, তাকে নিসৃষ্টার্থা বলে। ২৯।

যথা—

মাধব ইহ বৃন্দাবনবাসী গুণবতী এক আছয়ে মণিরাশি।
তুহু যে কঠিন মণি, কি বলিব তোয়। ইহ যব আওলু ধিক বহু মোয়॥

পত্রহারী

যে দূতী নায়ক বা নায়িকার পত্র কিংবা সংবাদ বহন করে মিলনের যোগাযোগ ঘটায়, তাকে পত্রহারী বা পত্রহারিকা বলে।

যথা—

শুন শুন ওহে রসিক নাগর বড়ই রসিক তুমি।
তোমার নিকটে রাধার সন্দেশ কহিতে আইনু আমি॥
রাই অচেতনে ঘুমাঞা সদনে হরিষ হইয়া মনে।
কপট করিয়া তুমি সেথা যেয়া তারে দুখ দেও কেনে॥

হে মুকুন্দ! ব্রজসরোজাক্ষী শ্রীরাধা আমায় নিভৃতে ডেকে এই কথা তোমার কর্ণগোচর করবার নির্দেশ দিলেন যে, তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, কিন্তু তুমি হঠাৎ স্বপ্নাবেশে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে তাঁকে লাঞ্ছিতা করলে কেন! এ কাজ কি তোমার উপযুক্ত হয়েছে?

উল্লিখিত আপ্তদূতীদের আবার বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী। ৩০।

শিল্পকারী

কোন এক দূতী এসে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

হে গোপীনাথ, চিত্রা আমার রূপের প্রশংসা করে আমায় বলেছিল—তুমি তো শিল্পী, এমন একটি রূপ চিত্রিত কর যা লোকোত্তর, যার তুলনা এ জগতে আর নেই।

চিত্রার আগ্রহে, আমি একটি ফলকে সেই চিত্র আঁকতে গিয়ে তোমারই রূপ অঙ্কিত করে, তাকে দেখিয়েছিলাম। তারপর চিত্রা তোমার সেই চিত্রিত রূপ দেখে, এমন বিচিত্রদশা প্রাপ্ত হলো যে, সহচরীদের চোখে সে নিজেই যেন এক চিত্র হয়ে উঠলো। ৩১।

তাহার বচনে পটের উপরে তোমারে লেখিনু আমি,
সেরূপ দেখিয়া অথির হইল, আসি দেখসিয়া তুমি।

দৈবজ্ঞা

শ্রীরাধার প্রেরিত কোন দৈবজ্ঞা বা গণৎকারিণী দূতী এসে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

মাধব! বৃষরাশি এবং শুভ রোহিণী নক্ষত্রে তোমার জন্ম। আমি গণনা করে দেখলাম, তোমার আজ সুখসমৃদ্ধি লাভের দিন। তাই তোমার কাছে এলাম। তুমি আমার সঙ্গে এসো, পরম-সুন্দরভ্রূবিশিষ্টা বিধুমুখী বিদ্যুৎলতা আজ তোমার অঙ্গসংলগ্ন হয়ে স্ফূর্ত হবে।

লিঙ্গিনী

বৃন্দাবনে তাপসী-বেশধারিণী পৌর্ণমাসীর মত আপ্তদূতীকে লিঙ্গিনী বলে। যথা—

পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে বললেন—

চিন্তা না করিহ মনে মিলাইব তব সনে আজি আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আমি হই তপস্বিনী, কোন্ মন্ত্র নাহি জানি, দূতী হঞা করিল গমন॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য রাধিকা যখন উদ্‌গ্রীবচিন্তা ও অবসাঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন, পৌর্ণমাসী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'বৎসে সরলা! তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমি নিশ্চয়ই ব্রজরাজতনয়কে বশীভূত করে আনবো। আমি চতুরা ও প্রবীণা সন্ন্যাসিনী—মন্ত্রসিদ্ধা। আমি দূতী হয়ে সে কাজের ভার নিলাম। যেমন করে হোক, মাধবের সঙ্গে আজ আমি তোমার মিলন ঘটিয়ে দেবো।

পরিচারিকা

লবঙ্গমঞ্জরী ও ভানুমতী প্রভৃতি সখীরা শ্রীরাধার পরিচারিকা দূতী রূপে পরিগণিতা। এঁরা সেবাপরায়ণা এবং শ্রীমতীর প্রতি অপরিসীম প্রীতিসম্পন্না। ৩২।

যথা—শ্রীমতীর প্রতি লবঙ্গমঞ্জরীর উক্তি—

দেবি! সহচরগণের পরিষদ্ থেকে আকর্ষণ করে, তোমার গুণের মণিমালা গলায় পরিয়ে, এই দেখ, মধুরিপুকে এনেছি তোমার নয়ন সম্মুখে। এখন বলো, এ কিঙ্করী আর কি করবে?

ধাত্রেয়ী

যে ধাত্রীকন্যা নায়িকার দূতীর কাজ করে, তাকে ধাত্রেয়ী বলে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাত্রেয়ী দূতীর উক্তি:

মধুসূদন! আমি শ্রীরাধার ধাত্রীকন্যা। তোমায় একটি অদ্ভুত কথা বলবার জন্য এসেছি। হিরণ্যগৌরী রাধা কৃষ্ণগতচিন্তা হয়ে

চাঁদের কলার মত পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। তুমি তার চিত্তজ্বালা দূর কর।

'রাধার ধাত্রেয়ী আমি শুন বনমালী। আমার নিকটে আইস কিছু বাক্য বলি।
যদবধি রাধা মোর কৃষ্ণে রুচি কৈল। সেই হৈতে সোনার বর্ণ মলিন হৈল॥'

বনদেবী

শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণ-প্রেরিতা বহুরূপা দূতীর উক্তি—

আমি জাতিতে বনদেবী। প্রীতিতে কখনো তোমার ভগিনী, কখনো বা হিতোপদেশ দানে তোমার মাতামহী, কখনো প্রিয়সখী কখনো বা ননদিনী। আমার কথা শোন, একবার প্রসন্নভাবে আমার দিকে চাও, ভ্রূভঙ্গিতে ইঙ্গিত কর, যাতে তোমার বল্লভকুঞ্জর মাধব এসে ওই হৃদয়জাত কুম্ভদুটিকে নিবিড় আলিঙ্গনে নিপীড়িত করতে পারেন।

সখী

বান্ধবীকে যারা নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসে, কখনো কোন ছল করে না; পরস্পরের বিশ্বাসভাজন, সমান বয়সী এবং বেশভূষাদিতে সমতুল—তারাই পরস্পর সখী।

নায়িকার প্রতি সখী অতিশয় প্রীতি ও সহানুভূতি সম্পন্না হয় বলে, সে তার দুঃখ সইতে পারে না; প্রণয় বিষয়ে মিলন প্রচেষ্টায় অতিশয় যত্নশীলা হয়ে ওঠে।

শ্রীমতীকে বিরহকাতরা দেখে, বিশাখা একদিন কৃষ্ণের নিকট গিয়ে বলেছিলেন—

'তোহারি নয়নবাণ বড়ই পাবন, তাহে যদি রাই মরি যায়।
অনুপম গতি তব পাওব সুন্দরী, সো নহি শোচয়ি তায়॥
মাধব, এক রহব বড় শেল।
জো রূপ নাহি হেরি এ সব জগজন নয়ন অনর্থক ভেল॥'

তোমার নয়নবাণে আহত হয়ে প্রিয়সখী শ্রীরাধা যদি মরে মরুক তাতে দুঃখ নাই। কিন্তু শ্রীমতীর ওই নয়নের দৃষ্টি না

থাকলে, সকলের নয়নই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওই অনুপম নেত্র শোভার অভাবে জগৎ নেত্রহীন হয়ে পড়বে। অতএব, হে মাধব! তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার জীবনরক্ষা কর।

নায়ক ও নায়িকা উভয়ের ক্ষেত্রেই সখী দূতীর কাজ করে। বাক্য এবং ব্যঙ্গ ভেদে দূত্য দু'প্রকার হয়। ৩৪।

কৃষ্ণপ্রিয়ার বাচ্যদূত্য

শ্রীমতীর প্রতি তুঙ্গবিদ্যার উক্তি:

সখি! তোমার এই নতুন অবস্থা যে অনুভব করে নি, তার জীবনই বৃথা। তুমি আমায় শাপ দাও, মার, তর্জন গর্জন কর, দূরে ঠেলে ফেলে দাও, বা ঘর থেকে বের করে দাও—যা করবে তাই কর; আমি সত্য বলছি, আমার মন মানে না। আমি শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে সাধ্য সাধনা করবো। ৩৫।

কৃষ্ণপ্রিয়ার ব্যঙ্গদূত্য

শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি:

সুন্দরি! তোমায় দেখে আমার মনে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। তুমি কি কৃষ্ণবর্ণ অগুরুচন্দনের সৌরভ কামনা করছো? যদি তাই হয়, তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি চন্দন ব্যবসায়ী সেই বণিকের কাছে যাবো।

ব্যঙ্গার্থ, তুমি কি অগুরুসৌরভশালিনী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করছো, অথবা কৃষ্ণের অঙ্গসুরভি কামনা করছো। তা হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি সেই নৈগম বা নাগরের কাছে যাই। (নৈগম শব্দে নাগর ও বণিক উভয়কেই বুঝায়।

যথা বা

শ্রীমতীকে উৎকণ্ঠিতা দেখে, কোন এক সখী বলেছিল—

হে চকোরি! তুমি কি তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়েছ। তা হলে, ভাল কথা বলছি শোন। ওই দেখ, পূর্বাচলে জ্যোৎস্নাবিমল

চন্দ্রদেব চকোরীর প্রতীক্ষা করছেন। অবিলম্বে সেখানে যাত্রা কর, নিশ্চয়ই তোমার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হবে।

এখানে দৃষ্টান্তচ্ছলে সখী শ্রীরাধাকে অভিসারে যাবার উপদেশ দিচ্ছে। ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাচ্যদূত্য

বিশাখার উক্তি :

হে ব্রজসুন্দর! শ্রীমতীর সৌন্দর্যের কথা তোমায় আর কি বলবো! ত্রিলোকে তাঁর মত অতুলনীয় সৌন্দর্য আর কারো নাই। এই সৌন্দর্যেই ত্রিভুবন সুন্দর হয়ে উঠেছে। শ্রীমতীর এই অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে বিধাতা নিজেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

অথ ব্যঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যঙ্গ দুরকমের হয়। প্রেয়সীদের সামনে এক রকম, তাঁদের অনুপস্থিতিতে আর এক রকম। এই দুই ব্যঙ্গ আবার সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশভেদে প্রত্যেকটি দু'রকমের হতে পারে। অর্থাৎ ব্যঙ্গ মোট চার রকমের হয়। ৩৭।

কৃষ্ণপ্রিয়ার সম্মুখে কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশাখার উক্তি :

হে নবঘনশ্যাম! দেখ, ওই কলাপিনী কিছুতেই আমার কাছে আসছে না। আমি ওকে বশীভূত করতে পারলাম না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ওই স্নিগ্ধা রাধাকে নিজের হাতে ধর। ৩৮।

এখানে ব্যঙ্গ এই যে, কলাপিনী মেঘবিলাসিনী ময়ূরীর সঙ্গে তুলনা করে, সখী নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-অনুরক্তা স্নিগ্ধা শ্রীরাধার প্রতি নায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। অবশীকৃতা নায়িকাকে বশীভূত করায়, মিলনের অধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

যথা বা উদ্ধব সন্দেশে—

বিশাখার উক্তি :

হে মাধব ! বৃন্দাবনে অনেক স্ফীতাঙ্গিনী যুবতী আছে, যারা তোমার সম্ভোগ-অনুকূল। কাজেই আমার অগ্রবর্তিনী এই কোপন-স্বভাবা সহচরীকে আর ঘাঁটিও না। তুমি শঠকুলের গুরু, একথা নিশ্চয় জানেন, তাই উনি ভ্রূধনুতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কটাক্ষশর যোজনা করছেন।

ব্যঙ্গোদ্দেশে বিশাখার বক্তব্য এই যে, বৃন্দাবনে যে সব পীনোন্নতপয়োধরা ও গুরুনিতম্বিনী যুবতী আছে, তারা বিদগ্ধা নয়। সেইজন্য তারা রতিবামা হতে পারে না। সুতরাং ইচ্ছা করলেই সেখানে সহজে বিলাস বাসনা সিদ্ধ হবে। কিন্তু শ্রীমতী বিদগ্ধা ও তেজস্বিনী, তাঁকে ক্ষুব্ধ করলে কাম-সংগ্রাম উপস্থিত হবে এবং সহজে তাঁকে জয় করা সম্ভব হবে না। ৩৯।

ব্যপদেশ ব্যঙ্গ

অর্থাৎ ছলে অন্য বস্তুকে উপলক্ষ্য করে স্বগত ভাব প্রকাশ করা।

বিশাখা বললেন—ওই দেখ, মাধবীলতা কদম্ব-পরিমলে আকৃষ্ট হয়ে উৎফুল্ল ও উৎকালিকা হয়ে উঠেছে। আপন আশ্রয়বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, সে কদম্ববৃক্ষে আশ্রয় নেবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠেছে।

তাৎপর্য : হে হলধরপ্রিয়। মাধবী (শ্রীরাধা) তোমার প্রেমে মুগ্ধা হয়ে, আপন (ধর) পতিকে পরিত্যাগ করে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠেছে। ৪০।

কৃষ্ণপ্রিয়ার পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ

চম্পকাবলির কোন সখী তার অসাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে বললে—মুকুন্দ! বৃন্দাবনে যে সব ব্রজাঙ্গনা আছে, তাদের ভিতর একমাত্র চম্পকাবলিই তোমার অনুরূপা। তুমি যেমন উজ্জ্বল কৌস্তুভমণিতে সুশোভিত, সেও তেমনি পদ্মিনীবৃন্দের শিরোমণি।

তুমি সুরভীগণ পরিবৃত, সে সৌরভবতী। তোমার নবজলধর-কান্তি, তার বিদ্যুৎতুল্য দ্যুতি। তাই চম্পকাবলি ছাড়া অন্য কোন নায়িকা তোমার শোভা পায় না। অতএব হে মুরারি, তোমাদের উভয়ের মিলন অতি বাঞ্ছনীয়। ৪১।

ব্যপদেশ ব্যঙ্গ

ললিতার উক্তি—

হে মধুসূদন ভ্রমর! ওই যে উত্তুঙ্গ শৈলরাজি বিরাজ করছে, তার উত্তরে বিস্তৃত সরোবর আছে। সেই সরোবরের তীরে যে উন্নত বন বিরাজিত, তার মাঝখানে সুন্দর একটি লতামণ্ডপ আছে। সেই লতামণ্ডপের দ্বারদেশে চারিদিক সৌরভে আমোদিত করে, পুষ্পিতা মালতী লতা তোমার পথ চেয়ে আছে। তুমি সেখানে যাও!

ছলব্যঙ্গ এই যে, হে মধুসূদন কৃষ্ণ! ওই তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি-গোবর্ধনের উত্তরে, সরোবরতীরে বনের মধ্যে শ্রীরাধা তোমার পথ চেয়ে আছেন। তুমি অভিসারে যাও, বিলম্ব করো না। ৪২।

দূতী নিয়োগ

দয়িতের সঙ্গে মিলন কামনায় নায়িকারা যেভাবে দূতী নিয়োগ করে, তার প্রথা দ্বিবিধ—ক্রিয়াসাধ্য এবং বাচিক। ক্রিয়াসাধ্য বলতে বুঝায়, মুখে কিছু না বলে কার্যকলাপের দ্বারা (by actions and gestures) দূতী বা সখীকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, দূত্যের প্রয়োজন। আর বাক্যের দ্বারা (by instructions and expressions) দূত্য কার্যের জন্য সখীর কাছে যে মনোভাব প্রকাশ করা হয়, তা বাচিক (verbal)।

ক্রিয়া সাধ্য

অর্থাৎ হাবভাবে নায়িকার উৎকণ্ঠিতা অবস্থা লক্ষ্য করে, সখী নিজে থেকেই দূত্য কাজে এগিয়ে যায়; নায়িকার উপদেশের অপেক্ষা রাখে না।

আকাশে নবমেঘের উদয় দেখে, তন্বী দুটি বাহু প্রসারিত ক'রে সেই নব জলধরকে আলিঙ্গন করবার জন্য উদ্যত হয়েছেন। মুখে কিছু না বললেও, সহচরী তাই দেখে, নিজেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেল তাঁর সেই উৎকণ্ঠার কথা জানাতে। ৪৩।

ক্রিয়াসাধ্য দূত্য দু'রকমের, অনুভব ও সাত্ত্বিক। এটি অনুভব।

সাত্ত্বিক

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে শ্রীমতীর অঙ্গ স্বেদসিক্ত হয়ে উঠলো। তাঁর সেই স্বেদসিক্ত তনু রোমাঞ্চ শিহরণে কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল। তিনি সখীকে তাই দেখালেন। মুখে কিছু বলতে হলো না। উৎকণ্ঠিত তনুই যেন সখীকে দূত্য কাজে নিয়োগ করলো। সখী স্বয়ং গেল মাধবের কাছে শ্রীমতীর অবস্থা জানাতে।

অঙ্গের এই স্বেদোদ্গম ও রোমাঞ্চই সাত্ত্বিক নামে অভিহিত।

'মাধব বেণু শুনল যব রাধা। হৃদয়ে বিথারিল মনসিজ বাধা॥
কিছু নাহি বোলল দূতীক পাশ। তনু মাঝে হোয়ল পুলক বিকাশ॥
ঐছন দেখি দূতী করি অনুমান। নাগর আনিতে করল পয়ান॥'

বাচিক

পূর্বের মত বাচ্য ও ব্যঙ্গভেদে বাচিকও দুরকমের হয়।

বাচ্য

যথা, বিশাখার প্রতি শ্রীমতী—

সহচরি। তুমি আমার প্রাণস্বরূপা। তুমি যেমন নিপুণা তেমনি বাক্‌পটিয়সী। আমায় লঘুর চেয়েও লঘু (অত্যন্ত ছোট) প্রতিপন্ন না করে, যেমন করে পারো, আমার প্রতি মাধবকে অনুরক্ত করো।

ব্যঙ্গ

ব্যঙ্গ দুরকমের, শব্দমূল ও অর্থমূল। ৪৪।

শব্দমূল

শ্রীরাধা বললেন—হে মৃগাক্ষী বৃন্দে। আমি অন্য কোন প্রকার কলাকৌশল বা চাতুরি শিক্ষা করতে চাই না। শুধু 'কেশবন্ধন' অনুশীলন করতে চাই। অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণের (কেশবন্ধনং) করবী বন্ধন অভ্যাস করতে চাই। শব্দমূলগত অর্থ, সুন্দর ভ্রূবিশিষ্টা ব্রজনারীগণের 'কেশবং ধনং' (কেশবরূপী ধনকে) আয়ত্ত করতে চাই। ৪৫।

অর্থমূল ব্যঙ্গ

অর্থমূল ব্যঙ্গ বলতে স্বীয় পতির প্রতি আক্ষেপ, গোবিন্দের প্রশংসা এব দেশাদিবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বুঝায়। ৪৬।

স্বীয় পতির প্রতি আক্ষেপ

যথা—বিশাখার প্রতি পূর্বরাগবতী শ্রীমতীর উক্তি :

'দেখ দেখ সখি, বিধাতা করেছে বিষম চরিত পতি।
তাহাতে যখন না হইল মন, কি মোর হইল মতি ॥
এ রূপমাধুরী নিতিনিতি বাড়ে, নিকটে যমুনা বন।
তাহা দেখি মোর অন্তর পুড়িছে, ধৈরয না মানে মন ॥'

বিধিবিড়ম্বনা বশতঃ আমার চিত্তে ঘোরপ্রকৃতি পতির প্রতি কোনো রুচি নাই। আমার রুচিশীল মন দিনদিন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। পোড়া দেহ শাসন মানে না। যমুনাপারের ওই বন আমার কন্দর্প অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করে। ৪৭।

গোবিন্দের প্রশংসা

'কুলবতী হ'য়া পরপুরুষের স্তুতি করা নহে ভালি।
তুহু প্রাণসখী পরাণ সমান তেঞি সে তোমারে বলি ॥
কত না মাধুরী আছে তার গায়ে, যার এক কণা দেখি।
অমিয়া সিনান হইল আমার, ফিরিয়া না আসে আঁখি ॥'

সখি! শ্রীকৃষ্ণের কি অপরূপ রূপমাধুরিমা! ওই রূপের ছটায় আমার নয়ন মুদ্রু হয়ে আসে। এমন ভুবনমনোমোহন রূপ এ জগতে বিরল। ৪৮।

সখি! তুমি দূত্যকাজে অতি চতুরা। নাগর ব্রজরাজের নন্দন। আমার সেই শিশুতা এখন আর নাই। দেখো, যেন প্রমাদে না পড়ি। ৪৯।

দেশাদি বৈশিষ্ট্য

'মনোরম বৃন্দাবনে বহুলতাতরুগণে পুষ্প লাগি করিল ভ্রমণ।
অঙ্গ মোর ভাঙ্গে শ্রমে, আমি রহি এইস্থানে, শ্রম দূর করি কতক্ষণ॥
একাকী রহিব আমি, দ্রুত চলি যাও তুমি, কালিন্দীর তীরে সখি যাও।
তাহা করে ঝলমল বহুবিধ সুকমল তাহা মোর হাতে আনি দাও॥'

দেশাদি ও স্থল বিশেষের সৌন্দর্যের প্রতি সখীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য এই যে, দয়িতের সঙ্গে রতিবিহারের এই উৎকৃষ্ট স্থান। তাই নায়িকা বলছেন—সখি, তুমি যাও, মিলন ঘটাবার ব্যবস্থা কর। ৫০।

যথা বা—

শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন, সখি! যমুনা-পুলিনের ওই বনভূমি যেমন বাসন্তী সুষমা ও চন্দ্রালোকে মধুময় হয়ে উঠেছে, তেমনি আমার তনুলতাও নববয়স ও যৌবনমাধুর্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে; এখন আমার কি করা উচিত, তাই বল। ৫১।

শ্রীমতী আদেশ না করলেও, প্রসঙ্গচ্ছলে যে মনোভাব প্রকাশ করলেন, তাতে সখীর বুঝতে বাকী রইল না যে, মিলন সংঘটনের জন্য দূত্য প্রয়োজন। যথা—

'এই যমুনার বন তাহে দক্ষিণ পবন, তাহে পুনঃ চাঁদ প্রকাশিত।
প্রিয় সখী আছে সঙ্গে, ভ্রমণ করিব রঙ্গে, কর এখন যা হয় উচিত॥'

—শচীনন্দন

সখী প্রকরণ

নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা ও বিহারাদি সম্যক্ রূপে বিস্তারিত করতে যে সহায়তা করে এবং বিশ্বাসরত্নের পেটিকাস্বরূপা অর্থাৎ অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্রী, সে-ই সখী। সখীদের প্রকৃতিগত ভেদ সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সখীদের মধ্যে যে-যে সখী একই যূথের অন্তর্ভুক্তা, তাদের ভিতরেও অধিকা, মধ্যা এবং মৃদ্বী প্রভৃতি প্রকৃতিভেদ অনুসারে পার্থক্য হয়।

সখীদের মধ্যে যার প্রেম-সৌভাগ্য ও গুণের আধিক্য সবচেয়ে বেশী, তাকে 'অধিকা' বলা হয়। আত্যন্তিকা, আপেক্ষিকা, সমা ও লঘু ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে সখীদের বারোটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হলো।

গুণানুযায়ী পর্যায় : । ১—১২।

১	আত্যন্তিকাধিকা-প্রখরা		৭	সমপ্রখরা	
২	"	মধ্যা	৮	"	মধ্যা
৩	"	মৃদ্বী	৯	"	মৃদ্বী
৪	আপেক্ষিকাধিকা-প্রখরা		১০	লঘুপ্রখরা (আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী)	
৫	"	মধ্যা	১১	"	মধ্যা
৬	"	মৃদ্বী	১২	"	মৃদ্বী

বামা

যে নায়িকা সব সময়েই মান করতে চান এবং মানের শৈথিল্য ঘটলেই কুপিতা হয়ে ওঠেন, ফলে নায়ক তাঁকে বশীভূত করতে পারেন না, সেই নায়িকাকে 'বামা' নায়িকা বলা হয়। বামা নায়িকা প্রায়ই নায়কের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে থাকেন।

বামা সখী নায়িকাকে মান বিষয়ে উত্তেজিত করে।

দক্ষিণা

যে নায়িকা মান করে থাকতে পারেন না, যুক্তি দিয়ে নায়কের সঙ্গে কথা বলেন, এবং নায়কের স্তুতিবাক্যে প্রসন্না হন, তাঁকে 'দক্ষিণা' নায়িকা বলে।

দক্ষিণা সখী যুক্তিদ্বারা নায়িকার মান প্রশমিত করে, তাঁকে মিলন বিষয়ে উৎসাহিত করে। ১৩—১৫।

দূত্য

যূথেশ্বরীদের দূত্যকার্যের নিমিত্ত নায়িকা ও সখীদের প্রকৃতিগত গুণাগুণ বিশেষ ভাবে বর্ণিত হলো।

দূত্য কার্য বলতে বুঝায়, দূরবর্তী নায়ক ও নায়িকার মধ্যে মিলন বা অভিসারের যোগাযোগ স্থাপন করা। ১৬।

নায়িকা দূতী ও সখী

নায়িকাগণের মধ্যে যিনি প্রথমা বা আত্যন্তিকাধিকা তাঁকেই নিত্যনায়িকা বলা হয়। আর মধ্যস্থা তিনটী অর্থাৎ আপেক্ষিকাধিকা, সমা ও আপেক্ষিকা লঘু—এই তিন নায়িকার পক্ষে নায়িকাত্ব ও সখীত্ব দু-ই সম্ভব। ১৭।

তিন প্রকার নায়িকার মধ্যে যে প্রধানা, অর্থাৎ আপেক্ষিকাধিকা তাকে নায়িকাপ্রায়া বলা হয়। আর দ্বিতীয়া, অর্থাৎ সমাকে 'দ্বিসমা' বলা হয়। নিজের চেয়ে যে 'অধিকা' তার ক্ষেত্রে দ্বিসমা নায়িকা সখীর কাজ করে। গুণপর্যায়ে নিজের চেয়ে যে লঘু, তার সম্পর্কে সে নায়িকাত্ব করে। আর তৃতীয়া, অর্থাৎ আপেক্ষিকী লঘু, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সখীত্ব করে। যে পঞ্চমী, অর্থাৎ আত্যন্তিকী লঘু, তাকে নিত্যসখী বলা যায়। কেননা, তার চেয়ে আর কেউ লঘু নাই; সুতরাং তার পক্ষে নায়িকাত্ব করা সম্ভব হয় না। ১৮।

আত্তা অর্থাৎ আত্যন্তিকাধিকার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকাধিকা প্রভৃতি সখীরা সব সময় দূতীই হয়ে থাকে, কখনো নায়িকা হয় না। আর

পঞ্চমী অর্থাৎ আত্যন্তিকী লঘুর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সকল সখীই নায়িকা হয়, কিন্তু তারা কখনো দূতী হতে পারে না।

নিত্যনায়িকা

যাঁকে যূথেশ্বরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিই নিত্যনায়িকা। এই নিত্যনায়িকা অত্যন্ত আদরের পাত্রী বলে, তাঁর দ্বারা মুখ্যদূতীর কাজ সম্ভব হয় না। যূথভুক্তা সখীদের মধ্যে যে তাঁর অত্যন্ত অনুরক্তা, যূথেশ্বরী তাকেই দূত্যকার্যে নিয়োগ করেন। তাছাড়া, কখনো কখনো যূথেশ্বরী অতিশয় প্রণয় বশতঃ তাঁর সখীর দৌত্য করেন। কিন্তু এই ধরণের দৌত্য গৌণ। তাকে মুখ্য বলা যায় না। দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত না করে যে দূত্যসিদ্ধি হয়, তাকে গৌণদূত্য বলে।

গৌণদূত্য দু'রকমের, যথা—সমক্ষ এবং পরোক্ষ।

সমক্ষদূত্য

সমক্ষ গৌণদূত্য দু'রকম—সাঙ্কেতিক ও বাচিক। ১৯।

চোখের কোণ, ভ্রূ বা আঙুলের ইসারায় শ্রীকৃষ্ণকে আপন সখীর কাছে যাবার জন্য ইঙ্গিত করে, দূতী নিজে আত্মগোপন করে। এর নাম সাঙ্কেতিক সমক্ষদূত্য। ২০

যথা—

'সুন্দরী জানলু তোঁহার চরিত। কানু সঞে করলি নয়ন ইঙ্গিত॥
তুঁহু সে লুকাওলি কুঞ্জকি মাঝ। মুঝে দুঃখ দেওল নাগর রাজ॥
যদি ইহ না রহত লতাতরু আলি। কি করিত মঝু গতি শঠ বনবালী॥'

এই উদাহরণে অধিক মৃদ্বীর দূত্যক্রিয়া প্রকাশিত হলো। ২১।

বাচিক দূত্য

বাচিক দূত্য তিন রকমের—(১) শ্রীকৃষ্ণ ও সখী উভয়ের অগ্রে (উপস্থিতিতে) বা সামনে শ্রীকৃষ্ণকে বলা, (২) শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে

(অনুপস্থিতিতে) বা আড়ালে সখীকে বলা, এবং (৩) সখীর পশ্চাতে বা আড়ালে শ্রীকৃষ্ণকে বলা। ২২।

যথা—

সখী ও কৃষ্ণের সামনে কৃষ্ণের প্রতি শ্যামলার উক্তি :

'আমি গোপনারী আর কি করিব উপকার, এক উপকার এবে করি।
এই মোর সহচরী বনফুল করে চুরি, তারে আমি আনি দিল ধরি॥
এই ধরি দিনু চোর আর দোষ নাহি মোর। আমি গৃহে করিএ গমন।
যে ইচ্ছা হয় তোমার, কর সেই প্রতিকার, তুমি ব্রজরাজের নন্দন॥'

এটি অধিকপ্রখরা-দূত্যের উদাহরণ। ২৩।

শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে সখীর প্রতি উক্তি—

শ্রীমতী ছলপূর্বক চিত্রার দৌত্য করলেন।

'আমার মুকুতা ঝুরি ভুমিতে পড়িল ছিঁড়ি তুমি তাহা লহ অন্বেষিয়া।
মালা গাঁথে ফুল লঞা তাহে ব্যগ্রচিত্ত হঞা হরি আছে আনমন হয়া॥
বিস্মিত হয়াছে কানু, পড়েছে মোহন বেণু, গড়ি যায় ধূলির উপরে।
কপটে নিকটে যায়া বেণু রাখি লুকাইয়া বড় দুঃখ দিয়াছে আমারে॥'

এই উদাহরণে 'অধিকমধ্যার' দূত্য প্রকাশিত হলো। ২৪।

সখার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাচিক দূত্য। ২৫।

যথা—

'গহন কাননে কুসুম আনিতে গেছে মোর সহচরী।
নির্জন বনে একাকী পাঠাঞা ভাবি আমি মুরহরি॥
সেই সহচরী কিছুই না জানে যুবতী কুলেরবালা।
তারে একাকিনী পথ মাঝে পাঞা তুমি না করিহ জ্বালা॥'

হে অঘহর। তুমি এখন আমার গৃহ থেকে যাচ্ছ। আমি সখীকে গহন বনে পুষ্পচয়ন করতে পাঠিয়েছি। তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, সেই অতিমুগ্ধাকে নির্জন বনে একাকিনী পেয়ে তুমি যেন তাকে খেদান্বিতা করো না।

পরোক্ষদৃত্য

এক সখী যখন অন্যকোন সখীকে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন বা ছল করে কোন সখীকে কৃষ্ণের কাছে পাঠান, তখনই হয় তাঁর পরোক্ষ দূত্য।

'চল, আমরা বৃন্দারণ্যে গিয়ে চাঁদ দেখে আসি'-এই কথা বলে কলাবতী তাঁর সখী রঙ্গদেবীকে আগে আগে নিয়ে বৃন্দাবনের গহন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শঙ্কিতা হয়ে রঙ্গদেবী বললেন -'কিন্তু চাঁদ কৈ, সখি? তুমি যে আমায় অন্ধকার কুঞ্জবনের পথে নিয়ে চলেছ।'

কলাবতী বললেন—'তোমার দ্বিতীয় প্রতিমূর্তি শশিকলা শ্রীধারা আজ গুরুজনের আদেশে গৃহে অবরুদ্ধা। সুন্দরি! শ্রীমতীর কোন অসম্মতি নাই। তিনি সব সময়ই তোমার কল্যাণ কামনা করেন।—তুমি এগিয়ে যাও। ওই দেখ, কৃষ্ণের অঙ্গসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করে' পথের সংকেত সূচনা করছে। তুমি আর বিলম্ব করো না।'

'মধুকর নিকর তুয়া পথ দরশে। তুয়া লাগি মাধব বনমাঝে বিলসে।
না করু বিলম্বন খঞ্জন নয়নে। তুরিতে চলহ অব কুঞ্জকি ভবনে॥'

ব্যপদেশ বা ছল

কৃষ্ণের নিকট লিখিত কোন পত্র বা প্রেরিত কোন উপহার নিয়ে, কিংবা নিজের প্রয়োজনে, অথবা কোন আশ্চর্য জিনিস দেখবার অছিলায় গিয়ে উপস্থিত হওয়াকে ব্যপদেশ বা ছল বলে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রসালমঞ্জরীর উক্তি : (লেখ্য ব্যপদেশ)

'আমি শ্রীমতীর পত্রবাহিকা দূতী। তুমি আমার সঙ্গে লাম্পট্য করবার চেষ্টা করছো কেন? দূতীর এ ধর্ম নয়। সে প্রাণত্যাগ করতে পারে, কিন্তু সখীর জন্য দৌত্য করতে এসে, নিজে দেহদান করতে পারে না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,' তুমিই বা দূতীর রীতি পরিত্যাগ করে বাম চক্ষের বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছো কেন? তোমার সখীর লেখা এনেছ, পড় শুনি। সুন্দরি! এই কুঞ্জভবনে সুগন্ধ পুষ্পে আবৃত কোমল শয্যা রচিত আছে। অলিকুল মৃদুগুঞ্জনে তোমায় আহ্বান করছে।' ২৬।

উপায়ন ব্যপদেশ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতিমঞ্জরীর উক্তি :

'ছাড় ছাড় নাথ, বসন আঁচল নিছনি লইয়া মরি।
গহন কাননে একেলা পাইয়া হট না করিহ হরি॥
নিরজন বন বড়ই গহন হইল সাঁঝের বেলা।
রাধার বচনে এখানে আইনু তোমা দিতে বনমালা॥
তুয়া গুণাগুণ জানি হে সকল, কারে বা কহিব রোষ।
এখানে আসিয়া ভাল না করিল, নাহিক তোমার দোষ॥'

'নিজ-প্রয়োজন' ব্যপদেশ

শশিকলার প্রতি ললিতার উক্তি :

'গত রাত্রে কদম্ববনের কুঞ্জকুটীরে শ্রীমতী ভুলকরে যে মুক্তামালা ফেলে গিয়েছিলেন সেই মালা তোমায় আনতে বলেছিলেন। কিন্তু তুমি তা না নিয়ে গৃহে ফিরে এলে যে।

তাৎপর্য—নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস আনবার ছলে, শ্রীমতী তাঁর প্রিয় সখীকে কদম্ববনের কুঞ্জকুটীরে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, নির্জন কদম্ববনের কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেই প্রিয়সখার মিলন ঘটানো। ২৭।

'আশ্চর্য-দর্শন' ব্যপদেশ

আশ্চর্যদর্শনচ্ছলে সখীকে কোন নির্জনস্থানে পাঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটাবার প্রয়াস।

সরোবরের তীরে একটি অলিশ্যাম হংসের অদ্ভুত কেলি দেখবার

জন্য শ্রীমতী তাঁর কোন প্রিয়সখীকে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখীর মিলন ঘটানো। সখী ফিরে এলে, অন্য সখীদের সামনে পরিহাস করে শ্রীমতী বললেন—

'মুখে আছে ভুজঙ্গিনী কণ্ঠেতে অম্বরমণি শিরে আছে সুধাকরগণ।
মুখেতে মানিক খসে হেন শ্যামবর্ণ হংসে দেখিবারে করিলে গমন॥
আমার বচনে গেলে আশ্চর্য্য দেখিয়া আইলে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
আশ্চর্য্য দেখিলে তুমি, সত্য কয়েছিলাম আমি, কোপ কর কিসের কারণ॥'

অধরে মুরলী—যা কামসর্পের প্রতীক, কণ্ঠে কৌস্তভমণি, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকলাশোভিত চূড়া, ওষ্ঠে অস্ফুট মধুর বাক্যে মানিক ঝরে; এ হেন ভ্রমরশ্যাম কৃষ্ণ সরোবরতটে কেলিরত ছিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য, ছল করে শ্রীমতী তাঁর সখীকে পাঠালেন, যাতে শ্যামের সঙ্গে সখীর মিলন হয়।—এই ধরণের দূত্যকে 'আশ্চর্য দর্শন' ব্যপদেশ দূত্য বলা হয়। ২৮।

নায়িকাপ্রায়াত্রিক

আপেক্ষিকাধিকাদিত্রয় অর্থাৎ অধিক প্রখরা, অধিক মধ্যা ও অধিক মৃদ্বী—এই তিন প্রকার নায়িকা যদি 'লঘু' নায়িকার জন্য স্পষ্টরূপে দূত্য করে, তা হলে তাকে নায়িকাপ্রায়া দূত্য বলে। ২৯।

অধিকপ্রখরা দূত্য

নিজের চেয়ে লঘীয়সী সখীকে ললিতা বললেন—'শশুলি! বহুদিন পরে আজ তুমি আমার হাতে পড়েছ। অমন আকুল হয়ে মিনতি করলে আর কি হবে! তোমায় অভিসার করিয়ে করিয়ে শীর্ণ করে তবে ছাড়বো। যে কষ্ট আমায় দিয়েছ, তার শোধ নেবো।

হে সখি! লতাকুঞ্জের সীমানায় এসে, কেন থমকে দাঁড়াচ্ছো? তোমার ভাগ্য খুব প্রসন্ন, দেখছি! এখনই রতিসম্ভোগে সিংহের মত পরাক্রমশালী শ্যাম তোমার কুচকুম্ভস্থিত মুক্তাহার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দিবেন।' ৩০।

অধিকমধ্যা দূত্য

বিশাখা তাঁর চেয়ে লঘু কোন সখীকে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এনে বললেন—সখি! তুমি বাক্যের দ্বারা আমার সঙ্গে বারবার ছলনা করেছ, চোখের ইসারায় শ্রীকৃষ্ণকে এনে আমার অঙ্গ সম্ভোগ করিয়েছ; আজ সেই কৃষ্ণকে বশীভূত করে আমি তোমায় পাইয়ে দিলাম। হে পদ্মিনি! এখন সেই কৃষ্ণহস্তী তোমার উপর যথেচ্ছা লাম্পট্য বিস্তার করুন।' ৩১।

'নিতিনিতি কানুসনে ইঙ্গিত করিঞা, তাকর নিকটে দেয়লি মঝু ধরিঞা।
আজু পাওলু তুহে কৃষ্ণকি নিলয়ে, হরি কাছে দেয়লু কি করব বিনয়ে॥'

অধিকমৃদ্বী দূত্য

কোন এক বিনীতা সখীর প্রতি চিত্রার উক্তি:

'সখি! যমুনাতীরের পুষ্পিত কুঞ্জবনে তুমি আমায় প্রতিদিন অভিসার করিয়েছ। কিন্তু আমি অতি অকৃতজ্ঞা, তাই তোমার জন্য কিছু করতে পারি নি। একবার যদি তোমায় নিয়ে গিয়ে ওই কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করাতে পারি, তা হলে সেই ঋণ থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাই।'

'কত কতদিন গহন কাননে কানু মিলাইলে তুমি।
অনেক যতনে তোমার সে ধার শুধিতে নারিনু আমি।
এবে উপকার কি করিব আর, আনিল কুঞ্জবনে।
মনের হরষে এ নব কাননে বিহর হরির সনে॥'

দ্বিসমাত্রিক

সমপ্রকৃতি প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী—এই তিন শ্রেণীর নায়িকা বা সখী পরস্পরের নায়িকা ও দূতী দু-ই হতে পারে। এদের দ্বিসমা বলা হয়। ৩২।

সমপ্রখরা দূত্য

অন্য সখীর প্রতি এক সখীর উক্তি :

'সখি ! যদিও আজ তোমার পালা, তবুও আজ আমিই দূত্য করবো। তুমি আর অমন করে ভ্রূ নাচিও না। তনুলতা সৌন্দর্য মণ্ডিত করো, অর্থাৎ প্রসাধন করে অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করো। তোমার বামচক্ষু আজ নৃত্য করে আমায় অনুরোধ করছে ! আমি গোষ্ঠে চললাম মাধবের মৃগয়ায় ; তোমার জন্য মাধবকে ধরে আনতে।' ৩৩।

'তোমাতে আমাতে মনের পীরিতি সুখে থাকি নিতিনিতি।
তুমি একদিন আমি একদিন পরস্পর হই দূতী ॥
তোমার নয়ন কহে পুনপুন আনিতে নাগর বরে।
ভঙ্গি ছাড় তুমি, এই যাই আমি কানু আনিবার তরে ॥'

সমমধ্যা দূত্য

কমলা তাঁর সখী শশিকলাকে বললেন—'আজ তুমি মুরারির হাতে পড়েছ। আমি এখন এখান থেকে যাই।'

শশিকলা বললে—'কি আশ্চর্য ! আমি না তোমার দূতী ! কেন বৃথা এ জল্পনা করছো ?'

পরস্পরের এই আলাপন শুনে, শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে উভয়কে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করলেন, এবং হৃদয়ে স্থাপন করে একই সঙ্গে দুজনের সঙ্গে প্রণয় লীলায় রত হলেন। ৩৪।

'এই যুকতি যব দুই সখী করতহি তৈখনে নাগর গেল।
দুহুক হৃদয়ে ধরি মনোমথে মাতল, নিবিড় আলিঙ্গন দেল।'

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

'মাধবি ! মালতী তোমায় আমার হাতে সমর্পণ করেছে। এখন তুমি কোথায় যাবে ! আর মালতীই বা আমার হাতে তোমায় তুলে দিয়ে, কোথায় যাবে ? তোমাদের দুজনের একসঙ্গে সমাগম সম্ভব

নয়। অতএব এসো, আজ কৃষ্ণ ভ্রমর একসঙ্গে দুজনের মধুপান করে তৃপ্ত হোক।'

সমমধ্যা দুই সখীর অভিন্ন সৌহার্দ্য খুব মধুর। কিন্তু প্রেম-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন যে, এ ধরণের প্রেম নিদর্শন বিরল।

সমমৃদ্বী দূত্য

শ্রীমতীর কোন প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

'মুকুন্দ। ওই দেখ মন্দরাক্ষী আমায় তোমার কুঞ্জকুটীরে নিয়ে এসে, নিজে গোপনে পালিয়ে যাচ্ছে। যাও, দ্রুত তুমি তার অনুসরণ কর। পিছু পিছু ছুটে গিয়ে তাকে নিবৃত্ত কর।'

এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ মন্দরাক্ষীকে আহ্বান করে বললেন—

'সুন্দরি! তোমার সখীর কথায় আমি তোমার সুখের জন্য তোমায় আহ্বান করছি। এসো, পালিও না। শশধরের পাশে তারকার মত তোমরা দুজনে আমার দুপাশে শোভিত হও।'

সখীপ্রায়ত্রিক

লঘু প্রখরা, লঘু মধ্যা ও লঘু মৃদ্বী—এই তিন শ্রেণীর নায়িকা প্রায় সর্বদাই দূত্য কার্য করে থাকে, তাই তাদের সখীপ্রায়া বলা হয়।

লঘুপ্রখরা দূত্য

উদাহরণ : গীতগোবিন্দে শ্রীমতীর প্রতি তুঙ্গবিদ্যা,

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মিতি শ্রান্তোভৃশং তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসংবাধবিম্বাধরং। ইত্যাদি

'তুয়া গুণ মনে করি কাতর নাগর জরজর মনোমথ বাণে।
কত অভিলাষ করই হরি তোহারি অধর সুধারস পানে॥
বাত শুনহ মোর চল তুহু সত্বর বৈঠহ নাগর কোর।
তোহারি কুটিল দৃগঞ্চল শরাঘাতে দাস হয়াছে হরি তোর॥'

—শচীনন্দন

যে নাগর ক্রীতদাসের মত তোমার চরণ সেবা করছেন, তাঁর প্রতি সম্ভ্রম কিসের ?

লঘুমধ্যা দূত্য

শ্রীমতীর প্রতি বিশাখার উক্তি —

'কেন কেন রাই কুটিল নয়নে চাহিছ আমার পানে।
কুসুম লাগিয়া তুমি সে এসেছ যমুনা গহন বনে ॥
কুটিল নাগর সে সব জানিয়া কখন আসিল বনে।
আমি কুলবতী সরল অন্তর কেমনে জানিব মনে ॥'

লঘুমৃদ্বী দূত্য

যথা চন্দ্রাবলীর প্রতি শৈব্যা—

'নিকুঞ্জভবনে নাগর ঘুমায় চামর ঢুলাহ তুমি।
কালিন্দীর তীরে কমল ফুটেছে তুলিয়া আনি গে আমি ॥'

এই তিন প্রকার নায়িকার মধ্যে কেউ কেউ ঈষৎ নায়িকাত্বের জন্য উৎসুক হয়। কেউ বা সে বিষয়ে নিজে আগ্রহশীলা না হয়ে, সখীর সুখে অভিলাষিণী হয়।

নায়িকাত্বে ঈষৎ ঔৎসুক্যযুক্তা :

আত্যা—

শ্রীরাধা পরিহাস করে শশিকলাকে বললেন—'সখি! কুঞ্জগৃহে আমি ময়ূরপুচ্ছ ফেলে এসেছি, নিয়ে এসো—এই কথা বলাতে তুমি হাসিমুখে তখনই গিয়েছিলে। কিন্তু আমি যে ময়ূরপুচ্ছ আনতে বলেছিলাম তা ত্যাগ করে, নিজে যে শতশত ময়ূরপুচ্ছ লাভ করেছ তাই আঁচলে ঢেকে নিয়ে, অধোবদনে গৃহে ফিরে আসছো। লজ্জা কি? ৩৫।

সখীর সুখে অভিরুচি :

দ্বিতীয়া—

'তোমার চরণে বাজিবে বলিয়া নিতি বনে যাই আমি।
কুসুম তুলিতে মোরে বারেবারে আর না পাঠাও তুমি॥
হয়া তুয়া সখী আমি মনে সুখী, কখন না জানি দুখ।
তুয়া সেবা হতে নাগর সহিতে রতি নহে বড় সুখ॥'

নিত্যসখী

নায়িকাত্বের অপেক্ষা না রেখে, সখ্য বিষয়ে যার সর্বদাই অধিক প্রীতি, তাকেই নিত্যসখী বলে।

নিত্য সখী দু'রকমের। এক আত্যন্তিকী লঘু; আর এক আপেক্ষিকী লঘু।

আত্যন্তিকী লঘু

উদাহরণ :

মাধবের সঙ্গসুখের তুল্য পৃথিবীতে আর কোনো সুখ নাই। এই কথা বলে, মণিমঞ্জরীকে অভিসারে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করলে, সে বলেছিল—'সখি! কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভে শ্রীরাধা যে-সুখ অনুভব করেন, আমার পক্ষে আত্মসুখ লাভের চেয়ে সেই সুখই অধিক।'

অনেক চাতুরি করা সত্ত্বেও মণিমঞ্জরীর মনে কখনো অভিসার স্পৃহা জাগেনি। সে শ্রীমতীর নিত্যসখী।

আপেক্ষিকী লঘু

যথা—

বনমালার জন্য পুষ্পচয়নরতা কোন সখীকে কুঞ্জদ্বারে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—'হে শোভনাঙ্গি! তুমি কুঞ্জের ভিতরে এসে আমার অঙ্কশায়িনী হয়ে অলৌকিক সুখ সম্ভোগ কর।'

উত্তরে সখী বলেছিল—'হে গোবিন্দ! শ্রীরাধাই তোমার উজ্জ্বল রস-সম্ভোগের যোগ্য ভূমি। তোমার অঙ্গসঙ্গ-রসাস্বাদনে আমার

কোনো ঔৎসুক্য নাই। তোমার যে সেবায় অশেষ বধূজনের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, আমায় সেই সেবায় নিযুক্ত কর।'

উক্ত সখীদের দূত্য

কোন সখী শ্রীমতীকে অভিসার করিয়ে, কুঞ্জদ্বারে নিয়ে গিয়ে মাধবকে বললেন—'হে বৃন্দাটবীর অধিপতি! এই যে আমার প্রিয়সখীকে এনেছি। কিন্তু ইনি কুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করছেন না। কুঞ্জবনের দেহলী সংলগ্ন হয়ে, আমার দিকে কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। ভ্রূকুটিকারিণীকে অনুনয় কর।'

প্রখরা এবং মৃদ্বী—এই দুই প্রকার নায়িকা আপেক্ষিক হয়। অধিক প্রখরার চেয়ে সামান্য-প্রখরা মৃদ্বী, এবং অধিক মৃদ্বীর চেয়ে সামান্য-মৃদ্বী প্রখরা হয়। প্রাখর্যাদি স্বভাব সম্পর্কে নিম্নে যথাযথ-ভাবে উল্লেখ করা হলো। দেশ-কালাদির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদেরও বিপর্যয় ঘটে। ৩৬।

প্রাখর্যের বিপর্যয়ঃ

'ঘন আঁধিয়ার এ ঘোর রজনী, দেবতা বরিষ হয়।
প্রচণ্ড অনিল ঘন গরজন দেখিয়া লাগায় ভয়॥
এমত সময়ে নাগর আইলা, দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়।
আমি সে ললিতা প্রাণসখী তোর চরণে ধরি প্রভা কয়॥
বিনয় করিয়া কত না কহিছে, ছাড়ি দেহ তুমি মান।
আসিয়া নাগর করুক সত্বর তোর মুখ সুধা পান॥'

মানিনী শ্রীরাধাকে ললিতা অনুনয় করছেনঃ অন্ধকার রজনী, ধারাময়ী বৃষ্টি, প্রচণ্ড ঝড় বইছে। তবুও তোমার প্রণয়মুগ্ধ নাগর এই ঘোর দুর্যোগ উপেক্ষা ক'রে, দ্বারদেশে এসে অপেক্ষা করছেন। আমি তোমার পায়ে মাথা রেখে বলছি, প্রিয়সখি! মান পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হও। ললিতার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ললিতা প্রখরা হলেও, এক্ষেত্রে তার বিপর্যয় ঘটেছে। অত্যন্ত মৃদু হয়ে তিনি রাধা-কৃষ্ণ মিলনের জন্য দূত্য করেছেন। ৩৭।

মৃদুতার বিপর্যয়ঃ

চন্দ্রাবলার সখা পদ্মার সঙ্গে শ্রীমতীর কথোপকথন শুনে, চিত্রা শ্রীমতীকে বললে—

'শুন শুন সুন্দরী তুয়া গুণগান ছলে পদ্মা করয়ে উপহাস।
তুহু বড় মুগধিনী তব হি আদর করি তাহে আনসি নিজ পাশ॥
কিঞ্চিত রোষনয়ন কুরু সুন্দরী, চিত্রা পুরাবে মনঃ সাধ।
পদ্ম 'পরি যেন অতি মৃদু হিমকণ বিতরই দারুণ প্রমাদ॥'

মৃদুস্বভাবা চিত্রা শ্রীমতীকে তিরস্কার করে বললে—সখি! গুণগান ছলে কুটিলবুদ্ধি পদ্মা তোমার প্রতি কটাক্ষ করেছে। তবুও তুমি অনুনয় ত্যাগ করছো না। আদর করে পাশে বসাচ্ছো! তুমি যদি ক্রুদ্ধ হও, তাহলে চিত্রা সমুচিত প্রতিবিধান ক'রে পদ্মার বিনাশ সাধন করে।

চিত্রা স্বভাবতঃ মৃদু হলেও, এখানে তার বিপর্যয় ঘটেছে। মৃদ্বীর প্রখরতা প্রকাশ পেয়েছে। ৩৮।

সখী-ব্যবহার

সখী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে-যূথেশ্বরীর দূত্য করতে এসে সখী যদি নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়, সে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে সুরত প্রার্থনা করলেও, সে কখনো সম্মত হয় না।

যথা

শ্রীমতীর প্রেরিত কোন দূতী নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, শ্রীকৃষ্ণ বারবার কন্দর্প ধনুতে শর যোজনা ক'রে তার উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলেন। দূতী তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বলেছিল—হে গোবিন্দ! আমি আমার সখীর জন্যে দূত্য করতে

এসেছি। তুমি কেন আমার প্রতি কন্দর্পবাণ নিক্ষেপ করছো! যদি দরকার হয়, প্রাণ দিতে পারি ; কিন্তু দেহ দান করতে পারবো না। এই দেহ দিয়ে বান্ধবীর জন্যে যা আমার করণীয় তাই এখনো করতে পারিনি। ৩৯।

সখীক্রিয়া

যে যে কাজ সখীদের কর্তব্য বা করণীয় তাকে সখীক্রিয়া বলা হয়। ৪০।

সখীগণের কার্যাবলী :

১। নায়কের প্রতি নায়িকার এবং নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেম ও গুণগান পরস্পরের নিকট কীর্তন করা।

২। তাদের পরস্পরের মধ্যে আসক্তি বৃদ্ধি করা।

৩। উভয়ের অভিসার করানো।

৪। কৃষ্ণের নিকটে সখীকে সমর্পণ করা।

৫। পরিহাস।

৬। আশ্বাস প্রদান।

৭। নেপথ্যে নায়িকাকে সুসজ্জিতা করা।

৮। দুজনের মনের কথা উদ্‌ঘাটন করা।

৯। একজনের কাছে অপরের দোষ ঢাকা।

১০। পতি প্রভৃতিকে ছল করে স্থানান্তরে পাঠানো, ইত্যাদি পরিবঞ্চনা।

১১। শিক্ষা প্রদান।

১২। উপযুক্ত সময়ে নায়ক নায়িকার মিলন ঘটানো।

১৩। চামরাদি ব্যজন করা।

১৪। উপালম্ভ অর্থাৎ প্রয়োজন মত নায়কের প্রতি তিরস্কার।

১৫। „ „ প্রয়োজন মত নায়িকার প্রতি ভর্ৎসনা।

১৬। সন্দেশ প্রেষণ বা একের নিকট অন্যের সংবাদ বহন করা।

১৭। নায়িকার প্রাণরক্ষার জন্য সতত যত্নবতী হওয়া।

পরবর্তী ৪১ হতে ৫৫ শ্লোকে পদাবলী, উদ্ধব সন্দেশ ও হংসদূত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সখীক্রিয়ার বিবিধ উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে।

উল্লিখিত সখীগণের অন্যবিধ ধর্ম পুনরায় বর্ণিত হলো।

সখীদ্বিবিধা

সখীদের কার্যকলাপ ও মনোভাব অনুযায়ী 'অসমস্নেহা' ও 'সমস্নেহা' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কৃষ্ণের প্রতি এবং যূথেশ্বরীর প্রতি তারা এই দ্বিবিধ মনোভাব পোষণ করে। ৫৬।

অসমস্নেহা

অসমস্নেহা দ্বিবিধ। এক, কৃষ্ণ অপেক্ষাও প্রিয়সখীর প্রতি অধিক স্নেহবতী। অপর, প্রিয়সখী অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহবতী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহবতী

যে সব সখী অন্তরে অন্তরে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অতি আপনজন মনে করে, এবং সেই অভিমানে অন্য কোন যূথেশ্বরীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না, শুধু মাত্র আপন যূথেশ্বরীকেই আশ্রয় করে, তারা হরিস্নেহাধিকা আবার যারা যূথেশ্বরীর প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহশীলা হয়েও অন্তরে কৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহ বহন ক'রে তাঁর জন্য দৌত্য কার্য করে, তাদেরও 'হরি-স্নেহাধিকা' বলা হয়। ৫৭।

যথা—

শ্রীমতীর প্রতি ধনিষ্ঠার উক্তি :

'বচনে কতই কহি মনে নাহি আন। মঝু মনে নাহি লাগে ঐছন মান॥
ফিরি দেখ কাতর নাগর তোর। ইহ দেখি অন্তর বিদরয়ে মোর॥
তুয়া মান হোয়ল দিনকর চণ্ড। মলিন হোয়ল দেখ নাগর চন্দ॥'

হে সখি! তোমার দুর্জয় মান আমার অন্তর পীড়িত করে,

আমি সইতে পারি না। ওই দেখ, তোমার মানের খরতর উত্তাপে মাধবের মুখেন্দুচ্ছবি ম্লান হয়েছে। হে মানিনি! তাই আমি অন্তরে অত্যন্ত গ্লানি বোধ করছি। অন্যান্য সখীদের মত আমার মনে এক, আর মুখে অন্য কথা নাই।

যথা বা—

কোন সখী নির্জনে অন্য সখীকে বললে—হে বরাঙ্গি! আমি সকল দেবতার পায়ে মাথা রেখে শুধু এই বর প্রার্থনা করি যে, সুবলসখা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে যেন আমি সর্বদা সেবা দ্বারা আনন্দ দান করতে পারি। তা হলেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

পূর্বে যে সব সখীর কথা উল্লেখ করা হলো, তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহাধিকা। তেমনি আমার সখী-স্নেহাধিকা বান্ধবীও আছে।

সখীস্নেহাধিকা

যে সখী নিজেকে নায়িকার আপনজন মনে ক'রে সর্বদা তার প্রতি স্নেহশীলা হয়, এবং কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রতি অধিক স্নেহবিশিষ্টা হয়, তাকে সখীস্নেহাধিকা বলে। ৫৮।

যথা—

শ্রীমতীর কোন প্রখরা প্রাণসখী বৃন্দাকে বলেছিল—হে সহচরি! তোমার দূত্য-চাতুর্য রাখো। যাও, তুমি গোষ্ঠরাজতনয় শ্রীকৃষ্ণকে গিয়ে বলো যে, এই ঘোর বর্ষা রাত্রি—চারিদিকে বিষম বিষধর সর্প, কেমন করে ভীরুস্বভাবা শ্রীরাধাকে গিরিকুঞ্জে পাঠাবো। ৫৯।

'বৃন্দে দূর কর দূতীক কাজে। নেওটি কহ তুহু নাগর রাজে॥
ইহ দেখ বরিষ আঁধিয়ার রাতি। পথ মাঝে কত কত ভুজগিনী পাঁতি॥
নাহি সহই ভয় রাই আমার। আজু নিশি নাহি করাব অভিসার॥'

এ ধরণের উক্তি সমস্নেহা সখীর পক্ষেও সম্ভব।

শ্রীমতীর কোন এক বান্ধবী তার নবীনা সখীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল—সখি, তুমি শ্রীরাধার সঙ্গে সখ্য কর। তবে যদি একথা

মনে করে থাকো যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-প্রমোদ লাভের জন্য রাধার সঙ্গে সখ্য করবে, তাহলে ভুল করবে। শ্রীরাধার সঙ্গে যদি তোমার প্রণয় সিদ্ধ হয়, তাহলে কৃষ্ণের প্রীতিসম্পদ আপনা-আপনিই তোমার উপর বর্ষিত হবে। কাজেই সখ্য করতে হলে, রাধার সঙ্গে সেই ভাবে সখ্য করাই ভালো, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

পূর্বে যাদের প্রাণসখী ও নিত্যসখী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, মনীষিগণ তাদেরই সখীস্নেহাধিকা বলে অভিহিত করেছেন।

সমস্নেহা

যে সব সখী কৃষ্ণ ও প্রিয়সখীর প্রতি সমান স্নেহ বহন করেন, কারো প্রতি কম বা বেশী স্নেহ যাদের কখনো দেখা যায় না, তারাই 'সমস্নেহা'। ৬০।

যথা—

কৃষ্ণ বিনা রাধা আমার মনকে অতিশয় ব্যথিত করে। আহা! রাধাবিহীন কৃষ্ণও আমার অন্তরকে তেমনি নিপীড়িত করে। এক সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের মুখচন্দ্রিমা যে জন্মে আমার নয়নযুগলকে আনন্দ দান না করবে, তেমন জন্ম যেন আমার না হয়। ৬১।

শ্রীরাধা মান করলে, চম্পকলতাকে বকুলমালা বলেছিল :

'নাগর না দেখি রাধিকাসুন্দরী কাতর হইয়া রহে।
রাধারে না দেখি নাগর কাতর, আমার পরাণ দহে॥
তপস্যা করিঞা জনম লইব কামনা করিব তাই।
নাগর নাগরী একাসনে যেন সতত দেখিতে পাই॥'

যে সকল সখী রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি তুল্য প্রেম অন্তরে বহন করে, নিজেদের শ্রীরাধিকার 'অতি আপনজন' ব'লে উচ্চ অভিমান গর্ব বোধ করে, তাদেরই পরমশ্রেষ্ঠসখী অথবা প্রিয়সখী বা নিত্যসখী বলা হয়। ৬২।

হরিবল্লভা প্রকরণ

উল্লিখিত ব্রজসুন্দরীদের চারটি প্রকারভেদ হয়। যেমন—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ। পূর্বে প্রসঙ্গতঃ সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থা গোপিনীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ এই দু'রকমের গোপিনী চরিত্র অত্যন্ত রসপ্রদ। তার মধ্যে স্বপক্ষের সম্বন্ধে পূর্বে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এখন সুহৃৎপক্ষ গোপাঙ্গনাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হচ্ছে। ১।

সুহৃৎপক্ষ

সুহৃৎপক্ষ দু'রকমের হয়—ইষ্টসাধক ও অনিষ্টসাধক। ২।

ইষ্টসাধক

কুন্দবল্লী শ্যামলাকে বললে—

সখি! তুমি ও তোমার পরিজনবর্গ সকলে মিলে আমার কথা শোন। তোমার প্রতি শ্রীরাধার যে প্রীতি দেখতে পাই, তাতে জগজ্জনের চিত্ত বিমোহিত হয়। শ্রীমতী উল্লাসভরে অঙ্গরাগ প্রস্তুত ক'রে, তোমার নাম ক'রে তোমারই সখীর হাত দিয়ে ঠিক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠান। এই সব দেখে বেশ বোঝা যায় যে, তোমার প্রতি শ্রীরাধার প্রীতি অতিশয় গভীর। ৩।

অনিষ্টসাধক

ভাণ্ডীর বটমূলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধাকে ক্রীড়া করতে দেখে এসে, পদ্মা জটিলাকে বললে—তোমাদের বধূর চরিত্র দেখ গিয়ে। সে ভাণ্ডীরমূলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লালাখেলা করছে। একথা শুনে জটিলা কুপিতা হয়ে ভাণ্ডীর অভিমুখে ছুটে গেল।

এখানে পদ্মা অনিষ্টসাধিকা।

শ্যামলা এসে ছল ক'রে জটিলাকে নিবৃত্ত ক'রে বললে—শ্রীরাধা নয়, কৃষ্ণের সখা সুবল বধূ বেশ ধ'রে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে।

জটিলা প্রসন্ন হয়ে বললে—আমি অনভিজ্ঞা মূর্খের কথায় ভুল ধারণা করেছিলাম। এখন তোমার কথায় সঠিক জানলাম যে, ওই বধূ শ্রীরাধা নয়; কৃষ্ণ বধূবেশধারী সুবলের সঙ্গে হাসি-খেলা করছেন। ৪।

এখানে শ্যামলা ইষ্টসাধিকা।

তটস্থ

যে বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষ তাকে তটস্থ বলা হয়। ৫।

যথা—

পদ্মা চন্দ্রাবলীর পক্ষ, শ্যামা শ্রীরাধার পক্ষ। চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা পরস্পর বিপক্ষ। সুতরাং শ্যামা চন্দ্রাবলীর বিপক্ষের সুহৃৎ পক্ষ অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর বিপক্ষা শ্রীরাধার বান্ধবী। এ ক্ষেত্রে চন্দ্রাবলী সম্পর্কে শ্যামা তটস্থা। চন্দ্রাবলীর দোষকে সে উদ্‌ঘাটিত করে, গুণের কথা কখনো বলে না।

'চন্দ্রাবলীর দুঃখ দেখি শ্যামা নাহি হয় দুঃখী। সুখ দেখি সুখ নাহি পায়।
দোষে নাহি দোষ ধরে, গুণ শুনি মৌন করে। শ্যামার মন বুঝন না যায়॥'

চন্দ্রাবলীর দোষ থাকাটা দোষের নয়, অর্থাৎ দোষ থাকাই তার স্বাভাবিক। গুণের কথা বলবার কিছু নাই। চন্দ্রাবলী সম্পর্কে শ্যামার মনোভাব বোঝা যায় না।

বিপক্ষ

যারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষসম্পন্ন, পরস্পরের ইষ্ট হানি করে এবং অনিষ্টকারক, তাদেরই পরস্পরের বিপক্ষ বলা হয়। ৬।

ইষ্টবিনষ্টকারিত্ব

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে মুকুন্দ! আজ সুবল গিয়ে শ্রীরাধাকে বলেছিল যে, তুমি কুঞ্জগৃহে তার আগমন পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিলে। কুটিলবুদ্ধি পদ্মা হঠাৎ এই কথা জানতে পেরে,

সেখানে চন্দ্রাবলীকে নিয়ে গিয়েছিল। সুবলের মুখে এই কথা শুনে, শ্রীমতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গে নীলপট্ট শাড়ি দেখে, প্রাতঃকালে জটিলা তাঁকে তর্জন করেছে। ৭।

অনিষ্টকারিত্ব

জটিলা ও পদ্মার উক্তি-প্রত্যুক্তি :

'এসো এসো পদ্মা, এস মঝু ভবনে। আওলু যাই গো প্রণাম চরণে॥
আওলি কোন পথে কোন ঘর হৈতে। গোবর্ধন বট হতে আওলু তুরিতে॥
মোর বধু দেখলি তুহু নিজ নয়নে। তাহে দেখলু হাম দিনকর ভবনে॥ (১)
চিরকাল (২) হলো কেন না আইল সদনে। তাহে হরি ঘেরল দারুণ গহনে॥
হরি বড় চঞ্চল সেহ বর যুবতী। শুনি এই জাটিলা ধাওল ঝটিতি॥'

বিপক্ষ পক্ষপাতিনী বা প্রতিপক্ষ

বিপক্ষ-পক্ষপাতিনী বা প্রতিপক্ষ সখীদের কথায় ও কাজে ছল, ঈর্ষা, চপলতা, অসূয়া, মাৎসর্য, অমর্ষ (অধৈর্য) ও গর্ব ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

ছদ্ম বা ছল

মণিমঞ্জরীর প্রতি ভানুমতীর উক্তি :

'গিরিধর উপরি বাঁশ বিটপী সব ধ্বনি করু গুরুতর বায়।
সহজহি বরিষ সময় নবজলধর আসি উদয় ভেল তায়॥
তাহা দেখি মুগধ ধেনুসব ধাওয়ি কানু ভরম বিপরীত।
ধিক্ ধিক্ চাতুরী নারি তুহু ধাওলি জ্ঞানরহিত তুয়া চিত॥
ঐছন চাতুরী বচন রচন করি পদ্মা গোপীরে শুনায়।
ললিতা সত্বর নিজ গৃহে পৈঠল তুরিত হি রায় সাজায়॥'

গিরি গোবর্ধনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হচ্ছে শুনে চন্দ্রাবলী যাতে ক্ষিপ্রগতি সেখানে গিয়ে উপস্থিত না হয়, সেজন্য ললিতা প্রতারণা ক'রে পদ্মাকে বলেছিল যে, বাঁশবনে বাতাসের ঝাপটায় বাঁশীর মত

(১) সূর্য মন্দির। (২) এত কাল, এত বিলম্ব।

শব্দ হচ্ছে, বর্ষাকাল তাই আকাশে মেঘ উঠেছে। ধেনুগণ বংশীধ্বনি শুনে ও নবজলধর দেখে ছুটে যাচ্ছে। তারা পশু, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কিন্তু তুমি কেন বুদ্ধিমতী হয়ে ছুটে চলেছ!

ললিতা এইভাবে ছলনা ক'রে চন্দ্রাবলীর অভিসার নিবারিত ক'রেছিল এবং তখনই গৃহে গিয়ে তাড়াতাড়ি শ্রীরাধাকে অভিসারের জন্য সাজাতে বসেছিল। ৮।

ঈর্ষা

পদ্মা তার কেশপাশ উদ্‌ঘাটিত ক'রে, বনমালা দেখিয়ে সৌভাগ্য জানাচ্ছিল। তাই দেখে, ললিতা বললে—দেবি! তুমি তোমার কেশকলাপ উন্মোচন ক'রে আমায় বনমালা কি দেখাচ্ছো? এসে দেখ, আমার অলিন্দে নীলযষ্টির মত স্তব্ধ হয়ে বনমালী নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন। ৯।

পদ্মার কেশপাশে বনমালা দেখে, ললিতার মনে ঈর্ষা সঞ্চারিত হয়েছিল। তার ফলে, নিজের সৌভাগ্য যে পদ্মার চেয়েও অনেক বেশী, এই কথা জানাবার জন্য ললিতা বললেন,—তুমি কৃষ্ণের কাছে বনমালা পেয়েছ ব'লে গর্ব করছো। কিন্তু বনমালী স্বয়ং আমার দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন।

অসূয়াগর্ভ ঈর্ষা

পদ্মা শ্রীরাধার পক্ষপাতিনী কোন সখীর হাতে কৃষ্ণপ্রদত্ত মণিহার দেখে বলেছিল—এ হার তুমি কোথায় পেলে? শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এটা আমায় দিয়েছিলেন। কিন্তু এর নায়কমণির (লকেটের) অনেক দোষ আছে, সেইজন্য আমি এটা গ্রহণ করিনি। কিন্তু লুব্ধ হয়ে তুমি সেটা নিয়েছ। যদি নিজের মঙ্গল চাও, অসৌভাগ্যকর এই হার ফেলে দাও। নইলে সমূহ অমঙ্গল হবে। আঙুলে সাপে কামড়ালে, মানুষ বাঁচবার জন্য আঙুল কেটেও ফেলে দেয়। ১০।

চাপল্য

খদ্যোতিকার প্রতি পদ্মার উক্তি :

'গহননিকুঞ্জ মাঝে ভেটিল নাগর রাজে, তুমি কেন আছহ বসিয়া।
সংকেত করেছে মোরে সে হেন নাগরবরে চন্দ্রাবলী মিলিবে আসিয়া॥'

হে খদ্যোতিকে! তুমি কেন মিছে এই কুঞ্জবনে রাগসঞ্জিত রূপলাবণ্য দেখিয়ে নিজের আত্মাকে দুঃখ দিচ্ছ? আজ শৈলশিখরে নবজলধরের বুকে বিদ্যুৎ-লেখার মত চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুতরাং আজ আর তোমার মনোরথ সফল হবে না। ১১।

খদ্যোতিকা শ্রীরাধার বান্ধবী। নিকুঞ্জ মধ্যে তাকে দেখে, চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার মনে অসূয়ার সঞ্চার হলো। তাই সে খদ্যোতিকাকে আঘাত দিয়ে এ কথা বললে।

অসূয়া

শ্রীমতীর সখী রঙ্গদেবী পদ্মাকে বললে—তোমার সহচরী শৈব্যা ভাণ্ডীর তরুমূলে যে তাণ্ডব নৃত্য করছিল, তা দেখে কে না বিস্মিত হয়েছে! তাও যদি সেই সুন্দরী তন্বী তোমার কাছে নাচ শিখতো! তাহলে তার নয়নভঙ্গিমায় ত্রিভুবন বিমোহিত হতো। ১২।

শ্রীরাধার পক্ষপাতিনী রঙ্গদেবী পদ্মার সখী শৈব্যার নৃত্য দেখে, অসূয়া পরবশ হয়ে, পদ্মার নিকট তার বান্ধবী সম্বন্ধে এই টিপ্পনী কেটেছিল এবং পদ্মার নৃত্যকলা পারদর্শিতা সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছিল।

মৎসর বা মাৎসর্য (Jealousy)

মৎসর বা মাৎসর্য বলতে বুঝায়, পরের ভালো দেখতে না পারা। অর্থাৎ অপরের যোগ্যতা বা গুণাবলী সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠা।

পদ্মা চন্দ্রাবলীকে বললে—সুন্দরি! ধূর্ত মুরারি শ্রীরাধার হৃদয় অলঙ্কৃত করেছেন মহামূল্য কণ্ঠহার দিয়ে, আর তোমার কবরীতে দিয়েছেন কপর্দক মূল্যের তুচ্ছ একটা মালা। তোমার মন যে দেখছি

মুনি-ঋষিদের মত বিকারহীন। এই ধরণের বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা সত্ত্বেও তুমি সেই মুরারির সঙ্গে বনবিহারে বিরত হ'চ্ছ না।

অমর্ষ বা অসহিষ্ণুতা

অক্ষমা বা অধৈর্যজনিত ক্রোধকে (Indignation due to intolerance) অমর্ষ বলে।

পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলীর উক্তি :

'অল্প স্ফুট কুটমলে তাথে গাঁথি গুঞ্জাফুলে কুণ্ডল নাগরে দিলাম আমি।
সে কুণ্ডল রাধার কানে দেখি ক্রোধ করি মনে, বিষাদ করিলে কেন তুমি ॥'

তুমি কেন রাধার কর্ণে সে কুণ্ডল দেখে, মনোবেদনা প্রকাশ করলে ? তাতে যে আমাদেরই লঘুতা প্রকাশ পেল। ১৩।

অমর্ষে প্রেম-ঈর্ষা জাগে কৃষ্ণসখীর চিত্ত তলে।
অকপটে মনের কথা অতর্কে সে আপনি বলে ॥

—হংসদূত

গর্ব (Conceit)

অন্যকে ছোট মনে ক'রে অবহেলার ভাব প্রকাশ করার নাম 'গর্ব'। গর্বকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মদ, ঔদ্ধত্য।

অহঙ্কার (Pride)

স্বপক্ষের গুণ বর্ণনার জন্য অপর পক্ষের প্রতি যে আক্ষেপ, তাকেই অহঙ্কার বলে। ১৪।

যথা—

চন্দ্রাবলীর সভায় একদিন ললিতা গেলে, পদ্মা তাকে বলেছিল —সখি! ইন্দ্রনীল বর্ণের আকাশে সোমাভাই (চন্দ্রের আভা অর্থাৎ চন্দ্রাবলী) বেশি শোভা পায়।

এই কথা শুনে, অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ক'রে ললিতা অহঙ্কারের সঙ্গে

বলেছিল—সখী পদ্মা! সুনীল আকাশে নেত্র-অন্ধকার-নাশিনী সূর্যপ্রভার বরেণ্য দীপ্তি যতক্ষণ প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণই চন্দ্রের আভা শোভা পায়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে ততক্ষণই চন্দ্রাবলী শোভা পায়, যতক্ষণ শ্রীরাধার আবির্ভাব না হয়।

'কৃষ্ণে চন্দ্রাবলী যে তাবত শোভা করে।
যাবত রাধিকা নাহি রহে তার ক্রোড়ে॥'

—শচীনন্দন

অভিমান (Vanity)

ভঙ্গিমা সহকারে স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষ বর্ণনা করাকে 'অভিমান' বলে।১৫।

কৃষ্ণের প্রতি স্বপক্ষের প্রেমাখ্যান। ১৬। যথা—

ললিতা চন্দ্রাবলীকে বলেছিল—সুন্দরি! তুমি দেখছি খুব ধীরবুদ্ধি সম্পন্না। কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হতে কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছিলেন একথা তুমি কেমন নিস্পন্দ হৃদয়ে গল্প ক'রে বলতে পারছো। কিন্তু আমার বান্ধবী তরলপ্রকৃতি শ্রীরাধা সে প্রসঙ্গে শুধুমাত্র কদম্ব বৃক্ষের নাম উচ্চারিত হলেই, বুকে করাঘাত ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করেন। ১৭।

ললিতার এই উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলীর যে প্রেম, তার চেয়ে শ্রীরাধার প্রেম অনেক বেশী গভীর। শ্রীকৃষ্ণের কোনো বিপজ্জনক অবস্থার কথা মনে হলেই, শ্রীমতী অধীর হয়ে ওঠেন; কিন্তু চন্দ্রাবলীর হৃদয় স্থির থাকে। সুতরাং চন্দ্রাবলীর তুলনায় শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ অনেক বেশী।

স্বপক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমাখ্যান। ১৮। যথা—

ললিতার সখা রত্নমালা পদ্মাকে বললে—তুমি ধন্য! তোমার ললাটে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পত্রবল্লী (তিলক চিত্র) এঁকে দিয়েছেন। তাই মদনমদে তোমার অঙ্গের গতি অতিমন্থর হয়েছে। হায়! আমরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা। অখিলশিল্পধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণে

ললিতার মুখচন্দ্রের পানে চেয়ে সব ভুলে যান। তাই আমাদের অদৃষ্টে পত্রবল্লী জোটে না।

এই উদাহরণে ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোৎকর্ষের কথা উল্লেখ করে রত্নমালা অভিমান (Vanity) প্রকাশ কর্‌ছে।

দর্প (Elation)

আপন সৌভাগ্য বা রতিবিহারের উৎকর্ষের জন্য নায়িকার মনে যে গর্ব, তাকেই দর্প বলে। ১৯। যথা—

পদ্মার প্রতি ললিতার উক্তি :

'তুমি বড় পুণ্যবতী জানি কুলবতী সতী সদা থাক প্রাসাদ উপরে।
শারদ চান্দিনী রাতি তাথে দিব্য শয্যা পাতি নিদ্রা যাও বরিষ অন্তরে॥
যবে মোরা সজ্জা ক'রে শয়ন করি কন্দরে, তবে হয় দৈব বিড়ম্বন।
এক শ্যাম হস্তী আসি জাগায় সকল নিশি, সবাকারে করে উন্মাদন॥'

এখানে ললিতার বক্তব্য এই যে, জ্যোৎস্না-পুলকিত শারদ নিশীথে পদ্মা প্রাসাদে শয্যা রচনা ক'রে সুখে নিদ্রা যায়। কিন্তু তাদের সারাটি রাত্রি বৃন্দাবনের গিরিকন্দরে কৃষ্ণের সঙ্গে রতিবিহারে অতিবাহিত হয়। পদ্মার নিকট নিজেদের রতিবিহার-সৌভাগ্যের গর্ব প্রকাশে প্রকারান্তরে ললিতার দর্পই প্রকাশ পায়।

উদ্ধসিত (Taunt)

বিপক্ষের প্রতি নায়িকা প্রকাশ্যভাবে যে উপহাস বা বিদ্রূপ করে, তাকে উদ্ধসিত বলে। ২০।

যথা—

পদ্মার প্রতি বিশাখার উক্তি :

'বিষাদ না কর মনে নিশ্বাস ছাড়হ কেনে কৃষ্ণ প্রতি ছাড়হ আগ্রহ।
তোমারে মলিন দেখি আমি মনে বড় দুখী, বিনয় বচন কেন কহ॥
ললিতার প্রেমডোরে বেঁধেছে নায়কবরে, হইয়াছে আত্মবিস্মরণ।
তিলেক ছাড়িতে নারে কি ক'রে শুনাবে তারে ফিরি যাহ আপন ভবন॥'

সখি! দীর্ঘশ্বাস ফেলো না, বিষাদ ত্যাগ ক'রে প্রসন্না হও। দুর্লভ বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ ত্যাগ কর। তোমার ম্লানমুখ দেখে আমার মনে করুণার উদয় হচ্ছে। দেখ, ললিতার প্রণয়জালে বারবার আবদ্ধ হয়ে, কৃষ্ণকুরঙ্গ আত্ম-বিস্মৃত হয়েছেন। অন্যের কথা মনে করবার অবকাশ তাঁর কোথায়?

মদ (Boast)

সেবার উৎকর্ষ জনিত যে গর্ব তাকে মদ বলে।

ললিতার প্রতি পদ্মার উক্তি:

সখি ললিতা! পৃথিবীতে তোমরাই ধন্য। কেন না, এইসব অদ্ভুত সুগন্ধি পুষ্প দিয়ে তোমরা সব সময় সূর্যের উপাসনা কর। কিন্তু আমাদের এমনই অদৃষ্ট যে, সব ফুলই কৃষ্ণের জন্য বনমালা গাঁথতে ফুরিয়ে যায়। এমন কি, কাত্যায়নীর পূজার জন্যও একটি পাপড়ি থাকে না।

এখানে পদ্মা তাদের কৃষ্ণ-সেবার উৎকর্ষ ও গৌরব জানিয়ে গর্ব বোধ করছে।

ঔদ্ধত্য (Arrogance)

সুস্পষ্টভাবে নিজের উৎকর্ষ জানিয়ে যে গর্ব প্রকাশ করা হয় তাকেই ঔদ্ধত্য বলে। ২১।

ললিতা গর্বের সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় পদ্মাকে বলেছিল—হায়! এই ব্রজমণ্ডলে এমন কে আছে, যার কাছে কীর্তিধ্বজাশালিনী শ্রীরাধা স্পর্ধা দেখাবেন? সৎকুলোদ্ভবা দীনহীনা নারীদের প্রতি কৃপায় তাঁর চিত্ত বিগলিত হয়, তাই তিনি মাঝে মাঝে কৃষ্ণকে ছেড়ে দেন; যাতে কামসিক্তচিত্তা রমণীরা তাঁর সেবার ক্ষণিক সুযোগ পায়।

শ্লেষ (Scoff)

যে সব মৌখিক বা বাহ্যিক প্রশংসার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থে নিন্দার ইঙ্গিত থাকে, তাকে শ্লেষ বলে। ২২।

সভামধ্যে সখীদের রূপগুণ ও প্রেম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন চন্দ্রাবলীর সখী ভব্যাকে চম্পকলতা বললে—তোমার সৌদামিনী সখীর সৌভাগ্যের অন্ত নাই। তার প্রদত্ত সুন্দর হার ও ভূষণাদি শ্রীকৃষ্ণ সবই তাকে ফিরিয়ে দেন। তবুও তার মনে দুঃখ হয় না। সে দক্ষা ও বিদগ্ধা নারী; বার বার নিজের যৌবন ভরা দেহকান্তি প্রদর্শন করে।

বস্তুতঃ ভব্যার শিল্পরুচি নেই। লৌহমুদ্গরের মত তার কান্তি। কিন্তু চম্পকলতা এখানে বিপরীত লক্ষণা দ্বারা প্রশংসাচ্ছলে তার নিন্দা করছে। ২৩।

নিন্দা দু'রকমের—প্রেম সম্বন্ধীয় ও গুণ সম্বন্ধীয়। পূর্বোক্ত নিন্দাটি প্রেম-সম্বন্ধীয়।

গুণ সম্বন্ধীয় নিন্দা : যথা—

শৈব্যাকে রঙ্গদেবী বললে—সুন্দরি! এই কুঞ্জগৃহে তোমার খেলাবতী সখী অস্খলিত রসের সঙ্গে যে নৃত্য করেছে, তা দেখে সকলেই খুব আনন্দ পেয়েছে। তার নাচের এমন কৌশল যে, অঙ্গ নৃত্যচঞ্চল হলেও, গলার হার একটুও দোলে নি। প্রাণচঞ্চল অঙ্গের কান্তি যেন হরিতালের দ্যুতিকেও পরাজিত করে।

এখানে বিপরীত লক্ষণা দ্বারা শৈব্যার খেলাবতী সখীর নিন্দা করা হয়েছে। বস্তুতঃ নৃত্যের অভীপ্সিত রসকে নিরাশ ক'রে সে তার দেহচাঞ্চল্যই প্রকাশ করেছে। ২৪।

যে সব ব্রজসুন্দরী যূথেশ্বরী পদবাচ্যা, তাঁরা ধৈর্য এবং গাম্ভীর্য গুণ বজায় রাখবার জন্য, নিজেরা কখনো বিপক্ষা নায়িকার ঈর্ষা বা নিন্দা করেন না।

যথা—

পৌর্ণমাসীর প্রতি বৃন্দা :

'বিপক্ষ রমণী যব আওল সদনে। কত হি গরব করু চঞ্চল বচনে॥
মঙ্গলা ঐছন হেরল যব হি। হা মনে বিনয় বচনে কহে তব হি॥
সো নিজ গরব লাজে আধোবদনে। লঘু লঘু যাওল আপকি সদনে॥'

সখীগণ প্রখরা হলেও বিপক্ষা যূথেশ্বরীদের সামনে প্রায়ই কোনো ঈর্ষাসূচক কথা বলে না। ২৫।

পদ্মা ক্রোধভরে নিন্দাকারিণী চম্পকলতাকে বলেছিল—তোমার ভাগ্য ভালো, তাই আমার বাক্যপাশ থেকে মুক্তি পেলে। যমুনা তীরে শ্রীরাধা আছেন, কাজেই তাঁর সামনে আমার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্তু এ কথা জেনে রাখ যে, আমার বাক্‌চাতুর্যে স্বয়ং বাগেদবীও লজ্জা পান। তুমি কোন ছাড়! ২৬।

ব্রজসুন্দরীরা সকলে কৃষ্ণের প্রিয়া, সুতরাং তাদের সম্পর্কে কোন প্রকার বিদ্বেষ বা ঈর্ষা থাকা উচিত নয়। কিন্তু রসশাস্ত্র মতে পৃথিবীতে একথা রসিকজনোচিত নয়। ২৭।

কেন না—

'কোটি কাম জিনি কৃষ্ণের সৌন্দর্য অপার।
মূর্ত প্রিয় নর্মসখা শৃঙ্গার যাহার॥
সেই ত শৃঙ্গার ব্রজে 'উজ্জ্বল' নাম ধরে।
তার সঙ্গে আছে ঈর্ষা আদি পরিবারে॥'

শৃঙ্গার রস শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্মসখা রূপে ব্রজে মূর্ত হয়ে বিরাজ করে। দ্বেষ ও ঈর্ষা (Jealousy) দ্বারা সেই শৃঙ্গার রসের উৎকর্ষ এবং স্নেহের বা প্রেমের নিবিড়ত্ব সাধিত হয়। সেই জন্য মিলন বিষয়ে রাগদ্বেষ বা ঈর্ষার প্রয়োজন। বিরহে রাগদ্বেষ বা নায়িকাদের পারস্পরিক ঈর্ষা থাকে না। ২৮।

যথা—

কৃষ্ণপ্রেমে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার বিপক্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু মাথুর বিরহে শ্রীমতী খেদান্বিতা হয়ে বলেছেন—

'প্রিয় সখী চন্দ্রাবলী তোরে পুণ্যবতী বলি করেছিলে কৃষ্ণ আলিঙ্গন।
আমি ত ব্যাকুলা হৈয়া বেড়াই তারে অন্বেষিয়া বহুদিন পাইনা দরশন॥

অনাথিনী করি মোরে হরি রৈলা মধুপুরে না দেখে পরাণ ফেটে যায়।
কারে কব এই কথা কে জানে মনের ব্যথা তেই কিছু কহিব তোমায়॥
তোমার যে ভুজদ্বন্দ্ব আছে কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ সেই ভুজ মোর কণ্ঠে ধর।
সেই গন্ধ অঙ্গে দিয়া মোর হিয়া জুড়াইয়া খানিক জীবনদান কর॥'

—ললিত মাধব

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংযোগ কালে পরস্পর বিপক্ষা হলেও, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পর, শ্রীমতী ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে স্নেহভাব সঞ্চারিত হয়েছে। ২৯।

সব দিক দিয়ে যূথেশ্বরীদের মনে এক-জাতীয় ভাব থাকলে, তাদের 'স্বপক্ষ' বলে। যদি ঈষৎ বৈলক্ষণ্য থাকে, অথচ পরস্পরের মনোভাবে বিরোধিতা না থাকে, তাদের 'সুহৃৎপক্ষ' বলা যায়। আর যদি ভাবের সমতা অতি অল্প হয়, এবং পার্থক্য অধিক হয়, তা'হলে ওই ভাবকে 'তটস্থ' বলা যায়। যেখানে সর্ববিষয়ে বৈজাত্য ঘটে, সেখানে তাদের 'বিপক্ষ' বা 'প্রতিপক্ষ' বলা হয়। ৩০।

পরস্পরের ভাব বিজাতীয় হলে, পরস্পরের পক্ষে রুচিকর হয় না। সেই অরুচিকর ভাব থেকে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও অক্ষান্তির সঞ্চার হয়। তাই থেকে ঈর্ষা জন্মায়। ৩১।

'পদ্মাবতী চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের যোগ্যা হয়।
রাধিকারগণে কেহ ইহা নাহি সয়॥
হরিতে সমান প্রেম হয় যাহাকার।
স্বপক্ষ বিপক্ষ ভেদ জানিহ তাহার॥'

শুদ্ধা, বিদগ্ধা, পটীয়সী ও উল্লাসবতী চন্দ্রাবলীও শ্রীকৃষ্ণের আশা পূর্ণ করতে সমর্থা। সেইজন্য এই সব নায়িকার সঙ্গে শ্রীমতীদের 'স্বপক্ষ' 'বিপক্ষ' ভেদ ঘটে। দয়িতের সঙ্গে অপর কোনো নায়িকার প্রেমের যোগ্যতা পৃথিবীতে কে সহ্য করতে পারে? ।৩২।

চন্দ্রাবলীর ভাব যেমন রাধার পক্ষে প্রীতিকর নয়, তেমনি রাধার ভাবও চন্দ্রাবলীর পক্ষে রুচিকর নয়।

কোন এক সখী প্রসঙ্গতঃ শ্রীরাধার চরিত্র বর্ণনা করছিল; তাই শুনে চন্দ্রাবলী অসহিষ্ণু হয়ে তাকে তিরস্কার ক'রে বললে—'রাধার নাম তো দূরের কথা, তুমি অনুরাধা নক্ষত্রের নামও আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। তার দুর্বিনীত ব্যবহারে শান্ত মুনিজনের মনও কুপিত হয়। ধিক্! মুনিগণের শিরোভূষণ ও ব্রজবাসিগণের পূজ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই মাধব তার চরণে পতিত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর প্রতি রাধা দৃক্পাত করে নি। ৩৩।

যেখানে অন্যের ভাব নিজ ভাবের প্রায় তুল্য হয়, সেখানে নায়িকারা পরস্পরের পক্ষ। এই পক্ষই পরস্পরের মিত্র হয়, বিদ্বেষেরও উপযুক্ত পাত্র। ৩৪।

'শ্রীরাধার প্রেম যেন অমৃতের সিন্ধু।
আর কোন গোপিকাতে নাহি তার বিন্দু॥
তবে যেই বিপক্ষতা করি এ গণন।
রসের পুষ্টতা লাগি কহে কবিগণ॥'

শ্রীরাধার যে প্রেমাদি গুণসম্পদ আছে, অন্য কোনো নায়িকার বা ব্রজাঙ্গনার মধ্যে তার শতাংশের একাংশও নাই। কিন্তু রসের পুষ্টির জন্য পরস্পরের গুণসম্পদে সমতা আরোপিত হয় ও বিপক্ষাদি ভেদাভেদ সৃষ্ট হয়। ৩৫।

যূথেশ্বরীদের মধ্যে পরস্পরের ভাব সর্বপ্রকারেই একজাতীয়; তবে তুলনামূলক ভাবে তাদের সমান প্রমাণ করা কঠিন। ৩৬।

দুজন যূথেশ্বরীর মধ্যে হয়তো কখনো কথঞ্চিৎ সৌহার্দ্য হতে পারে। তবুও রসের বা প্রেমের স্বভাবধর্ম বশতঃ উভয়ের ভিতর বিপক্ষতা ঘটে। ৩৭।

ইতি হরিবল্লভা প্রকরণ।

উদ্দীপন প্রকরণ

যার সন্নিবেশে রসের উৎপত্তি হয়, বা বিদগ্ধ প্রেম সঞ্চারিত হয়, তাকে বিভাব বলে। এই বিভাবের ভিতরেই থাকে উদ্দীপনা। ১।

'উদ্দীপন' বা উদ্দীপনা ভাবকে (রতিভাব থেকে মহাভাব পর্যন্ত) প্রকাশিত করে। 'উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।' যেমন—শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, স্মিত, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও বাসরাদি। —ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়াগণের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, তটস্থ অর্থাৎ উদাসীন বা অস্থায়ী প্রভৃতি ভাবগুলিকে উদ্দীপন-বিভাব বলা হয়।

গুণ

কায়মনোবাক্যবিভেদে গুণ সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা-মানসিক, বাচিক ও কায়িক।

মানসিক

কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা ও করুণা প্রভৃতি গুণ মানসিক। ২।

যথা—

শ্রীরাধার কোন এক সেবাপরায়ণা অসমস্নেহা সখী তার সম-পর্যায়ের অপর এক সখীকে বলেছিল—'কৃষ্ণের আশ্চর্য গুণাবলীর কথা আর কি বলবো! তিনি অতি অল্প সেবাতেই সন্তুষ্ট হন। গুরুতর অপরাধ করলেও তিনি রুষ্ট হন না, তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পরের দুঃখ দেখলে তাঁর অন্তর কাতর হয়ে ওঠে। তাই সখি, তাঁকে দেখলেই আমার মন তৃষাতুর হয়ে ওঠে।'

'অলপহি সেবনে হোয়ত বশ। বহুতর অপরাধে বচন সরস॥
পরদুঃখ দেখি কত হোয়ত কাতর। হরিগুণে মঝু মনে সুখ বহুতর॥'

বাচিক

যে সব কথা কানে শুনে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, তাকে বাচিক গুণ বলে। ৩।

যথা—

বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি :

'কানুর মধুর বাক্য মোর শ্রুতি হরে।
রসাল বচন মোর লেগেছে অন্তরে।'

শ্রীমতী লতামণ্ডপের অন্তরালে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবুও শ্রীকৃষ্ণকে দেখছিলেন না। তাই দেখে, বিশাখা জিজ্ঞেস করেছিল—সখি, লতামণ্ডপের আড়ালে থেকেও তুমি কান্তকে দেখছো না কেন?

উত্তরে শ্রীমতী বলেছিলেন—সখি, মাধব সুবল সখার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি তাঁর সেই কথাগুলি শুনবার জন্য আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁর বাক্য এত মধুর যে, সেই বাক্য শুনে যেন কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা মিটছে না। আমি এই আড়ালে থেকে তাঁর সেই মধুর বচনাবলী শুনবো।

কায়িক

বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, অভিরূপতা বা মনোহারিত্ব, মাধুর্য ও মৃদুতা ইত্যাদিকে কায়িক গুণ বলে। ৪

বয়স

মধুর রসে বয়স চার রকমের হয়। যথা—বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্ত বয়স ও পূর্ণ বয়স। বয়সাদি যে-সব গুণ প্রেয়সীদের মধ্যে বিদ্যমান, সেইসব গুণ শ্রীকৃষ্ণেরও আছে। তারই কিছু কিছু আলোচনা করা হ'চ্ছে। ৫।

বয়ঃসন্ধি

'বাল্য যায়, যৌবনের প্রথম সন্ধান।
কবিগণ কহে তার 'বয়ঃসন্ধি' নাম ॥' ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি, যথা—

'কৃষ্ণের যে রোমাবলী কপিশ বরণ ছাড়ি আচম্বিতে হইল শ্যামল।
যৌবন আরম্ভে দেখ কাম পাঠাইল লেখ তার আখর করে ঝলমল॥
পাইয়া তারুণ্য জল নেত্র দুটি কি চঞ্চল, সফরি হইয়া জলে ফিরে।' ।৭।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য, যথা—

'কামব্যাধ তাহে আল্য অপাঙ্গ সন্ধান কৈল, যুবতী মৃগীর প্রাণ হরে॥' ।৮।

নান্দীমুখী বলেছিল—হে ব্রজমহেন্দ্র! তোমার আঁখিতারকায় ওই যে অনঙ্গ-দেবের সংযোজিত লুব্ধক পঞ্চশর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, তার অব্যর্থ সন্ধানে বৃন্দাবনের কুরঙ্গনয়না ব্রজসুন্দরীদের নেত্র অশ্রুসিক্ত ও ভীতিচঞ্চল হয়ে উঠেছে।৯।

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি।১০।

শ্রীমতীকে দূর থেকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সুবল সখাকে বলেছিলেন—সখা, ওই দেখ, নবযৌবনরাজ শ্রীরাধার অঙ্গরাজ্য অধিকার করেছে। তাই তার উন্নত নিতম্ব গৌরবগর্বে কিঙ্কিনী বাদ্য করে। যৌবনরাজকে উপহার দিবার জন্য বক্ষঃস্থল দুটি সাধু ফল তুলে ধরেছে। ক্ষীণ কটিদেশ পাছে ভেঙ্গে পড়ে, সেই ভয়ে ত্রিবলী বন্ধনের সাহায্য নিয়েছে।১১।

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মাধুর্য, যথা—

'কটাক্ষ ভ্রমরচয়ে তোর নেত্র কুবলয়ে বসতি করিতে সদা মন।
তোমার চিত্ত মরাল লজ্জারূপ মৃণাল ক্ষণে ক্ষণে করে অন্বেষণ॥
তুয়া মুখপঙ্কজে পরিহাস মধু সাজে লুকাইতে নারিছ যতনে।
বুঝিলাম তোর দেহ করিঞা পরম মোহ জানাইল ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥'

বিশাখা শ্রীরাধাকে পরিহাস ক'রে বলেছিল, সুন্দরি! তোমার অপরূপ রূপমাধুর্য বিকশিত হয়েছে। তুমি মাধবের উৎসবপ্রদ অবস্থার সন্ধানে আছো। কিন্তু লজ্জা তোমায় বাধা দিচ্ছে। তাই তোমার চিত্তরূপী হংসশাবক সেই ঈষৎ লজ্জার মৃণাল-খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নব্য বয়স

যে বয়সে স্তন ঈষৎ উদ্ভিন্ন হয়, নয়নে ঈষৎ চঞ্চলতা ও মুখে মৃদুমন্দ হাসি ফুটে ওঠে এবং মনে উড়ু-উড়ু ভাব দেখা দেয়, তাকেই নব্য বয়স বা নব-যৌবন বলে।

যথা—

শ্রীমতীর প্রতি বৃন্দার উক্তি :

'অল্প অল্প তোর স্তন বক্রবক্র ও বচন নেত্র দুটি কিঞ্চিৎ চঞ্চল।
জঘন হৈল ঘন ব্যক্ত হৈল রোমাগণ মধ্য ক্ষীণ করে টলমল॥
তোমার অপূর্ব তনু সুন্দর নাগর কানু তুমি বট সেবাযোগ্য তার।
গোবিন্দ নিকুঞ্জবনে কানুর বিশ্রামস্থানে তুমি সেথা যাহ বারবার॥'

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের বয়োমাধুর্য

প্রৌঢ়া কোন বধূ তাঁর তরুণী ননদিনীকে বললেন—'সুন্দরি! কেন তুমি বারবার শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামবেদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছ? বাতাসে তাঁর অঙ্গগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, তাই কি তুমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছ? ওগো উত্তমা! কিসের জন্যই বা তুমি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছো? দেখলে মনে হয়, নিশ্চয়ই তোমার মনে ভাবের আগুন জ্বলে উঠেছে, তাই তোমার চিত্ত ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তবয়ঃ বা যৌবন

যখন বক্ষঃস্থলে পয়োধরের সুস্পষ্ট উদ্গম হয়, কটিদেশ ক্ষীণ হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বলতায় ঝলমল করে, তখনই জানা যায় যৌবন প্রস্ফুটিত হয়েছে। ১২।

যথা—

ইন্দ্রাবলীর প্রতি নান্দীমুখীর বাক্য :

'চক্রবাক দুই স্তন সফরিণী দুনয়ন বলিত্রয় হইল তরঙ্গ।
শুন ইন্দ্রাবলী সখী তরুনিম জল দেখি ধরিয়াছ সরসের রঙ্গ॥' ১৩

ব্যক্তবয়ঃ বা যৌবন মাধুর্য

শ্রীমতীর প্রতি শ্যামলার উক্তি ঃ

হে হরিণনয়নে! যে সিংহের নখরাঘাতে করিকুম্ভ বিদীর্ণ হওয়ার গজমুক্তার মালা ছিন্ন হয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়িয়ে প'ড়ে কুঞ্জবনের শোভা বর্ধন করে, তুমি কি শৃঙ্গার-রসের সমুদ্রতুল্য সেই মহা-শক্তিশালী পুরুষসিংহকে তোমার নয়ন রজ্জুতে আবদ্ধ ক'রে হৃদয়তটে আকর্ষণ করেছ!

'যে হরির নখকণে বরদন্তীর মুক্তাগণে বিস্তার করেছে বনে বনে।
গহন নিকুঞ্জচারী হেন মহামত্ত হরি তুমি তারে বেন্ধেছ নয়নে॥'

পূর্ণ যৌবন

'নিতম্ব বিপুল হয় মধ্য অতি ক্ষীণ।
উরুযুগ রম্ভা তুল্য স্তনযুগ পীন॥
অঙ্গের অতীব কান্তি পূরিত যৌবনে।
এই ত বয়স পূর্ণা কহে কবিগণে॥'

বৃন্দা বললেন—লীলাবতি! তোমার আঁখিদুটি মীনযুগলের বক্র উল্লাসলহরী হরণ করেছে, মুখচন্দ্রিমার অমেয় সৌন্দর্যে পূর্ণিমার চাঁদও পরাজিত হয়েছে, কুচদুটি কুম্ভের আকার ধারণ করেছে। হে সুন্দরি! পরিপূর্ণ যৌবনে তোমার তনুলতা অপূর্ব শোভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পূর্ণবয়ঃ মাধুর্য

চন্দ্রাবলীকে আশ্বাস দিয়ে পদ্মা বললে—হে প্রিয়সখি! তোমার সৌন্দর্য দেখে, প্রতিপক্ষের কোন যুবতী না ভীতা হয়। তোমার প্রণয় মেঘের বর্ষণে কে না স্তম্ভিত হয়েছে। তোমার বিদগ্ধ কলা-নৈপুণ্যে ব্রজের সব তরুণীই আজ তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে।

মাধবের নিকুঞ্জরাজ্যে তুমি একাকিনীই যেন পাটরাণী হয়ে বিরাজ করছো। ১৪।

কোন কোন ব্রজসুভ্রুবার তারুণ্য নূতন, কিন্তু বিশেষ ভাবে সজ্জিতা হয়ে পূর্ণ যৌবন প্রকাশের চেষ্টা করে।

রূপ

'অলঙ্কার বিনা অঙ্গ যাতে বিভূষিত।
'রূপ' নামে সেই ভাতি আপনি কথিত॥'

যথা—দান কেলি কৌমুদীতে

বৃন্দা বললেন—হে ললিতা! শ্রীমতীর নিরাভরণ দেহের সৌন্দর্য দেখেই যখন চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা লজ্জিতা হয়, তখন আর তাঁর মণিময় ভূষণের প্রয়োজন কি? । ১৫।

যথা বা—

বিদগ্ধমাধবে শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :

হে প্রিয়তমে! তুমি ললাটে যে সুন্দর কস্তুরী তিলক রচনা করেছ, তোমার চূর্ণ কুন্তলের সৌন্দর্য তাকে ব্যর্থ করেছে। তোমার শ্রুতিমূলের কুবলয় দুটি নয়নযুগলের সৌন্দর্যে নিষ্প্রভ হয়েছে। তোমার বিধুমুখের মৃদু হাসির ছটায় মণিহারের মনোহারিত্ব ম্লান হয়েছে। আপন অঙ্গদ্যুতিতেই যখন তুমি এত সমুজ্জ্বল, তখন অলঙ্কারে তোমার আর প্রয়োজন কি? । ১৬।

লাবণ্য

'মুক্তা জিনি অঙ্গকান্তি করে ঝলমল।
তাহারে লাবণ্য কহে রসিক সকল॥'

মুক্তা-কলাপের স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছদ্যুতির মত যে কমনীয় কান্তি আপনা-আপনি অঙ্গে প্রতিভাত হয়, তাকে লাবণ্য বলে।

যথা—

শ্রীমতীর প্রতি বিশাখা :

'শ্রুতিমূলে এক বচন কহি সুন্দরি তুহু তাহে কর অবধান।
কাহে অধোবদন হোই তুহু বৈঠলি অসময়ে বিরচিলি মান॥
দেখ হরিহৃদয় উপরি ইহ বিলসই তু নহে আন কেহ নারী।
নিরমল দর্পণ সদৃশ হরিবক্ষসি ও প্রতিবিম্ব তোহারি॥' ১৭॥

যথা বা—

শ্রীমতীকে সম্বোধন করে, শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাধে! বিধাতা নিশ্চয়ই জগতের অমল রুচিসমূহ অর্থাৎ পৃথিবীর সকল অনাবিল সৌন্দর্য চয়ন ক'রে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রচনা করেছেন। হে কুরঙ্গনয়না! তোমার অঙ্গের উজ্জ্বল দীপ্তি মণিময় দর্পণকেও বিড়ম্বিত করে। ১৮।

সৌন্দর্য

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত সুষ্ঠু সন্নিবেশ ও সুশ্লিষ্ট সন্ধিবদ্ধকে সৌন্দর্য বলা হয়। ১৯।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাধে! তোমার সৌন্দর্যের কথা আর কি বলবো! তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রের মত, উচ্চ কুচযুগ বক্ষঃস্থলকে অতীব সুদৃশ্য করেছে, বাহু দুটি স্কন্ধদেশের শোভা বর্ধন করে, মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ, নিতম্ব বিশাল, উরুযুগ ক্রমশঃ ক্ষীণ বা লঘু হয়ে অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। অপূর্ব কমনীয়তা বিভাত হয়েছে তোমার এই অনিন্দ্য সুন্দর দেহে।

'মুখ জিনি পূর্ণচন্দ্র বিল্ব জিনি কুচদ্বন্দ্ব ভুজ দুই আনত কন্ধর।
মধ্য মুষ্টিপরিমিত শ্রোণী অতি বিস্তারিত উরু দুই অতি গুরুতর॥'

অভিরূপতা

আপন গুণের উৎকর্ষ দ্বারা সমীপস্থ অন্য বস্তুকে গুণান্বিত করে তোলার কারকতাকে বলে অভিরূপতা।

যথা—শ্রীরাধার প্রতি বিশাখা :

'কৃষ্ণের দশনে বসি স্ফটিক হইল বাঁশী হাতে হয় পদ্মরাগ মণি।
গণ্ডের নিকটে যেঞা ইন্দ্রনীলমণি হঞা বাঁশী হলো রতনের খনি॥'

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাধে! কি আশ্চর্য! ওই শ্বেত কোকনদের কলিকাটি তোমার স্বর্ণকুম্ভের মত স্তন যুগের সংস্পর্শে চাঁপার কলির মত কান্তি ধারণ করেছে। হাতের লীলাপদ্মটি সিন্দুরাভ করতলের স্পর্শে হিঙ্গুলবর্ণ হয়ে উঠেছে। তোমার ওই অতিসুন্দর কেশকলাপে সংলগ্ন বিকশিত কোকনদটি নীলোৎপলের আভা ধারণ করেছে। একই ফুল তোমার অঙ্গসঙ্গে তিনটি বিভিন্ন বর্ণাভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ২০।

মাধুর্য

দেহের যে-রূপ অনির্বচনীয় তাকেই মাধুর্য বলে। ২১।

যথা—

শ্রীরাধার প্রতি বিশাখা :

'কিরূপ দেখিলাম আমি যমুনারি কূলে। বরণি না হয় ওর মন রৈল ভুলে॥
আঁখি ঠারে কুলবতীর ব্রত কৈল নাশ। এমন মাধুর্য কৃষ্ণ অঙ্গে পরকাশ॥'

বিশাখা বললেন—হে রাধে! নবনীরদশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ কুলস্ত্রীগণের হৃদয় হরণ করে, আপন হৃদয়ে স্থাপন করছেন। তাঁর নেত্র বলপূর্বক তাদের তনুবিভঙ্গী হরণ করে নিচ্ছে। হে সুমুখি! সেই জন্যই কুল-কামিনাদের মানসনেত্রের অভাব ঘটেছে, তারা নিজেদের ধর্ম রক্ষা করতে পারছে না। মাধবের অভিনব মাধুর্য তাদের নারীধর্মকে চঞ্চল করে তুলেছে।

মার্দব বা মৃদুতা

কোমল বস্তু সইবারও যে অসহিষ্ণুতা তাকে মার্দব বলে। অর্থাৎ যা কোমলের চেয়েও কোমল।

'কোমল বস্তুর স্পর্শ না পারে সহিতে।
মার্দব কহি যে তারে রসশাস্ত্র মতে॥'

ওই মার্দব বা মৃদুতা তিন প্রকারের। যথা—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। ২২।

উত্তম মার্দব

অভিনব নবমালিকা-রচিত পুষ্পশয্যায় শ্রীরাধা নিশাকালে শয়ন করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একটি ফুলের পাপড়িও তাঁর দেহের সংস্পর্শে ম্লান হয়নি। উপরন্তু পুষ্পের আঘাতেই শ্রীমতীর অঙ্গে অগণিত ব্রণ চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। ২৩।

মধ্যম মার্দব

ধনিষ্ঠার প্রতি ললিতার উক্তি ঃ

হে পীনস্তনি ধনিষ্ঠা! তুমি সূক্ষ্ম চীনাংশুক পরিধান করেছিলে, তাই তোমার কোমল অঙ্গ ব্যথিত হয়ে, রক্ত চন্দনের রক্তিম আভা ধারণ করেছে! সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের সংস্পর্শেও কোমল অঙ্গ রাঙা হয়ে উঠেছে। ২৪।

কনিষ্ঠ মার্দব

পদ্মার আমোদিত মুখপদ্মে সুগন্ধি নীল চূর্ণকুন্তলগুলি ভ্রমরের মত নিবদ্ধ হয়ে আছে। সে মুখপদ্ম এতই কোমল যে, প্রভাত রবির মৃদু কিরণেও তাম্রবর্ণ হয়ে উঠলো।—রসসুধাকর।

এই তিনটি উদাহরণে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, নায়িকার অঙ্গের মৃদুতা বা কোমলতা এত বেশী যে, কোমল বস্তুর সংস্পর্শও সইতে পারে না। একেই মার্দব বলে।

নাম

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি :

'মধুর কালিন্দী তটে হরিণী রয় নিকটে বিহার করয়ে কৃষ্ণসার।
এই কৃষ্ণ নাম শুনি চমকি উঠিল ধনী ভূমিতে পড়য়ে কতবার॥'

মুরারি! আমি রাধার কাছে গিয়ে বললাম যে, হে গৌরাঙ্গি, দেখ যমুনার তীরে কুরঙ্গীদল পরিবেষ্টিত হয়ে কৃষ্ণসার রঙ্গবিহারে মত্ত। আমার মুখে 'কৃষ্ণসারের' কৃষ্ণ শব্দটি শোনামাত্রই শ্রীমতী অনঙ্গ বিপাকে ঘূর্ণিত হয়ে উঠলেন। ২৫।

চরিত

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অনুভাব ও লীলার সমন্বয়।

সেই চরিত্রকে দুটি পর্যায়েও ভাগ করা যায়—অনুভাব ও লীলা। অনুভাব সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এখন লীলা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

লীলা

মনোহর ক্রীড়া, তাণ্ডব, বেণু বাদন, গো-দোহন পর্বত উত্তোলন, গো-আহ্বান এবং গমন ইত্যাদিকে লীলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোহর ক্রীড়া

রাস ও কন্দুক ক্রীড়া বা ভাঁটা নিয়ে খেলা করা ইত্যাদিকে চারুক্রীড়া বা মনোহর লীলা বলা হয়।

রাস

শ্রীরাধার প্রতি শ্যামলার উক্তি :

'রাস করল হরি ব্রজনারী সঙ্গে। কোটী মদন জিনি নয়ন কি ভঙ্গে॥
অম্বরে তা দেখি সুরচয় নারী। ঠোরি না পাওল ইহ রস ভারি॥'২৬।

'পেখত হরি অব খেলত গেড়ুয়া। পিঠত দোলই বেণী ঘন চারুয়া॥
কত কত ভঙ্গী করত হরি নয়নে। মঝু মন জারল ফুলশর দহনে॥'

শ্রীকৃষ্ণের কন্দুক ক্রীড়া দেখে শ্রীমতী সখীদের বললেন—সখীগণ! ওই দেখ, শ্রীকৃষ্ণ অরুণ বর্ণের ক্ষেপনী দ্বারা গোলকটি উর্ধ্বে নিক্ষেপ ক'রে, তার পিছনে পিছনে ছুটছেন। পিঠে তাঁর দীর্ঘ বেণী দুলছে। কন্দুক আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর লীলাচঞ্চল আয়ত নেত্র বিভ্রমের সৃষ্টি করছে। তাই দেখে, আমাদের অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। ২৭।

তাণ্ডব

তাণ্ডব বলতে বুঝায় উদ্দাম নৃত্য; যে নৃত্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সখীর প্রতি শ্রীরাধা—

'দেখ দেখ সখি! নাগর নাচিছে কালিন্দী নদীর কূলে।
এমন নাচন দেখেছে যে জন সেই রহে এথা ভুলে॥
শিখিপাখা শিরে পবনে উড়িছে সখাগণ তাল ধরে।
এমন দেখিয়া কোন কুলবতী রহিতে পারিবে ঘরে॥ '২৮॥

বেণুবাদন

শ্রীরাধার প্রতি ললিতা—

'কটিতটে ধড়া বান্ধি ওদুটি চরণ ছান্দি কাঁকালি পড়য়ে যেন হেলে।
বাঁকা নেত্র কন্ধরে বাঁশী লঞা অধরে তার ছিদ্র আচ্ছাদি অঙ্গুলে॥
চঞ্চল নয়নবাণে আর মুরলীর গানে হানিলেক অবলার প্রাণে।
কিবা মন্ত্র জানে কানু অবশ করিল তনু সেই রূপ দেখিয়া নয়নে॥'

হে বরাঙ্গি! ওই দেখ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বামজঙ্ঘার অধোভাগে দক্ষিণ চরণ রেখে, বঙ্কিম ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে, তির্যক কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে, ঈষৎ বিকশিত অধরে বংশী নিয়ে অঙ্গুলি সঞ্চালন করছেন। ভ্রমরের মত

সুন্দর ভ্রূদুটি সেই সঙ্গে নৃত্য ক'রে পরম আনন্দ সঞ্চার করে। তাঁকে স্বীকার করে নাও।—ললিত মাধব।

গো-দোহন

শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহন ভঙ্গিমা শ্রীরাধাকে দেখিয়ে, বিশাখা বললে—প্রিয়সখি! ওই দেখ, দুটি চরণ অর্ধ-উত্তোলন ক'রে, ভূমিতে বসে, শ্রীকৃষ্ণ নতাগ্র-জানুদুটিতে দোহন পাত্র ধারণ ক'রে, অঙ্গুষ্ঠ ও সংলগ্ন অঙ্গুলিদুটি দ্বারা গাভীস্তনের উধস্ বা বাঁট দুগ্ধ-প্রলেপে আর্দ্র করে নিয়ে গো-দোহনে রত হচ্ছেন। দামোদরের ওই অঙ্গুলিদ্বারা স্তনাগ্র সঞ্চালন, ও গো-দোহনের মনোহর দৃশ্য দেখে, আমার চিত্ত রসসিক্ত ও মুগ্ধ হচ্ছে। ২৯।

পর্বতোদ্ধার

শ্রীমতী বিশাখাকে বললেন—ওই দেখ সখি, কি আশ্চর্য! শ্রীকৃষ্ণ বামহস্ত উত্তোলন ক'রে, গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছেন। দক্ষিণ হস্ত কটিদেশে রেখে, মৃদু-মৃদু মধুর হাস্য করছেন। তাঁর চঞ্চল নয়নদুটি ভ্রমরের মত খেলা করছে। কৃষ্ণের ওই মোহন মূর্তি আমার মানসপদ্মকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে।

গো-আহ্বান

ললিতাকে শ্রীমতী বললেন—সখি! দূরগত ধেনুগণকে একের পর এক নাম ধরে, শ্রীকৃষ্ণ মুহুর্মুহু হী-হী রবে আহ্বান করছেন। তাঁর সেই আহ্বান আমার চিত্তকে হরণ করছে।

গমন

শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—দেখ সখি! মাধবের ওই গতিভঙ্গী আমায় অপার আনন্দ দান করে।

'গজরাজ জিনি দেখ কানু চলে। মধুপ আকুল নবমালে দোলে॥
চঞ্চল বায় শিখিপুচ্ছ উড়ে। মৃদুহাস্যে তার মাণিক মোতি পড়ে॥'

প্রতি পদক্ষেপে বাহুযুগল আন্দোলিত হয়। মাল্যগন্ধে

মধুপগণ আকুল হয়ে ওঠে, এবং বায়ুহিল্লোলে ঈষৎ চঞ্চল শিখিচূড়া অপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করে। ৩০।

মণ্ডন

বসন, ভূষণ, মাল্য, অনুলেপন ইত্যাদি ভেদে মণ্ডন চার রকমের। নায়ক ও নায়িকার সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষা ও প্রসাধনাদি পরস্পরের আকর্ষণ, প্রেম ও সম্ভোগলিপ্সা বৃদ্ধি করে।

বসন

শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সুন্দরি! ওই যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ কটিতটে মণিপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল বসন পরিধান করেছেন, তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ওই বসনের আশ্চর্য শোভা দেখে যে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। ৩১।

দলিত-হরিতালদ্যুতি-সিঞ্চিত-পীতবসনধারী।
উজ্জ্বল নব-রক্ত-জবা রঞ্জিত রাঙা চরণচারী॥
কৌতুকলীলা-লাস্যভরে মঞ্জরে হাসি বিম্বপুটে।
তমালশ্যাম নিত্য সেরূপ চিত্ত আকাশে উঠুক ফুটে॥

—হংসদূত।

শ্রীমতীর পট্টবাস দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—রাধে! অমল পদ্মরাগের মত তোমার ওই পট্টবাস জয়যুক্ত হয়েছে। আমার হৃদয়ের অনুরাগের রঙ তার সঙ্গে মিশে তোমার বসনকে দ্বিগুণ রক্তবর্ণ করে তুলেছে। ৩২।

ললিতার প্রতি শ্রীমতী—

'নীপপুষ্প কৃষ্ণকর্ণে রহে ত কামের তূণে সেই মোরে দুঃখ দিতে পারে।
শিখিপাখা আছে শিরে কিবা দোষ দিব তারে সেও কেন দুঃখ দেয় মোরে॥'

॥ ৩৩ ॥

যথা বা—

পথে ললিতাকে যেতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ তার রূপ বর্ণনা ক'রে সুবলকে বললেন—সখা, ওই যে দেখছো ললিতা যাচ্ছে, ওর কণ্ঠহারের দ্যুতি, কানের দোদুল্যমান কুণ্ডল এবং কনক অঙ্গদের উজ্জ্বলতা আমাকে আকর্ষণ করছে; আমার মনে অভিলাষ সঞ্চারিত ক'রে, আমায় ব্যথিত ক'রে তুলেছে। ৩৪।

মাল্য ও অনুলেপন

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—বন্ধু, শ্রীরাধা যে তাঁর কেশদামে পুষ্পমাল্য ধারণ করেছেন, বস্ত্রের দ্বারা তা আবৃত থাকলেও, মকরন্দ-লোলুপ মধুপবৃন্দ সেখানে গুঞ্জন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গণ্ডদ্বয়ের অনির্বচনীয় কান্তি তাম্বুল রাগকে বর্ধিত করেছে। ওই সুরূপার বিদগ্ধ বেশ আমার নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। তাঁর অঙ্গের প্রসাধন সুগন্ধে আমার মন বিমোহিত হয়ে ওঠে। ৩৫।

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়ে দূতী বললে—হে দামোদর! তোমার চন্দনাদি অঙ্গরাগ কি অঙ্গনাদের অনঙ্গ বর্ধনের জন্য? তোমার গলায় যে পুষ্পমাল্য ধারণ করেছ, তাও কি কুলাঙ্গনাদের উদ্দাম মনোভাব সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে?

সম্বন্ধী

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে যোগাযোগের উপলক্ষ্য বা উদ্দীপন এবং সমীপবর্তিত্বকে সম্বন্ধী বলে। লগ্ন ও সন্নিহিত ভেদে সম্বন্ধী দুরকমের।

লগ্ন

বংশীরব, শৃঙ্গীধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণশব্দ, চরণচিহ্ন, বীণারব এবং শিল্পকৌশল ইত্যাদিকে বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ লগ্ন-সম্বন্ধী বলেন। ৩৬

বংশীরব বা মুরলীধ্বনি

শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি :

'ওই যে বেণুর নাদ তরুলতা উন্মাদ শুনি তরু বিকশিত হয়।
কোকিলের কুহুরব সন্ধ্যামেঘ তাণ্ডব তারা সব মৌন হয়ে রয়॥
গোপীগণের স্মরানল তাহে ঝঞ্ঝা হানল সে আগুনে হিয়া জলে যায়।
রাধা-ধৈর্য গিরিরাজ তাহা বিদারিছে বাজ, রাধিকা চঞ্চল হৈলা তায়॥'

—দানকেলি কৌমুদী।

মুরলী শুনে, শুধু যে শ্রীরাধার পর্বতসদৃশ ধৈর্যই বিদীর্ণ হয়, তাই নয়। সুপটু মাধব যখন মধুর মাধবীলতামণ্ডপের ভিতর থেকে সুমধুর বংশীধ্বনি করেন, গোপিকাগণের মানরূপী মীন যেন বড়িশ বিদ্ধ হয়।

—রসসুধাকর।

যে সব উদ্দীপনের কথা বলা হলো, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত মুরলীধ্বনিই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট।

শৃঙ্গীরব বা শৃঙ্গাধ্বনি

শৃঙ্গাকে সম্বোধন ক'রে শ্রীরাধা বললেন—রে শৃঙ্গি! মুরলী অহরহ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সুধাপান করছে, তা করুক। কারণ, সে সদ্বংশজাতা, সরলা এবং পঞ্চমস্বরনিনাদে গরীয়সী। কিন্তু তুমিও তো শ্রীকৃষ্ণের অধর স্পর্শ কর। তবে তুমি কেন এমন বিষমা? তোমার দেহ বক্র, অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ। সে যাই হোক, তুমি অমন উচ্চরব ক'রো না। তোমার ধ্বনি শুনে, সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হয়। সুতরাং তুমি ক্ষান্ত হও।

গীত

কলহান্তরিতা শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সখি! ওই দেখ আমার মনের আগুন নিবিয়ে দেবার জন্য কৃষ্ণমেঘ গীতি-অমৃত বর্ষণ

করছে। রাগ করো না সখি, প্রসন্ন হও। তুমি সাক্ষাৎ ঝড় (স্বয়ং বাত্যা), তোমার প্রভাবে ওই কৃষ্ণ জলদকে দূরে সরিয়ে দাও। ৩৭।

'নিভাইয়া মানানল বরিষয়ে গীত জল মেঘ হঞা আসিয়াছে হরি।
দক্ষিণ পবন হঞা দেহ মেঘ উড়াইয়া তবে মান রাখিবারে পারি ॥'

সৌরভ

অভিসারিকা শ্রীরাধা বনের ভিতর প্রবেশ করে, ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সহচরি! এই নিবিড় বনে কার সুমধুর অঙ্গ-পরিমল বাতাসে ভেসে এসে, আমার অঙ্গ স্পর্শ করছে? সেই স্পর্শে আমার তনুলতা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আমি বেশ জানতে পারছি যে, এই গভীর অরণ্যে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে এসেছেন। নইলে, এমন অঙ্গগন্ধ আর কার হবে! ত্রিভুবনে তিনি একাই এ-হেন সৌরভশালী ব'লে খ্যাতিলাভ করেছেন। ৩৮।

যথা—

'কার পরিমল আওল মঝু গেহে। তনুরুহ নর্ত্তন করত হি দেহে ॥
জানলু মাধব আওল ধাম। যাকর ভুবনে সুরভি বলি নাম ॥'

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে জিজ্ঞাসা করলেন—বন্ধু, হঠাৎ এই উৎকৃষ্ট নব সৌরভ কোথা থেকে এলো? এই পরিমল যে আমার হৃদয়ে মাদকতার সৃষ্টি করে! আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই শ্রীরাধা পুষ্পচয়নের জন্য গিরিশিখরে প্রবেশ করেছেন। ৩৯।

ভূষণক্কণ

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বললে—মাধব! আজ হংসগামিনী শ্রীরাধা যমুনাতটে কলহংসের নিনাদ শুনে, তোমার নূপুরধ্বনি বলে ভুল করেছিল। ফলে, তার এমন চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হলো যে, শ্রীমতীর মস্তক থেকে জলপূর্ণ কলসী স্খলিত হয়ে ভূপতিত হলো। সে তা জানতেও পারেনি। ৪০।

'কালিন্দীতে কমলিনী শুনিয়া হংসীর ধ্বনি কৃষ্ণের নূপুর বলি জানিল।
কাঁখে ছিল কলসী ভূমিতে পড়িল খসি তাহা কিছু জানিতে না পারিল ॥'

যথা ললিত মাধবে—

শ্রীরাধাকে দর্শন করবার অভিলাষ নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করছিলেন—আহা! শ্রীরাধার ওই কিঙ্কিনী ঝংকারের মাধুর্য আকাশে উড্ডীয়মান কলকাকলিমত্ত সারস পক্ষীদের কলধ্বনিকেও হার মানায়। কিন্তু তা ভেবে তো আমার হৃদয়ের বিকার প্রশমিত হচ্ছে না। ৪১।

পদাঙ্ক

দানকেলি কৌমুদীতে শ্রীরাধা ললিতাকে বলেছেন—

'অঙ্কুশসহ পঙ্কজ বজ্রের সহিত ধ্বজ এ চিহ্ন ও কৃষ্ণের চরণ।
সেই চিহ্ন ধরণীতে দেখিয়া আমার চিতে কভু প্রীতি কভু বা কম্পন॥'

সখি! এই বনশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল চরণচিহ্ন দেখে আমোদিত হয়ে, পুষ্পিত অগ্রভাগ নত ক'রে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। এই বনশ্রেণী দেখে, আমার চিত্তে অতিশয় আনন্দ সঞ্চারিত হচ্ছে। ৪২।

বিপঞ্চীনিক্কণ বা বীণার ঝংকার

শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলাকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন—বন্ধু, এই বৃন্দাবনে একমাত্র শ্যামলাই পূজ্যতমা। কারণ, শ্যামলা তার বীণায় কন্দর্পকেলি নাট্যের যে মঙ্গল-বেদ পাঠ করেছে, সেই নান্দীপাঠ যেন বেদের শব্দব্রহ্মের মত মুহুর্মুহু আমার চিত্তকে আমোদিত করেছে।

শিল্পকৌশল

মাল্যবাহিকা বনদেবীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

'কি মালা গেঁথেছে হরি নানা ফুল সারিসারি পট্টসূতে করিয়াছে গুণ।
দেখি মন কাঁপে শূন্য যেন তীক্ষ্ণ বাণপূর্ণ কন্দর্পের অভিনব তূণ॥'

নির্বাচিত ভালো ভালো ফুলগুলি এবং মালা গাঁথবার সৌষ্ঠব ও শিল্পকৌশল দেখেই আমি বুঝেছি যে, এ মালা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

গেঁথেছেন। তাই, এ মালা দেখেই আমার হৃদয় কেঁপে উঠছে। এ যেন কন্দর্পের শাণিত শরপূর্ণ তূণ! ৪৩।

সন্নিহিত

যে সব জিনিস, ব্যক্তি ও স্থান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট, বা যে সব জিনিস দেখে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হয়, তাকে সন্নিহিত বলে। যেমন—নির্মাল্য, বর্হ, গৈরিক, উত্তমা গাভী, পাঁচনী, বেণু, শৃঙ্গা, প্রিয়জন, গোধূলি, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনে আশ্রিত লতা, কুঞ্জ, কদম্ব, তুলসী, ভ্রমর, ময়ূর-ময়ুরী প্রভৃতি জীব, গিরিগোবর্ধন, যমুনা ও রাসস্থলী ইত্যাদি॥ ৪৪—৫১॥

উদাহরণ :

নির্মাল্যাদি

'অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপন মন কৈল আকর্ষণ নামে পুনঃ বশ কৈল মন।
এই যে নির্মাল্য মালা পুন মনসম্মোহিলা তিন বস্তু পরম মোহন॥'

বিশাখার প্রতি শ্রীমতী—বিদগ্ধমাধব।

বর্হ ও গুঞ্জা

পৌর্ণমাসীর উক্তি :

'শিখিপুচ্ছ দরশনে রাই কাঁপে ঘনে ঘনে গুঞ্জা দেখি করএ রোদন।
রাধার হৃদয়ে আসি কোন গ্রহ রৈল পশি বিরচিয়া অপূর্ব নটন॥'

নৈচিকী বা উত্তমা গাভী

'সন্ধ্যাকালে ধেনু সব পথে করে হাম্বারব তোমা বিনা হৈয়া কাতরে।
তাহা শুনি চন্দ্রাবলী দুঃখের অনলে জলি ছটফট করয়ে অন্তরে॥'

মাথুর—পদ্মার উক্তি।

নিষ্প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সন্নিহিতের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হলো না।

তটস্থ বা তটস্থ উদ্দীপন

যে সব উদ্দীপন উৎকণ্ঠা, প্রেমানুভূতি, বা মিলনের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে, তাদের তটস্থ উদ্দীপন বলা হয়।

'তটস্থ চন্দ্রের জ্যোৎস্না, মেঘ ও বিদ্যুৎ।
বসন্ত, শরৎ-চন্দ্র, সুগন্ধি মারুত॥

পক্ষী আদিগণ হয় তটস্থ উদ্দীপন।
পূর্বে জানো উদাকৃতি যত বিবরণ ॥'

চন্দ্রিকা বা জ্যোৎস্নালোক, আকাশে মেঘ ও বিদ্যুৎ, বসন্তকাল, শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রি, সুগন্ধি বায়ু, ময়ুর-ময়ূরী-শুকশারী-পাপিয়া-কোকিল ইত্যাদি পক্ষীগণ প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ বা মিলনের অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে ও উৎকণ্ঠা সঞ্চার করে। তাই এগুলিকে তটস্থ উদ্দীপন বলা হয়। ৫২—৫৬।

প্রতিটী তটস্থ উদ্দীপনের স্বতন্ত্র উদাহরণ দেওয়া হলো না। উল্লিখিত উদ্দীপনগুলির কারকতা সুস্পষ্ট। চাঁদের আলো, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্তকাল ও দক্ষিণা বাতাস এবং পুষ্পিত কানন, শরৎকালের জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী, পুষ্পগন্ধবাহী মৃদু বাতাস, ময়ুর ময়ূরীর নৃত্য, কোকিলের কুহুতান ইত্যাদি যে প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি করে, তা সর্বজনবিদিত। সুতরাং উদাহরণের দ্বারা পুনরায় সেই সব উদ্দীপনের বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

অনুভাব প্রকরণ

নায়ক-নায়িকার ভাবোদ্দীপক বা মনোভাব প্রকাশক ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি রতিসূচক গুণ-ক্রিয়াদি, ব্যঞ্জনা, চোখের চাতুর্য ইত্যাদিকে অনুভাব বলে।

অনুভাব তিন রকমের : অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর (নীবী ও উত্তরীয় ভ্রংশনাদি সপ্তবিধ) এবং বাচিক (আলাপাদি দ্বাদশবিধ)।

অলঙ্কার

যৌবনকালে কামিনীগণের সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার বিংশতি প্রকার হয়। নায়কের প্রতি সর্বপ্রকার অভিনিবেশ হেতু ওই অলঙ্কার সময় সময় প্রকাশ পায়।

বিকারের কারণ থাকা সত্ত্বেও চিত্তে যে অবিকৃত ভাব থাকে তাকেই সত্ত্বগুণ বলে। প্রণয় সঞ্চারে নায়িকার মনে বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু নায়ক বা কান্তের প্রতি সকল বিষয়ে তার অভিনিবেশ থাকে বলে, সে বিষয়ে চিত্ত অবিকৃত থাকে। এরূপ অবস্থায় সময় সময় শুধু ওই সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কারগুলি প্রকাশিত হয়। এই অলঙ্কারের মধ্যে হাব, ভাব ও হেলা—এই তিনটীকে অঙ্গজ অলঙ্কার বলা হয়।

শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য—এই সাতটিকে অযত্নজ বলা হয়। শোভার জন্য বেশাদি বিষয়ে প্রযত্নের অভাবেও শোভা স্বতঃ প্রকাশিত হয়। অযত্নজ শোভা বলতে সাধারণতঃ বুঝায়, যত্ন না করলেও যে শোভা বিকশিত হয়, অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশিত (Spontaneous)। কিন্তু চেষ্টিত অযত্নের দ্বারা যা ঘটানো হয়, তাকেও অযত্নজ শোভা (Beauty created by careful carelessness) বলা যায়।

অপর—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত—এই দশটি অনুভাব স্বভাবজ। নায়িকাদের এই অনুভাবগুলি স্বভাবতই ঘটে থাকে, তার জন্য তাদের চেষ্টা করতে হয় না। ৫৭।

অঙ্গজ অলঙ্কার তিন রকম

ভাব

বীজের আদি বিকৃতি যেমন অঙ্কুর, তেমনি শৃঙ্গার রসে নায়িকার নির্বিকার চিত্তে রতিবিষয়ক প্রথম বিকারের নাম ভাব।

'নির্বিকারে মনসি উদ্‌বুদ্ধমাত্র বিকারো ভাবঃ।'

নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া ॥ ৫৮ ॥
চিত্তস্যাবিকৃতি সত্ত্বং বিকৃতে কারণে সতি।
তত্রাদ্যা বিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ ॥ ৫৯ ॥

শৃঙ্গার রসে নির্বিকার চিত্তে রতিনামক স্থায়িভাবের প্রাদুর্ভাব হলে, প্রথম যে বিক্রিয়া হয়, তাকে ভাব বলে।

বিকারের কারণ থাকা সত্ত্বেও চিত্তের যে অবিকৃত অবস্থা, তার নাম সত্ত্ব।

এই সত্ত্বের যে প্রথম বিক্রিয়া (disturbance of equillibrium) বা রতিবিষয়ক আবেগ বা চাঞ্চল্য, তাকেও ভাব বলা হয়।

যথা—

কোন সখী হৃদয় উদ্‌ঘাটনের পটুতা দেখিয়ে, যূথেশ্বরীকে বললে—সখি! তোমার পিত্রালয়ের কাননে কত ফুল ফুটে শোভা বর্ধন করতো। সেখানে পরম সুন্দর দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখেও, তোমার মন আগে কোনদিন স্পন্দিত হয় নি। কিন্তু আজ সম্মুখের ওই বৃন্দারণ্যে মুকুন্দকে ভ্রমণ করতে দেখে, তোমার চোখদুটি অমন

আন্দোলিত হচ্ছে কেন? কানের শাদা কুমুদ ফুল-দুটিই বা অমন পদ্মের মত আভা ধারণ করলো কেন? । ৬০ ।

'কখন তোমার নয়ন কমল চঞ্চল নাহি দেখি।
কানু বনমাঝে বিহার করিছে, দেখিছ পশারি আঁখি॥
আজি ত নয়ান চঞ্চল হইঞা শ্রবণ নিকটে গেল।
যাহার শোভাতে শ্রুতির কুমুদ ইন্দীবরসম হল॥'

হাব

গ্রীবা বক্র করে, ভ্রূ ও নয়নের যে ভঙ্গিমা দ্বারা ভাবের ঈষৎ প্রকাশ হয়, তাকে হাব (Gesture) বলা হয়। ৬১।

যথা—

শ্রীরাধাকে শ্যামা বললে—

হে গৌরাঙ্গি! তোমার গ্রীবা বামদিকে বক্র হয়ে আছে, নয়ন ভ্রমরচঞ্চল গতিতে অর্ধনিমীলিত হয়ে কর্ণমূলের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ভ্রূলতা নৃত্য করছে। মনে হয়, যমুনাতীরে কুসুমচয়ের উল্লাসকারী বনপ্রিয়বধূবন্ধু মাধব নিশ্চয়ই তোমার চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই তোমার এই ভাবোদ্‌গম—চোখেমুখে মনোগত চাঞ্চল্যের উন্মেষ।

হেলা

হাব এব ভবেৎ হেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গার সূচকঃ। ৬২।

হাব যদি শৃঙ্গার সূচক রূপে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়, তা হলে তাকে হেলা বলে।

যথা—

বিশাখা শ্রীরাধাকে বললে—প্রিয়সখি! বংশীধ্বনি শুনে যে তোমার বক্ষস্থল স্ফুরিত ও স্পন্দিত হয়ে উঠছে। কপোল ও বদন পুলকিত হয়ে উঠলো। নয়ন তির্যক্ হলো। নীবিবন্ধ স্খলিত হলেও জঘনদেশ স্বেদসিক্ত হয়ে উঠলো; আর্দ্র বসন অঙ্গে জড়িয়ে যায়।

দেখো, যেন প্রমাদ ঘটিয়ো না। সখি! ওই দেখ, গুরুজনেরা বাম দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ৬৩।

অযত্নজ অলঙ্কার

অযত্নজ অলঙ্কার সাত রকমের হয়। যেমন—

শোভা

রূপসম্ভোগে অঙ্গের বিভূষণকে শোভা বলে।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—সখা, প্রভাত বেলায় বিশাখা চঞ্চল-নেত্রা হয়ে, রক্তাঙ্গুলিযুক্ত করপল্লবে কদম্বের শাখা ধরে, লতামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসছিল। অর্ধমুক্ত বেণী লুটিয়ে পড়েছিল তার স্কন্ধে। বিশাখার সেই রূপ আজো আমার হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আছে। সে মূর্তি কোনমতেই মন থেকে অপসারিত হ'চ্ছে না। ৬৪।

কান্তি

শোভা যখন মন্মথ-প্রাবল্যে উজ্জ্বলতর হয়, তখন তাকে কান্তি বলে। নায়িকার যে শোভা নায়কের মন্মথ বৃদ্ধি করে, তাকেও কান্তি বলা হয়। শোভাকে বলা চলে রূপ, আর কান্তি সেই রূপের মাদকতা।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—সখা, শ্রীরাধা স্বভাবতই মধুর-মূর্তি, তাতে আবার নব তারুণ্য তার দেহকে আলিঙ্গন করেছে। তার উপর, মদনবিহারে তার বিশেষ উদারতা দেখেছি। তাই আমার হৃদয়কে মদির ক'রে, রাধিকা প্রণয় পাশে অবরুদ্ধ করেছে।

দীপ্তি

বয়স, ভোগ, দেশকাল ও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি অতিশয় বিস্তৃত বা বিকশিত হয়, তাকে দীপ্তি বলে। দীপ্তি দ্বারা প্রভান্বিতা ও উদ্দীপিতা হয়ে নায়িকা দয়িতের মনোহরণ করে।

যথা—

রূপমঞ্জরী তার সখীকে বললে—সুন্দরি! ওই দেখ, শ্রীমতীর আঁখিদুটি নিমীলিত হয়ে আসছে। মলয় বাতাসে তার অঙ্গের স্বেদবিন্দুগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়েছে। অমল হারে কুচযুগ উজ্জ্বল হয়ে আছে। চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত তটনিকুঞ্জে অঙ্গ ছড়িয়ে, তিনি শুয়ে আছেন। কিশোরীর এই মূর্তি মাধবের চিত্তে মনসিজ জ্বালা সৃষ্টি করছে।

মাধুর্য

সর্ব অবস্থায় নায়িকার যে চেষ্টা নায়কের মনোহরণ করে, তাকে মাধুর্য (charm). বলে

যথা—

বিধুমুখী কংসারির স্কন্ধদেশে পুলকিত দক্ষিণ বাহু স্থাপন ক'রে, বামহস্ত নিজের শ্রোণীতটে রেখে, মাথাটি ঈষৎ হেলিয়ে, ছন্দিত পদে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে মনে হয়, রাসলীলার পর শ্রীমতী যেন অলসাঙ্গিনী হয়েছেন।

প্রগল্‌ভতা

সম্ভোগ বিষয়ে নিঃশঙ্কচিত্তা হয়ে, নায়িকা যে প্রয়াসে উদ্যতা হয়, তাকে প্রগল্‌ভতা বলে।

নায়িকার অকুণ্ঠিত আচরণ, এবং অসংকোচে কথাবার্তা বলাকেও প্রগল্‌ভতা বলা হয়।

যথা—বিদগ্ধ মাধবে

বৃন্দা বললেন—সখি! কামকলায় প্রবীণতা দেখিয়ে, শ্রীমতী যে ভাবে প্রতিকূলতার সঙ্গে কৃষ্ণের অঙ্গে নখরাঘাত ও অধর দংশন করেছিলেন, তাতে মাধব পরম পরিতুষ্টি লাভ করেছেন।

ঔদার্য

সর্ব অবস্থায় বিনয় প্রদর্শন করাকে ঔদার্য বলে। ৬৫।

ঔদার্যগুণান্বিতা নায়িকার ব্যবহারে সর্বদাই বিনয় ও উদারতা প্রকাশ পায়।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

'সরল নয়নগতি বদনে করয়ে স্তুতি, দেখি করে সম্ভ্রম অপার।
তাথে করি অনুমান হৃদয়ে রাধার মান, বিদগ্ধের এই ব্যবহার॥'

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বললেন—দেখ, হৃদয়ের অভিমান চাপা রেখে, চন্দ্রাবলী কেমন সুষ্ঠু দাক্ষিণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন। চোখে সারল্যের পরাকাষ্ঠা, মুখে বিনয়স্তুতি, এবং ব্যবহার অতীব সম্ভ্রমপূর্ণ ও বিদগ্ধ।

যথা বা—

প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বললেন—সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞ। তা ছাড়া, তাঁর বুদ্ধিও প্রেমোজ্জ্বল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং অভিজ্ঞ-চূড়ামণি। কিন্তু অমন কৃপাসমুদ্র এবং নির্মলহৃদয় হয়েও, যখন এই বৃন্দাবনের কথা তিনি আর স্মরণ করছেন না, তখন এ আমার জন্মান্তরের পাপের ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ধৈর্য

উন্নত অবস্থায় নায়কের ঔদাসীন্য প্রকাশ পেলেও, বিরহিণী নায়িকার চিত্তে যে স্থিরভাব বজায় থাকে, তাকে ধৈর্য বলে।

যথা—ললিতমাধবে

শ্রীরাধা নববৃন্দাকে বললেন—সখি! শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় যদি উদাসীনতায় পরিপ্লুত হয়, এবং তার জন্য যদি তিনি আমার প্রতি সহস্র বৎসরকাল স্বৈরী হয়ে কাঠিন্য অবলম্বন করতে চান, তা করুন। কিন্তু আমি ভুলেও সেই প্রিয়ের-চেয়ে-প্রিয় শ্যামসুন্দরের প্রতি প্রণয়ানুগত্য জন্মজন্মান্তরে ত্যাগ করতে পারবো না।

স্বভাবজ অলঙ্কার

স্বভাবজ অলঙ্কার দশ রকমের। যথা—

লীলা

রমণীয় বেশ ও কার্যকলাপের দ্বারা প্রিয়জনের অনুকরণ করাকে লীলা বলে। ৬৬।

যথা—বিষ্ণুপুরাণে

পরাশর মৈত্রেয়কে বললেন—

কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা কোন এক গোপাঙ্গনা বাহুমূলে করাঘাত করে, বীরত্বব্যঞ্জক শব্দের সঙ্গে বলেছিল—ওরে দুষ্ট কালীয়। থাক, আমিই কৃষ্ণ, আজ আমিই কালীয়দমন করবো।

যথা বা—গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরীতে

রতিমঞ্জরী তার সখীকে বললে—সুন্দরি! ওই দেখ, কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা রাধা গায়ে মৃগমদ লেপন ক'রে, পীতবাস পরিধান করেছেন। কেশপাশে সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ বেঁধে, গলায় বনমালা নিয়ে, আনত স্কন্ধে সরল বাঁশীটি রেখে, মধুর বাদ্য করছেন। মাধব-বেশধারিণী সেই রাধা আমাদের রক্ষা করুন।

বিলাস

প্রিয়সঙ্গমের জন্য গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য, তাকে বিলাস বলে। ৬৭।

যথা—

শ্রীরাধার প্রতি বীরার উক্তি :

'নাগরে দেখিয়া নাসার মুকুতা মাজিছ করিয়া ছল।
মুখে মৃদুহাসি ছাপায়ে রেখেছ ইহাতে কি আছে ফল॥
সখি দূরেতে চাতুরি রাখ।
তোর হাসি লবে ত্রিভুবন সবে ঝলমল করে দেখ॥'

হে মধুরদন্তি! সম্মুখে উল্লসিত মাধবকে দেখে, তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। তুমি নাসাগ্রের মুক্তা-বেসর অবনমিত

করবার জন্য মুখে হাত চাপা দিয়ে, কেন ছল ক'রে তোমার সেই মধুর হাসি গোপন করবার চেষ্টা করছো? চন্দ্রকিরণের মত তোমার দন্তদ্যুতি যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সেই সুধাকিরণ-কৌমুদী মাধুরী সঙ্গোপন ক'রো না। ৬৮।

যথা বা—

বৃন্দা শ্রীরাধাকে অভিসারে নিয়ে গিয়ে বললেন—হে তন্বী, ওই কদম্ববৃক্ষের সন্নিকটবর্তী কুঞ্জকুটীরে শ্রীকৃষ্ণ আগেই এসেছেন। তুমি কৌতুকবশতঃ তাঁকে দেখতে গিয়ে, তোমার নয়নতরঙ্গে যে ক্ষীরোদসাগরের লাবণ্য উদ্বেলিত করে তুলছো, সেই ক্ষীর প্রবাহে যমুনার নীল জলরাশি গঙ্গাজলের মত ধবলবর্ণ হয়ে উঠলো।

বিচ্ছিত্তি

যে বেশরচনা বা প্রসাধন অসম্পূর্ণ বা অতি অল্প হয়েও দেহকান্তিকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলে, তাকে বিচ্ছিত্তি বলে।

এক হিসাবে বিচ্ছিত্তিকেও চেষ্টিত অযত্নজ-শোভা (careful carelessness) বলা যায়।

যথা—

নান্দীমুখীর প্রতি বৃন্দা—

'একটি মাকন্দ পত্র পরিয়াছে কানে। তাহাতে পরম শোভা রাধার বদনে।
রক্তবর্ণ সেই পত্র হৈল আভরণ। তাহাতেই বশ কৈল গোবিন্দের মন ॥'

শ্রীরাধা মুকুন্দের চিত্তপ্রমোদকারী একটী মাত্র রক্তবর্ণ কচি আম্র পল্লব দিয়ে কর্ণভূষণ রচনা করেছেন। মৃদু বায়ুহিল্লোলে সেই পল্লবটি স্পন্দিত হওয়ায়, তাঁর মুখকমল অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। আশ্চর্য! এই সামান্য এবং অসম্পূর্ণ প্রসাধনেও শ্রীমতীর রূপ অপরূপ হয়ে উঠেছে।

যথা বা হরিবংশে

বৈশম্পায়ন ঋষি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করে বললেন—কি আশ্চর্য। লতা দিয়ে গাঁথা কয়েকটি আমলকী পত্রের মালার সঙ্গে একটি ময়ূর পুচ্ছ মৃদুমন্দ সমীরণে কম্পিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি অনুপম করে তুলেছে । ৬৯।

কোন কোন রসজ্ঞ ব্যক্তির মতে, প্রিয়জনের প্রতি অভিমান বশে বরস্ত্রীরা যখন অবজ্ঞা ভরে অঙ্গ থেকে আভরণ খুলে ফেলে দেয়, এবং সখীদের সযত্ন চেষ্টাতেও অঙ্গে ধারণ করতে চায় না, তখন তাকেও বিচ্ছিত্তি বলে।

যথা—

বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা—

'কেন দুষ্ট টাড় লয়া তাথে দৃঢ় মুদ্রা দিয়া পুন পরাইলে মোর হাতে।
দৃঢ় গ্রন্থি দিয়া পুনঃ হার পরাইলে কেন দূর করি ফেলহ তুরিতে॥
কৃষ্ণ ভুজঙ্গের বিষে সব অলঙ্কার দোষে আমি তাহা কেমনে ধরিব।
আভরণ সঙ্গে আসি বিষ মোর অঙ্গে পশি অচিরাতে পরাণে মরিব॥'

সখি! তুমি অতিমুগ্ধা, তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই যে, এই সব অলঙ্কার কৃষ্ণভুজঙ্গের দুর্বার বিষ-দৃষ্টিতে দূষিত হয়েছে। এ রত্নালঙ্কারে আমার মন বিন্দুমাত্র তুষ্ট হচ্ছে না। আমি সইতে পারছি না। অঙ্গদদুটি দৃঢ় হয়ে হাতে বসেছে; মণিময় হার কঠোর হয়ে উঠেছে। গ্রন্থি মোচন ক'রে, আমার কণ্ঠ থেকে এই মণিহার তুমি শীঘ্র খুলে দাও।

বিভ্রম

বল্লভের নিকট অভিসারে যাবার সময়, নায়িকা প্রবল মদনাবেগে উন্মনা হয়ে, ভুলক্রমে মাল্য ও হার প্রভৃতি আভরণ অযথাস্থানে স্থাপন করে। অঙ্গভূষণের এই স্থানবিপর্যয়কে বিভ্রম বলে।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

ললিতা শ্রীরাধাকে বললেন—সখি! আজি যে তোমার করবীতে নীল রত্নহার অর্পণ করেছ, কুচযুগে কেশ-শোভাকর কুবলয় ঝুমকা ধারণ করেছ, অঙ্গে কাজল চর্চা করে, নয়নে কস্তুরিকা ধারণ করেছ! কৃষ্ণ অভিসারের আবেগ-আতিশয্যে তুমি কি আজ জগৎ বিস্মৃত হয়েছ?

যথা বা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে

কোন কোন গোপাঙ্গনা অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করছিল, কেউ বা অঙ্গমার্জনা করছিল, কেউ নয়নে অঞ্জন-রেখা অঙ্কিত করছিল; এমন সময় হঠাৎ কৃষ্ণের বাঁশী শুনে, তারা সব কাজ পরিত্যাগ করে ছুটলো সেই পথে। অতিমাত্র ব্যস্ততায় তাদের বসন-ভূষণের স্থান বিপর্যয় ঘটলো। ৭০।

প্রিয়তমের প্রতি অতিশয় বামা বা পরাঙ্মুখী হয়ে, তাঁর সমাদর প্রত্যাখ্যান করাকেও বিভ্রম বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ আদরের সঙ্গে শ্রীরাধার বেশ-বিন্যাসে যত্নশীল হলে, শ্রীরাধা অভিমান ভরে বামা হয়ে বললেন—

'আমার কবরী বান্ধিতে তোমারে কে সেধেছে বারবার।
গলিত চিকুরে মোর বড় সুখ, তুমি কেন বান্ধ আর॥
কেন বা আমার বদন মাজিয়া দূর কর শ্রম জল।
ঘরম হইলে মোর বড় সুখ তনুতে বাড়ায় বল॥
কেশের উপরে মালতী না দেহ আমারে লাগয়ে ভার।
অঙ্গ আভরণ না পরাহ পুনঃ মানা করি বারবার॥'

কিলকিঞ্চিত

হর্ষের আধিক্য হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি মানসিক অবস্থার এককালীন উদ্ভবের নাম 'কিলকিঞ্চিত' ভাব। ৭১।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—বন্ধু! আমি উল্লাসভরে, প্রিয় সহচরী-দের সামনে, শ্রীরাধার পুষ্পকলিকাসম কুচযুগে বলপূর্বক হস্তক্ষেপণ করেছিলাম। তার জন্য তিনি সপুলকে, ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে, ক্রোধভরে স্তব্ধ হয়ে গর্বের সঙ্গে তির্যক্‌ভাবে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। রোদনও করেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে তাঁর মুখে হাসিও ফুটে উঠেছিল। ফলে শ্রীমতীর মুখপদ্ম এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। শ্রীরাধার সেই কান্নাহাসি,মিশ্রিত সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ আমার স্মৃতি-পথে বারবার উদিত হচ্ছে।

এখানে শ্রীরাধার এই ভাবকে 'কিলকিঞ্চিত' বলা যায়। কেন না, এখানে একসঙ্গে ওই সাতটি ভাব তাঁর মধ্যে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। ৭২।

যথা বা—দানকেলিকৌমুদীতে

কেবল অঙ্গস্পর্শ প্রভৃতি কার্যের দ্বারাই যে নায়িকার কিলকিঞ্চিত ভাবের উদয় হয়, তা নয়। পথরোধ প্রভৃতি কার্যের দ্বারাও কিলকিঞ্চিত ভাব সঞ্চারিত হয়।

যথা—

একদিন শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটে বসে ছিলেন। এমন সময় শ্রীরাধা দধি বিক্রয়ের জন্য সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ শুল্ক আদায়ের ছলে, তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধার চোখদুটি চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নেত্রপল্লব সজল হলো ও প্রান্তভাগ রোষে রক্তিমাভ হয়ে উঠলো। আঁখিতারা উন্নত হলো, কিন্তু সেই সঙ্গে রসিকতায় উৎসিক্ত নয়নাগ্র কুঞ্চিত ও কুটিল এবং দৃষ্টি উদগ্র হয়ে উঠলো। শ্রীরাধার সেই নয়ন তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। এখানে হাস্য, রোদন, ক্রোধ, রসিকতা-উৎসিক্ত অভিলাষ, ভয়, গর্ব, এবং অসূয়া—এই সাতটি ভাব শ্রীমতীর মধ্যে প্রকাশিত হলো।

মোট্টায়িত

কান্তের কথা স্মরণ করে, এবং তাঁর বার্তাদি শুনে, নায়িকার হৃদয়ে তাঁর জন্য রতিভাবের যে অভিলাষ সঞ্চারিত হয়, তাকে মোট্টায়িত বলে।

যথা—

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

'সখিগণ বারে বারে জিজ্ঞাসা করিল তারে কেন এত দুঃখ তোর মনে।
পালী উত্তর নাহি দিল, সখিগণ যুক্তি কৈল তুয়া বাতা কহে সেই স্থানে॥
শুনিয়া পাইল সুখ প্রফুল্ল হইল মুখ পুলকে পূরিল সব অঙ্গ।
সখীরা চতুরা বড় অনুমানে কৈল দৃঢ় জানিতে তোমার এই রঙ্গ॥'

হে পীতাম্বর! সখীরা বারংবার পালীকে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে কোনো কথাই বলেনি। কিন্তু তোমার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে সখীরা যখন চাতুর্যের সঙ্গে শুধু তোমার কথাই বলতে আরম্ভ করেছিল, তখন আনন্দে সে এমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল যে, ফুল্ল কদম্বপুষ্পও বিড়ম্বিত হয়েছিল।

কুট্টমিত

দয়িত যদি নায়িকার স্তন বা অধর গ্রহণ (স্পর্শ ও চুম্বন) করে, তা হলে নায়িকার হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারিত হলেও, সম্ভ্রমবশতঃ সে বাহ্যিক ক্রোধ প্রকাশ করে। নায়িকার এই ভাবকে পণ্ডিতেরা কুট্টমিত বলে অভিহিত করেছেন।

যথা—

নায়িকার উক্তি—

'কি কর কি কর দূরে নেহ কর কবরী গলিত হল।
কিবা উপহাস ছাড় মোর বাস নীবির বাঁধন গেল॥
চঞ্চল না হয়া ছাড়ি দেহ মোরে তোমার চরণে পড়ি।
বাহ নিরদয় নিবার হয়া, খানিক শয়ন করি॥'

পুনরায় সম্ভোগ-উদ্যত মাধবকে শ্রীরাধা বললেন—কি আশ্চর্য! এ কি আরম্ভ করলে তুমি? হাত সরিয়ে নাও। আর হেসো না; আমার চুল এলিয়ে পড়লো, কাপড় খুলে গেল। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় একটু ঘুমোতে দাও। ৭৩।

যথা বা—

ভুজবন্ধনে শ্রীরাধার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে মাধব বললেন—প্রিয়ে! অমন করে ভ্রূলতা কুটিল ক'রো না, আমার হাত ঠেলে দূরে সরিয়ে দিও না। পুলক-শিহরিত মুখকমল অবরুদ্ধ ক'রো না। হে সুন্দরি! পরিতৃপ্ত কর। তোমার ওই বান্ধুলি ফুলের মত মধুর অধরের মধুপান করে এই মধুসূদন প্রীত হোক। ৭৪।

বিব্বোক

গর্ব ও মান ভরে ইষ্টবস্তুকে অনাদরে প্রত্যাখান করাকে বিব্বোক বলে।

নায়িকা অনেক সময় অত্যন্ত কাম্য ও বাঞ্ছিত বস্তুকেও গর্বে বা অভিমানে অনাদর করে থাকে।

পুষ্পচয়নরতা রূপমঞ্জরী বকুলমালাকে লক্ষ্য ক'রে বললে—

'অনেক বিনয় করি বনমালা দিল হরি নৈল শ্যামা হস্ত প্রসারিয়া।
মনের প্রিয়তম মালা তথাপি করিঞা হেলা ফেলি দিল বিপক্ষ দেখাঞা॥'

এখানে নায়িকার বিব্বোক গর্ব হেতু। কিন্তু মানের জন্যও ঠিক এমনি বিব্বোক সম্ভব।

'বিনয় করিল হরি তারে তুমি মান করি আসিতে না দিলে এই স্থানে।
যে শুক পড়িতে পারে গোবিন্দের নাম করে, তারে তুমি পড়াইছ কেনে॥'

কলহান্তরিতা গৌরীকে তার সখী বলেছিল—হরি তোমায় তুষ্ট করবার জন্য অনেক চাটুবাক্য বলেছিলেন। তখন তুমি মান ভরে তাঁর সেই প্রিয়বাক্যে কর্ণপাত করোনি, অনাদর করেছিলে। কিন্তু এখন সুশিক্ষিতা শারীকে নিজে আবার পড়াতে বসলে

কেন? দয়িতের যে-নাম সে জানে, সেই নাম তাকে আবার কেন শিক্ষা দিচ্ছ।

দয়িতকে অভিমানে প্রত্যাখ্যান করে, পরে নায়িকা আবার পাখীকে শিক্ষা দিবার ছলে সেই দয়িতের নাম নিজে বারবার উচ্চারণ ক'রে প্রণয়ের অনুভূতি ব্যক্ত করছে।

'যারে তুমি মান ভরে করেছিলে হেলা।
তারি লাগি কান্দ কেনে বসি সারা বেলা॥'

ললিত

অঙ্গাদির বিন্যাসভঙ্গি, সৌকুমার্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মাধুর্য প্রকাশকে ললিত বলে। ৭৫।

কুঞ্জকাননে ভ্রমণরতা শ্রীরাধাকে দেখে কৃষ্ণ বলেছিলেন—

'বৃন্দাবনে লতা যত ফুলে ফলে বিকশিত ভ্রূভঙ্গিতে তার পানে চায়।
ও পদপঙ্কজরাজে চলি যায় বনমাঝে অঙ্গ গন্ধে মধুকর ধায়॥
মুখপদ্মে অলি ধায় করপদ্মে বারে তায় এইমত বনে চলি যায়।
যেন বৃন্দাবনদ্যুতি হয়া স্বয়ং মূর্তিমতী তরুলতা দেখিয়া বেড়ায়॥'

কন্দর্পকে পুষ্পধন্বা এবং তাঁর বাণকে পুষ্পবাণ বলা হয়। তাই লতাগুলিকে কবি 'অনঙ্গবাণ-জননী' বিশেষণে ভূষিত করেছেন। চলমতী নায়িকার চরণদ্বয়কে 'সোল্লাস-পদপঙ্কজ' বলে অভিহিত করেছেন। চিত্তহারিণী নায়িকার চরণের গতিচ্ছন্দে নায়কের চিত্তে উল্লাস সঞ্চারিত হয়। নয়নভঙ্গিতে মাধুর্য প্রকাশিত হয়। এগুলি নায়িকার 'ললিত' গুণ। এই ললিত গুণ ও চমৎকারিত্ব নায়ককে মুগ্ধ করে। ৭৬।

বিকৃত

লজ্জা, মান ও ঈর্ষাদি দ্বারা যেখানে মনের কথা বা বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু চেষ্টা বা উক্ত মানসিক ভাবের দৈহিক

লক্ষণ প্রকাশে মনোগত ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাকে বিকৃতি বা বিকৃত ভাব বলা হয়।

লজ্জাজনিত বিকৃতি

যথা—

স্থবল শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—মাধব! আমি তোমার প্রার্থনা শ্রীমতীকে জানিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম যে, মধুসূদনের অনুরোধ, তুমি গোবর্ধন গিরিকন্দরে তাঁর নির্মিত আশ্চর্য চিত্র দর্শনের জন্য যেও। সুন্দরী সে কথা শুনে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু তাঁর কপোলে আনন্দের উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠলো। ৭৭।

'তোমার বচন বাণী মোর মুখে শুনি ধনি বাক্য অভিনন্দন না কৈল।
অঙ্গেতে পুলক সারি দেখা দিল থরি থরি, অনুমতি তাহাতে জানিল॥'

যথা বা—

শ্রীরাধার কথা প্রসঙ্গে বিশাখা ললিতাকে বললে—সখি! আজ আমি শ্রীমতীকে বললাম, 'হে বরাক্ষি! তুমি সাধ্বী কুলবালা, পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তোমার উচিত নয়। আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও।' পথিমধ্যে নর্মচ্ছলে তাঁকে এই কথা বলেছিলাম। শুনে, রাধিকা নতুন ক'রে কৃষ্ণের মুখদর্শনের জন্য কাতর হয়ে, আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

মানহেতু বিকৃতি

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—

'কি কর কুটিল প্রেমা মান কৈল সত্যভামা হেনকালে চান্দের গ্রহণ।
আমি ত আসক্ত চিতে গেলাম তারে প্রসাদিতে চন্দ্রগ্রহণ হৈয়া বিস্মরণ॥
আমার বিনয় শুনি এক ইন্দ্রনীলমণি নিজ মুখচন্দ্রেতে ধরিল।
চন্দ্রগ্রহ নিরখিয়া স্নানদান কর গিয়া, ইহা ছলে মনে পড়াইল॥'

উপরাগ বা গ্রহণের কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সত্যভামা কথা বলেনি, বা 'মান' পরিত্যাগ করেনি; নিজের মুখ

চন্দ্রের উপর হাতের ইন্দ্রনীলমণি স্থাপন ক'রে জানিয়ে দিয়েছিল যে, চন্দ্রে কৃষ্ণছায়া পড়েছে অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। সে অবস্থায় স্নানদান ইত্যাদি সৎকার্যে মন দেওয়াই ভালো। ৭৮।

এখানে নিজের মান ভঙ্গ ক'রে কথা না বললেও, নায়িকা তার বিবক্ষা বা বক্তব্য বিষয় লক্ষণা দ্বারা নায়ককে জানিয়ে দিল।

ঈর্ষাহেতু বিকৃতি

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—সখা, যমুনাতীরে শ্রীরাধা বিহার করছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'তুমি আমার বাঁশী চুরি করেছ। কল্যাণি! দয়া ক'রে আমার বাঁশীটি আমায় দাও।'

শুনে, শ্রীরাধা ঈর্ষান্বিতা হয়ে, ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে লাগলেন।

এখানে বিবক্ষা, 'আচ্ছা দেখে নেব : এই অপবাদের প্রতিশোধ নেব।' তিনি মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর বক্তব্য বিষয় দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হলো।

এই যে বিংশতি প্রকার আঙ্গিক এবং চিত্তজ বা মানসিক অলঙ্কারের কথা বলা হলো, সেগুলি নায়িকাদের সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য তেমনি মাধব সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অন্যান্য মনীষিরা আরো অনেক রকম অলঙ্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু সেগুলি ভরতমুনিস্বীকৃত নয় ব'লে, তন্মধ্যে শুধু 'মৌগ্ধ্য' ও 'চকিত' সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। কেন-না, এই দুটি অলঙ্কারের কারকতা মাধুর্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে।

মৌগ্ধ্য বা মুগ্ধতা

প্রিয়জনের নিকট জানা জিনিস সম্পর্কেও অজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করাকে মৌগ্ধ্য বলে (Pretension of ignorance)।

যথা—মুক্তাচরিতে

সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রিয়তম! আমার কঙ্কণে যে মুক্তাফলগুলি আছে, সেগুলি কোন্ লতার ফল? সে লতা কোথায় আছে? কে রোপন করেছে?

মুক্তা যে কোন বৃক্ষের বা লতার ফল নয়, তা সত্যভামা জানেন। তবুও দয়িতের কাছে এই ধরণের প্রশ্ন করায় সত্যভামার মাধুর্য যেন নায়কের চোখে কিছুটা বর্ধিত হলো। এইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা জানালে স্বতঃই নায়কের মনে হয় যে, নায়িকা একমাত্র দয়িত ভিন্ন আর কোনকিছুই জানেন না। এই কৃত্রিম অজ্ঞতায় নায়িকার সরলতা ও দয়িতের প্রতি প্রণয়মুগ্ধতা প্রকাশ পায়। দয়িতও মুগ্ধ হন নায়িকার এই সারল্য ও অনন্যমানসিকতা দেখে।

চকিত

যে জিনিস দেখে ভয় করবার কোনো কারণ নাই, সেই জিনিস দেখে বা তার কথা শুনে, প্রিয়তমের সামনে গুরুতর ভয় প্রকাশকে চকিত বলে। ৭৯।

যথা—

দয়িত সন্নিকটে থাকা কালে, নায়িকা একটি উড়ন্ত মধুমক্ষিকা দেখে চকিতা হরিণীর মত ভীতিচঞ্চলা হয়ে বলে উঠলো—'আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। ওই দেখ, আমার কানে চাঁপার ফুল দেখে মৌমাছিটা মধুপান করবার লোভে ছুটে আসছে।'

এইভাবে অকারণ অত্যন্ত ভীতিচঞ্চলা হয়ে হরিণনয়না হরিকে জড়িয়ে ধরলো।

নায়িকার এই প্রকার আচরণে প্রণয়ের পুষ্টি সাধিত হয়।

'ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর ওই দুষ্ট মধুকর উড়ি বৈসে আমার বদনে।
এই বাক্য কহি রাধা যেন ঘুচাইল বাধা, আলিঙ্গয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥'

ইতি অলঙ্কার বিবৃতি

উদ্ভাস্বর প্রকরণ

স্বস্থানে অবস্থানকালেও নায়িকার মনের যে ভাব দেহে প্রকাশ পায়,তাকে উদ্ভাস্বর বলে।

নীবিবন্ধন খসে পড়া, উত্তরীয় অঙ্গচ্যুত হওয়া, কবরী এলিয়ে যাওয়া, গা ভাঙ্গা (আঙুল মটকানো ইত্যাদি), জৃম্ভণ বা হাই তোলা, আঘ্রাণের উল্লাস বা প্রফুল্লতা এবং গভীর নিঃশ্বাস ইত্যাদি উদ্ভাস্বর। ৮০।

নীবি স্রংসন

যথা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীরাধাকে বৃন্দা বললেন—

'তোমার যে দুনয়ন অশ্রুজলে নিরঞ্জন কুচযুগ নহে আর রাগী।
স্ফুরে তোমার বক্ষস্থল হবে তার মঙ্গল অচিরে হইবে কৃষ্ণ ভোগী॥
সবাকার ধর্ম্মে মন তাহা করি দরশন নীবি বলে আমি মোক্ষ লব।
সাক্ষাত কৃষ্ণের কাছে মোক্ষ হবে অনায়াসে তাহা আজি কেবা নিবারিব॥'

রাধে। তোমার নীবিবন্ধন যে শ্লথ হলো। আশঙ্কা হয় যে, অচিরাৎ তার মুক্তি হবে অর্থাৎ বন্ধন খুলে পড়বে। ৮১।

উত্তরীয় স্রংসন

কৃষ্ণকে দেখে শ্রীরাধার উত্তরীয় স্খলিত হয়ে পড়ছিল। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করে বললেন—

'তুয়া হৃদি যত রাগ বস্ত্রে তার একভাগ ইহা মোরে স্পষ্ট দেখাইতে।
তোমার হৃদয় বস্ত্র ভূমিতে পড়িল ত্রস্ত, যতন না কর আচ্ছাদিতে॥'

আমার অনুরাগের চেয়েও গরীয়ান্ কোন গভীর রাগ তোমার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত; তাই দেখছি অপসৃত বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে। মঞ্জিষ্ঠা লতার রক্তিমরাগে রঞ্জিত তোমার উত্তরীয় স্থানচ্যুত হয়ে

আমার সম্মুখে তোমার বক্ষস্থলকে আজ প্রকাশিত করেছে। উত্তরীয়ের রক্তিমরাগের চেয়েও তোমার হৃদিতট অধিক রক্তিম।

ধম্মিল্ল স্রংসন

দয়িতকে দেখে নায়িকার কবরী শিথিল হয়ে পড়ে। এই আলুথালু বেশ ও তনুভাব নায়কের চিত্তে সম্ভোগ-স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, শ্রীমতীর কেশপাশ হঠাৎ কবরী ভ্রষ্ট হয়ে এলিয়ে পড়লো। তাই দেখে বৃন্দা বললেন—গৌরি! তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন। যাঁকে দেখে দুরাত্মারও ভববন্ধন থেকে মুক্তি হয়, তাঁর দরশনে যে তোমার সংযত কেশপাশ বন্ধনমুক্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? । ৮২।

গাত্রমোটন বা অঙ্গভঙ্গ

ব্রজভূমিতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দেখে কুরঙ্গীনয়না ব্রজাঙ্গনারা যে অঙ্গভঙ্গ বা গা আড়া-মোড়া দিয়েছেন, তার অনঙ্গভঙ্গি কন্দর্প তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

নায়িকার অঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ গা আড়া-মোড়া দেওয়া বা আঙ্গুল ফোটানো ইত্যাদি নায়কের মনে অনঙ্গ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ৮৩।

জৃম্ভা

নায়িকার জৃম্ভণ নায়কের মনে তার নিদ্রাবেশ অর্থাৎ শয্যা গ্রহণের সংকেত সূচিত করে। নায়িকা যদি নায়কের সামনে বারবার জৃম্ভণ করে বা হাই তোলে, নায়কের চিত্তে সম্ভোগ লিপ্সা সঞ্চারিত হয়। জৃম্ভণের দ্বারা নায়িকারও মদনাবেগ প্রকাশ পায়।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলেছিলেন—প্রিয়ে! তুমি অতি সাধ্বী। মদন তোমায় পুষ্পবাণের দ্বারা বশীভূত করতে পারেননি! তাই তিনি জৃম্ভণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন তোমায় বশীভূত করবার জন্য। নইলে এই গোষ্ঠসীমায় এসে বারবার তোমার জৃম্ভা হবে কেন?। ৮৪।

ঘ্রাণের প্রফুল্লতা

ঘ্রাণের প্রফুল্লতায় যখন নাসাপুট আন্দোলিত হয়, তখন নায়িকার মূর্তি নায়কের চোখে মাদকতার সৃষ্টি করে। ঘ্রাণের প্রফুল্লতায় নিঃশ্বাস ঘন ও নাসাপুট কম্পিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেছিলেন—সখা, ওই পদ্মলোচনা শ্রীরাধার নাসাপুটে যে গজমুক্তার বেশর আছে, সে বেশর ঘ্রাণ প্রফুল্লিত ঘন নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হওয়ায়, এক অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই রূপ দেখা অবধি শ্রীমতী যেন আমার মনে বিলগ্না হয়ে আছেন, মুহূর্তের জন্যও মন থেকে সরাতে পারছি না।

'নাসার নিঃশ্বাসে বেশর দুলিল দুই পুট বিকশিত।
এমন নাসার বিলাস করিঞা রাই হরি নিল চিত॥'

যে সব উদাহরণ দেওয়া হলো, সেগুলি যদিও মোট্টায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত, তবুও শোভার বিশেষ বিবৃতির জন্য পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হলো।

বাচিক

আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, ব্যপদেশ ও বাক্যের পরিপাটী বা নৈপুণ্য ইত্যাদির জন্য মনীষিগণ বাচিক শোভাকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১—আলাপ

চাটু ও প্রিয়-উক্তির নাম আলাপ। ৮৫।

যথা—

ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন :

'হেন কে রমণীমণি তোমার মুরলী শুনি নাহি ছাড়ে কুলধর্ম ভয়।
তুয়া রূপ মনোরম ত্রিজগতে অনুপম ইহা দেখি কেবা ঘরে রয়॥
ওহে নাথ, তুমি না করিহ উপেক্ষণ।
তোমার এরূপ দেখি বুঝে সবে পশুপাখী পুলকিত হয় তরুগণ॥'

হে গোবিন্দ! তোমার এই ত্রিলোক-মনোমুগ্ধকর রূপ দেখে কে না সম্মোহিত হয়! কোন স্ত্রী তার আর্য চরিত্র থেকে বিচলিতা না হয়! বনের হরিণ, পশুপক্ষী এবং বৃক্ষলতাও তোমার এই রূপ দর্শনে পুলকিত হয়ে ওঠে।

নায়িকার প্রতি নায়কের চাটু ও প্রিয়োক্তি :

যথা বা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাধে! তুমি কঠোরাই হও বা মৃদ্বীই হও, তুমিই আমার প্রাণ। চাঁদ ভিন্ন যেমন চকোরের কোনো গতি নাই, তেমনি রাধা ভিন্ন কৃষ্ণেরও কোনো গতি নাই।

২—বিলাপ

দুঃখজনিত বাক্যের নাম বিলাপ।

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে

উদ্ধবকে গোপাঙ্গনারা বলেছিল—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নাই, তাই আমরা এত আকুল হয়েছি। আমাদের পক্ষে নৈরাশ্যই ভালো। স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলেছে, নৈরাশ্যই পরম সুখ। আমরা যদিও সে কথা জানি, তবুও কৃষ্ণের জন্য আমাদের আশা দুরতিক্রম্য; কোনমতেই সে আশা দমন করতে পারছি না।

'প্রত্যাশা পরম দুঃখ নৈরাশ্য পরম সুখ এই বাক্য কয়াছে পিঙ্গলা।
তথাপি কৃষ্ণের আশ কভু নাহি হয় নাশ এই মোর মনে বড় জ্বালা॥'

৩—সংলাপ

উক্তি ও প্রত্যুক্তিবিশিষ্ট যে সব বাক্য, তাকে সংলাপ বলে (Dialogue)। ৮৬।

যথা—পদ্যাবলীতে

মানস গঙ্গায় নৌকাকেলি-বিশারদ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার উত্তর প্রত্যুত্তর।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে তরুণি! এসো, আমার তরণীতে আরোহণ করো।

উত্তরে শ্রীরাধা বললেন—হে বিনোদ! রবিতে আমার প্রীতি নাই। সূর্যের উত্তাপ আমি সহ্য করতে পারি না।

তরণী দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ বললেন নৌকায় উঠবার কথা। শ্রীরাধা উত্তর দিলেন অন্য অর্থে। তরণি বা তরণী শব্দের ভিন্ন অর্থ সূর্য বা সূর্যকিরণ। শ্রীমতী কৌতুকচ্ছলে বললেন যে, রবি বা রৌদ্রের প্রতি তাঁর প্রীতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন—না না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি নৌ।

শ্রীমতী আবার সহাস্যবদনে বললেন—ও, নৌ!—'মম মে, আবায়ো নৌ।' আমাদের দুজনের? কই! দুজনের আরোহণ অবরোহণের প্রস্তাব তো কিছু ছিল না।

অজেয় শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাক্যচাতুরীতে পরাজিত হয়ে, মৃদু হাস্য করলেন। তিনি 'নৌ' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন নৌকা অর্থে।

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে এই ধরণের সংলাপে রসসৃষ্টি হয় এবং প্রণয়ের ঘনত্ব বাড়ে।

৪—প্রলাপ

ব্যর্থ বা অর্থহীন আলাপের নাম প্রলাপ।

যথা—

মধুপানে উন্মত্তা শ্রীরাধা বললেন—মাধব! তোমার মুরলীর মনোহর ধ্বনিতে গোপাঙ্গনাদের হৃদয় মথিত হচ্ছে। তাই ললিতা ব্যথিত চিত্তে তোমার ভজনা করতে আরম্ভ করেছে। তোমার মুরলী যে 'রলী রলী···লিতা লিতা' ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করছে।

মুরলীর 'রলী-রলী—লিতা-লিতা' শব্দ নিতান্ত অর্থহীন। তবুও

আবেগভরে শ্রীরাধা মাধবের কাছে সেই কথা বলে মুগ্ধ অনুভূতি প্রকাশ করছেন।

৫—অনুলাপ

একই উদ্দেশ্যে বারবার কোন কথা বলার নাম অনুলাপ। ৮৭।

যথা—

একটি তমালশিশুর পাশে বান্ধুলী ও স্থলপদ্মের ফুল দেখে, শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সখি! ও দুটি কি নেত্র? নেত্র! না—না, পদ্ম! পদ্ম! ও কি গুঞ্জা? গুঞ্জা! গুঞ্জা, না বান্ধুলী ফুল? ও কি বেণু—বেণু? না ভ্রমরের গুঞ্জন! ওকি কৃষ্ণ? না তমাল!

৬—অপলাপ

পূর্বে কথিত বাক্যের অন্যরূপ যোজনার নাম অপলাপ।

যথা—

কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন—সখি! প্রফুল্ল উজ্জ্বল বনপুষ্প-শোভিত মাধবকে কোন্ প্রমদা অঙ্গনা কামনা না করে?

শ্রীমতীর কথা শুনে, বিশাখা বললে—প্রিয় সখি! তুমি কি তবে কৃষ্ণের জন্য উৎসুক হয়েছ? স্পৃহা জেগেছে তোমার মনে?

শ্রীরাধা বললেন—না না, সখি। আমি তা বলছি না। আমি বলছি, প্রফুল্ল বনপুষ্প-শোভিত মধুমাসের বা বসন্ত ঋতুর কথা।

৭—সন্দেশ

প্রবাসস্থিত কান্তের নিকট যে বার্তা প্রেরণ করা হয়, তাকে সন্দেশ বলে। ৮৮।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, পদ্মা কোন পথিককে সম্বোধন করে বলেছিল—হে পান্থ! মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণকে ব'লো, কোকিলের কুহুরবে বিকলিতা চন্দ্রাবলী এখন কোথায় লীনা হবে? কার হৃদয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে নিজেকে বিলীন করবে?

৮—অতিদেশ

যখন অন্যের কথা হিসাবেই নিজের কথা জানানো হয় (অর্থাৎ তার কথাই আমার কথা) তখন তাকে অতিদেশ বলা হয়। ৮৯।

যথা—

শ্রীরাধা মানিনী হলে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মান ভাঙাবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন, এবং প্রণিপাতাদি দ্বারা তাঁর প্রসাদ ভিক্ষায় উদ্যত হয়েছিলেন, তখন ললিতা বলেছিল—হে কৃষ্ণ। তুমি কেন রাধাকে প্রণাম করছো? শীঘ্র এখান থেকে দূর হয়ে যাও। একথা গান্ধর্বিকারই অন্তরের কথা। ললিতা শুধু বীণা যন্ত্রের মত সেই যন্ত্রীর কথাই ঝংকৃত করেছে। ৯০।

'যে কথা কহিলাম আমি সন্দেহ না কর তুমি এই বাক্য রাধিকার হয়।
আমি যন্ত্র ত্রিতন্ত্রী রাধা তাথে হয় যন্ত্রী ইহাতে নাহিক বিপর্যয়॥'

৯—অপদেশ

বক্তব্য বিষয়ের অন্য অর্থ কল্পনাকে অপদেশ বলে। ৯১।

যথা—

নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বললে—

'দাড়িম তরু উজ্জ্বল ধরিয়াছে দুই ফল তাথে রেখা আছে বহুতর।
দুই পুষ্প বিকশিত তাহাতে করেছে ক্ষত বড়ই নিষ্ঠুর মধুকর॥
সম্মুখেতে গুরুজন হঞা তাই অন্যমন শ্যামা শুনি সখীর বচন।
চমকিত হয়্যা ধনী অধরে ধরিল পাণি বসনে আচ্ছাদে দুই স্তন॥'

উজ্জ্বল দুটি নব দাড়িম্বফলকে শুকপক্ষী চঞ্চুদ্বারা বিক্ষত করেছে বা ভৃঙ্গ দুটি রক্তবর্ণ পুষ্পের মধুপান করেছিল ব'লে, পুষ্পদুটি ব্রণ চিহ্নিত হয়েছে—এই কথা গুরুজনদের সম্মুখে নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলেছিল। সেই কথা শুনে, শ্যামলা বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বক্ষোদেশ আবৃত করেছিল এবং ওষ্ঠদুটি হাত দিয়ে ঢেকেছিল। ৯২।

যে সহজ উল্লেখে কথাগুলি বলা হলো, ঠিক সেই অর্থে গৃহীত না হয়ে, অন্য অর্থে গৃহীত হলো। রক্তবর্ণ পুষ্প বলতে, ওষ্ঠদুটি আবৃত হলো; এবং দাড়িম্বফলের কথা উল্লেখ করতেই, বক্ষোদেশ বস্ত্রাবৃত হলো।

১০—উপদেশ

শিক্ষা দিবার জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে উপদেশ বলে।

যথা—

মানিনী শ্রীরাধাকে তুঙ্গবিদ্যা বলেছিল—

'যৌবন সে চঞ্চল সদা করে টলমল বড়ই দুষ্প্রাপ্য বনমালি।'
তুরিতে চলহ বনে দেখা হবে হরি সনে মনের আনন্দে কর কেলি॥'

যৌবন অতি চঞ্চল। তার সম্পদ লোলবিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী। ত্রিলোকের মধ্যে অদ্ভুত রূপবান্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মত নায়ক অতি দুর্লভ। অতএব হে মুগ্ধে! তুমি সুযোগ ত্যাগ ক'রো না। বৃন্দাবনের ভ্রমরগুঞ্জিত কুঞ্জে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বচ্ছন্দে কেলি করো।

১১—নির্দেশ

যখন নির্দিষ্টভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ ক'রে কিছু বলা হয়, তখন তাকে নির্দেশ বলে।

বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বললে—

'সেই রাধা বিধুমুখী সেই এ ললিতা সখী সেই আমি বিশাখা সুন্দরী।
মোরা তিন সখী মিলি গহনে কুসুম তুলি এথা কেন এলে তুমি হরি॥'

১২—ব্যপদেশ

অন্য প্রসঙ্গে বা ছলে যখন নিজের অভিলাষ বা মনোগত ভাব প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে ব্যপদেশ বলা হয়।

যথা-

শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষ কোন গোপাঙ্গনার সঙ্গে প্রমোদ আলাপে রত ছিলেন। তাই দেখে, মালতীর সখী ভ্রমরকে সম্বোধন ক'রে বললে—

'নূতন পল্লবে হলো বিকশিত মালতী গহন বনে।
তুম্বীর চুম্বনে ভ্রমর রসিক ইহার কি সব জানে॥'

হে মধুপ! দেখ, কাম্যবনে মালতী পুষ্পের স্তবক প্রস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু তুমি কেন সেই মালতী-স্তবক ত্যাগ ক'রে লাউবনে মধুর সন্ধান করে বেড়াচ্ছ? তুমি ভ্রমর, তোমায় আর কি বলবো!

উল্লিখিত বাচিক অনুভাব সকল রসেই সম্ভব। কিন্তু সেগুলি মাধুর্যরসের পক্ষেই অধিক প্রযোজ্য ও পরিপোষক। সেই জন্য সেগুলি শুধু মাধুর্যরস প্রসঙ্গেই আলোচিত হলো।

ইতি অনুভাব প্রকরণ

সাত্ত্বিক প্রকরণ

সাত্ত্বিক ভাব

সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ভাবের দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। চিত্তের এই অবস্থা থেকে উৎপন্ন ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়।—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

হর্ষাদিহেতু স্তম্ভিত ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়।

হর্ষহেতু স্তম্ভ— যথা দানকেলি কৌমুদীতে। ১।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, রাধিকার অঙ্গে স্বেদবিন্দু ক্ষরিত হয়ে তাঁর বক্ষস্থ স্বর্ণপদক সিক্ত হয়ে উঠলো। দেহ নিস্পন্দ হলো। নয়ন নিমীলিত হয়ে এলো। আশ্চর্যের বিষয়, আরও পাঁচজন সখী থাকা সত্ত্বেও, শ্রীমতী পুত্তলিকার মত নিশ্চল হয়ে গেলেন। ২।

এখানে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখে হর্ষহেতু স্তম্ভিতা হয়ে, শ্রীমতী পুত্তলিকার ধর্ম প্রাপ্ত হলেন।

ভয়হেতু স্তম্ভ

শ্রীরাধাকে দূর থেকে দেখে, নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বললে— 'দেবি! ওই দেখ, মেঘের গর্জন শুনে চকিতা হয়ে, ঘনস্তনী ব্রজাঙ্গনা নিশ্চলাঙ্গিনী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরেছেন।

দ্বৈধ ভাবের উৎপত্তি হেতু এই অবস্থা প্রাপ্তির নাম দিগ্ধ। ৩।

আশ্চর্যহেতু স্তম্ভ

শ্রীকৃষ্ণের অনুপম সৌন্দর্য দেখে, শ্রীরাধা অত্যন্ত চমৎকৃতা হয়ে স্তম্ভিতা হন। এ অবস্থায় তাঁর চোখে পলক পড়ে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিশ্চল হয়ে আসে। শ্রীমতীর এই অবস্থা দেখে, মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বললে—

'তোমার মাধুরী ধাম ত্রিজগতে অনুপম তাহা আজি রাধিকা দেখিয়া।
মনে হইল চমৎকার নিমেষ নাহিক আর স্তব্ধ হয়্যা আছে দাঁড়াইয়া॥'

বিষাদহেতু স্তম্ভ

পদ্মপলাশলোচনের বিলম্ব দেখে, চিত্রার মনে শঙ্কা হলো যে নিশ্চয়ই বিপ্রলম্ভ—প্রতারণা। কই, সংকেত স্থানে তো তিনি এলেন না! মনে বিষাদের সঞ্চার হলো। সংকেত গৃহের দ্বার দেশে চিত্রার্পিতার মত নিশ্চল হয়ে চিত্রা দাঁড়িয়ে রইল। ৪।

অমর্ষ বা ক্রোধহেতু স্তম্ভ

নিশীথে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভকালে শ্যামলা হঠাৎ তাঁর মুখে অন্য নায়িকার নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে, ক্রোধ ও অভিমানে স্তম্ভিতা হয়েছিল। তার চোখে আর পলক ছিল না। দেহকান্তি লুপ্ত হয়ে গেল। ৫।

স্বেদ

হর্ষহেতু স্বেদ

বিষ্ণু পুরাণে : পরাশর মৈত্রেয়কে বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাহু দুটি গোপাঙ্গনার কণ্ঠে বেষ্টিত হওয়ায় পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। হর্ষহেতু স্বেদাক্ত সেই ভুজদ্বয় দেখে মনে হচ্ছিল, যেন স্বেদাম্বুবর্ষণকারী মেঘ। ৬।

যথা—বা

শ্রীকৃষ্ণকে ললিতা বললেন—

'রাধিকার দেহলতা চন্দ্রকান্ত বিরচিতা, বুঝিলাম তাহার অন্তর।
চন্দ্রের উদয় হেরি তারা রহে নৃত্য করি, স্বেদ ছলে গলে কলেবর॥'

ভয়হেতু স্বেদ

লতাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিলাসকালে, বিশাখা হঠাৎ তার পতির আগমন আশঙ্কায়, ভয়ে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে উঠলো। তার কপোলের সযত্নরচিত তিলকচিহ্ন স্বেদজলে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। ৭।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

'ভয় ছাড় কলাবতী দূরেতে তোমার পতি এই বন নিবিড় গহন।
অনেক যতন করি দিলাম অলকা সারি ঘর্মজলে হয় বিনাশন ॥'

ক্রোধহেতু স্বেদ

নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বললে—

'কৃষ্ণের স্খলিত শুনি মনে ক্রোধ কৈল ধনি লজ্জা করি কিছু না কহিল।
স্বেদ জল পড়ে গায় বসন ভিজিল তায় মনের ক্রোধ তাহাতে জানিল ॥'

রোমাঞ্চ

আশ্চর্যদর্শনে রোমাঞ্চ

রাসলীলা প্রসঙ্গে গার্গীকে পৌর্ণমাসী বললে—সখি! আশ্চর্যের কথা আর কি বলবো। রাসলীলা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যখন একসঙ্গে (যুগপৎ) মৃগনয়না গোপাঙ্গনাদের সকলকেই চুম্বন করলেন, আকাশে সুরবালাগণ রোমাঞ্চিতা হয়ে, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে ছিলেন। ৮।

হর্ষহেতু রোমাঞ্চ

শুকদেব বললেন—হে রাজন্! কোন অঙ্গনা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, স্বীয় নেত্রপথে তাঁর মোহন মূর্তি হৃদয়ে গ্রহণ করে, নয়নদুটি নিমীলিত করলেন। যোগার ন্যায় হৃদয়ে সেই মূর্তি আলিঙ্গন করে, পুলকে তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। ৯।

শ্রীমদ্ভাগবত। দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়, সপ্তম শ্লোক।

যথা বা—রুক্মিণী স্বয়ম্বরে

রুক্মিণী যখন সুনন্দ ব্রাহ্মণের মুখে সংবাদ পেলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠলেন। তাঁর মুকুলিত অঙ্গযষ্টি পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, যেন প্রতিটী লোমকুপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা দর্শনের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

ভয়হেতু রোমাঞ্চ

যথা—

'পাইয়া অঙ্গের গন্ধ আইলা ভ্রমরবৃন্দ দেখি পালী কম্পিত হইল।
অঙ্গ হইল পুলকিত মন হৈল চমকিত ব্যস্ত হয়া কৃষ্ণেরে ধরিল॥'

পালীর অঙ্গ পরিমলে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা তার মুখপদ্মের দিকে ধাবিত হলো। ভয়ে সে শিউরে উঠলো। অঙ্গযষ্টি কম্পিত হলো। বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিতা হয়ে সে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলে। তার লজ্জা সরম আর কিছু রইল না। ১০।

স্বরভেদ

বিষাদহেতু রোমাঞ্চ ও স্বরভেদ—গীতগোবিন্দে

শ্রীরাধার সখী মাধবকে বললে—হে শঠ! তুমি কেন শ্রীমতীকে দর্শন দিলে না? সেই মৃগনয়না তোমার প্রেমসাগরে নিমজ্জিতা হয়ে, কেবল তোমার চিন্তাতেই জীবন ধারণ করে আছে। বাসক-সজ্জায় কখনো বা সে তোমার সান্নিধ্য কল্পনা করে বিপুল পুলকে পরিপ্লুত হচ্ছে, কখনো বা রূঢ় বিষাদে তার অঙ্গ শিউরে উঠছে; মনোবেদনায় ব্যাকুল স্বরে অস্ফুট কণ্ঠে বিলাপ করছে।

বিস্ময়হেতু স্বরভেদ

শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সখি! অভিসারের জন্য সম্ভ্রমে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো, মুখে কথা ফুটলো না। তাই হাত ইসারায় অনেকবার তোমায় জানিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে লতাগুল্ম এমন পুলকচঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে, আমার কর-সংকেত তুমি দেখতে পাওনি। ১১।

অমর্ষ বা কোপহেতু স্বরভঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বললেন—এই বৃন্দাবনে আমার কত না প্রেয়সী লীলা করছে! কিন্তু তাদের উজ্জ্বল নর্মভঙ্গীতে আমি

তেমন পরিতৃপ্ত হই না, যেমন পরিতুষ্ট হয়েছি শ্রীমতীর রোষ তরঙ্গায়িত অধরোষ্ঠের দু'তিনটি আক্ষেপ বাক্য ও তিরস্কারে। রোষে তাঁর কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে উঠেছিল। ১২।

হর্ষহেতু স্বরভঙ্গ—রুক্মিণী স্বয়ম্বরে

রুক্মিণীকে তার সখীরা বলেছিল—সখি! কেন এত উতলা হচ্ছ? এসো, কোন ছলে আমরা আবার গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আসি।

এই কথা শুনে রুক্মিণী সখীদের তর্জনগর্জন করতে লাগলেন। হর্ষহেতু উচ্ছ্বাসে তাঁর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো। অন্তরের ভাব গোপন রইল না।

ভয়হেতু স্বরভেদ

শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বললেন—প্রথম মিলনের দিন আমি শ্রীরাধাকে বলেছিলাম, দয়া ক'রে এই তৃষ্ণার্ত মধুকরকে মধুপানের অনুমতি দাও। শুনে মদিরাক্ষী ভীতিচঞ্চলা হয়ে উঠেছিলেন, এবং গদগদ কণ্ঠে আমার শ্রুতিতটে এক আশ্চর্য নবসুধার তরঙ্গ প্রবাহিত করেছিলেন। ১৩।

বেপথু

বেপথু অর্থে কম্পন বা শিহরণ বুঝায়। ত্রাসে, হর্ষে ও অমর্ষে বা অধৈর্যে (ক্রোধে) নায়িকা বেপথুমতী হয়।

ত্রাসে বেপথু

একদিন জটিলা শ্রীমতীকে গৃহে আবদ্ধ করে রেখেছিল: অভিসারে যেতে দেয়নি। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যুবতীর বেশ ধ'রে এসে শ্রীরাধার পাশে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎ মূঢ় অভিমন্যু এসে সামনে উপস্থিত হলো। অকস্মাৎ অভিমন্যুকে

দেখে, শ্রীরাধা ত্রাসে বাত্যাহত কদলী পত্রের মত বেপথুমতী হয়ে উঠলেন। তাই দেখে, বিশাখা বললে—

'নাগর হোয়ল যুবতী আকার। মূঢ়মতি তুয়া পতি কি করু আর॥
কাহে তুহু কম্পসি কদলী সমান। দূর কর ত্রাস ধৈরয ধরু প্রাণ॥' ১৪।

হর্ষহেতু বেপথু

শ্রীমতী পুষ্পচয়ন করছিলেন। ললিতা বললে—সখি! ব্রজরাজতনয় তোমার সামনে এসে মিলিত হলেন দেখে, কম্পিতা হচ্ছ কেন? আমি চতুরা ললিতা, তোমার পাশে আছি। আতঙ্ক পরিত্যাগ কর। ১৫।

অমর্ষহেতু বেপথু

মানিনী পদ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সখি! তুমি যদি কুপিতা না হয়ে থাক, তাহলে তোমার তনু কম্পিত হচ্ছে কেন? ঝড় না উঠলে কি কখনো নির্ভরস্নিগ্ধ দীপশিখা কম্পিত হয়! ।১৬।

বৈবর্ণ্য বা পাণ্ডুরতা

বিষাদহেতু বিবর্ণতা

বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধার বিষাদম্লান মুখচ্ছবি দেখে এসে, সখী শ্রীকৃষ্ণকে বললে—

'মুখের মাধুরি দেখি কুঙ্কুম হইত দুখী সেই মুখ শুক্লবর্ণ হলো।
চান্দের উপমা তাথে দিতে ভয় করি চিতে বিধিবর তারে বিড়ম্বিল॥ ১৭॥

এইভাবে রোষ এবং ভীতির জন্যও নায়িকার মুখকান্তি বিবর্ণ ও তনু কালিমাময় হয়।

রোষহেতু বৈবর্ণ্য

যথা—

বৃন্দারণ্যে বিহারকালে মাধবের হৃদয়ে শ্রীমতীর প্রতিবিম্বই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমতীর ভ্রম হলো যে, মাধবের হৃদয়ে

অন্য কান্তার মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীমতী অভিমানিনী হয়ে উঠলেন ; রোষে তাঁর মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ হয়ে উঠলো। তাই দেখে মাধব বললেন—'সখি! এই জ্যোৎস্নাপুলকিত শরৎকালীন অর্ধরাত্রে কি কখনো অন্য চন্দ্রের উদয় সম্ভব ? হে প্রিয়ে! আশঙ্কা করো না। আমার হৃদয়ে তুমিই প্রতিবিম্বিতা হয়েছ।' ১৮।

ভয়হেতু বৈবর্ণ্য

যথা—

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বললেন—দেবি! আজ যমুনাতটে শ্রীমতী মাধবের সঙ্গে বিহার করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ পতিকে দেখে তাঁর বৈক্লব্য উপস্থিত হলো। কিন্তু আয়াণ তাঁকে চিনতে পারেনি। ১৯।

অশ্রু

হর্ষহেতু আনন্দাশ্রু

যথা – **গীতগোবিন্দে**

'রাধার নয়ান শ্রবণ নিকটে যাইতে প্রয়াস করে
বহু দূর পথ চলিয়া যাইতে শ্রম হলো কলেবরে॥
সেই শ্রমে বারি অশ্রু ছল করি পড়িছে ধরণী তলে।
নিকুঞ্জভবনে নাগরের সনে দেখা হলো সেই কালে॥'

প্রিয়তমকে দেখে শ্রীরাধা আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হলেন। তাঁর নয়নতারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে অপাঙ্গসীমা অতিক্রম করে কর্ণমূল পর্যন্ত ধাবমান হলো। সেই শ্রমেই যেন স্বেদাম্বু ক্ষরণের মত দুটি আঁখি হতে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। ২০।

নায়ক সন্দর্শনে গণ্ডদেশ প্রফুল্ল ও তনু রোমাঞ্চিত হয়ে নয়নে যে বাষ্প উদ্গত হয়, তাকেও আনন্দাশ্রু বলে। ২১।

রোষহেতু অশ্রু

খণ্ডিতা ইন্দুমুখী প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের বুকে অন্য নারীর তিলকের দাগ দেখে, মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু রোষে তাঁর দৃষ্টি কুঞ্চিত হলো। বারবার চোখের জল মুছতে লাগলেন।

ঈর্ষা হেতুও নারীর চোখে অশ্রু ঝরে। তাতে শিরঃকম্পন, দীর্ঘশ্বাস, কপোলের স্ফুর্তি এবং কটাক্ষ ও ভ্রূকুটি থাকে। খণ্ডিতা নায়িকার অশ্রুধারায় কণ্ঠহার সিক্ত হয় এবং নায়কের প্রতি সে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে।

বিষাদহেতু অশ্রু

প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধাকে বিশাখা বললে—

নয়নের জল মুছে ফেল সখি, বিষাদ রেখো না মনে।
আবার আসিবে সে নিঠুর কালা এ মধু বৃন্দাবনে॥

—হংসদূত

হে করভোরু! অশ্রুধারায় মুখচন্দ্র মলিন করো না। শ্রীকৃষ্ণ করুণার সাগর। আবার তিনি তোমার প্রতি পর্যাপ্ত করুণা বিধান করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গিয়েছিলেন, শ্রীরাধা বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিতা হয়েছিলেন। রাত্রিদিন তাঁর নয়নে শুধু অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হতো।

শ্যামল সখা বিহনে আজ কুঞ্জভবন অন্ধকার,
কোমল হিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সইতে নারে দুঃখভার।
সেই বিরহ সাগরতলে ডুবলো সারা পরাণমন।
ঘূর্ণীঘন ব্যথার চাপে অশ্রু ঝরে অনুক্ষণ॥

—হংসদূত

স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয়কে প্রলয় বলে। সুখ বা দুঃখের আধিক্যহেতু প্রলয়ের উৎপত্তি হয়।

সুখে প্রলয়

সুখে বা আনন্দের আতিশয্যে যেমন বিহ্বলতা দেখা যায়, তেমনি আবার নিশ্চেষ্টতাও ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে শ্রীমতীর দেহমনে যে প্রলয় বা অস্বাভাবিক অবস্থায় ও নিশ্চেষ্টতার উদ্ভব হয়েছিল, সেই অবস্থা বিশাখাকে দেখিয়ে ললিতা বলেছিল—সখি! ওই দেখ, শ্রীরাধার জঙ্ঘাদুটি স্থবির হয়েছে, চলৎশক্তি নাই। নেত্র যুগল নিষ্পন্দ, কণ্ঠের ভাষা কুণ্ঠিত, নাকে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না। মুনিরা যেমন সমাধিস্থ হন, শ্রীমতী তেমনি নিশ্চেষ্ট ও অনড় হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনের পরম প্রমোদ সুধা, অপরিসীম সুখ ও আনন্দ শ্রীরাধাকে সমাচ্ছন্ন করেছে। ২২।

দুঃখহেতু প্রলয়

যথা—ললিতমাধবে

সহসা তড়াগ জলশূন্য হলে শফরীদের যে অবস্থা হয়, কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনে আভীর-শফরীরাও তেমনি নিদারুণ মনোবেদনায় শ্বাসরহিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হায়! এখন তারা কার শরণ নেবে? দুরাত্মা কংসের বুকে কৃষ্ণসর্প সরোষে দংশন করুক। ।২৩।

ধূমায়িতা

পূর্বে যে ভাবগুলির কথা বলা হলো, সেই ভাব যদি অন্য দু'-একটি ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, এবং যদি তা গোপন করবার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে তাকে ধূমায়িত ভাব বলা হয়। যে নায়িকার অন্তরে প্রচ্ছন্ন কামনা ধূমায়িত, তাকে ধূমায়িতা বলে। ২৪।

কোন সিদ্ধবনিতা বিমানচারিণী দেবীকে বললেন—

'শুন ওগো সুরাঙ্গনে মথুরার অঙ্গনে দেখিয়াছ পুরাণ পুরুষ।
তোমার নেত্রে অশ্রুজল পুলকিত গণ্ডস্থল হইয়াছ মদনের বশ॥'

শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করে দেববালার মনে যে মিশ্রভাবের উদয় হয়েছিল, তা তিনি সংগোপন করলেন। কিন্তু চিত্ত ধূমায়িত হলো এবং তার লক্ষণ তাঁর অশ্রুজলে ও পুলকিত গণ্ডস্থলে প্রতিভাত হলো। ২৫

জ্বলিতা

দুই বা তিনটি ভাব একসঙ্গে উদিত হলে যে অবস্থা প্রকট হয়, সেটা কষ্টের সঙ্গে গোপন করলে, নায়িকার জ্বলিতা অবস্থার উদ্ভব হয়। অন্তর জ্বলে যায়, কিন্তু মুখে ফুটে নায়িকা তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

যথা—

ধন্যাকে তার সখী বললে—

'জানু দুই অচঞ্চল নেত্রে বহে অশ্রুজল রোমাবলী করিছে নর্তন।
বুঝিলাম নীলবর্ণ অপূর্ব্ব পুরুষ রত্ন পাইয়াছ তুমি দরশন॥'

তোমার স্তব্ধ উরুযুগ, হর্ষে রোমাঞ্চিত তনু ও সজল আঁখিদুটি দেখে স্পষ্টই বুঝলাম যে, নীলনিধি তোমার করতলগত হয়েছেন। হে কমলমুখি! তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। ২৬।

দীপ্তা

তিন, চার বা পাঁচটি প্রৌঢ়ভাব যদি একসঙ্গে চিত্তে উদিত হয় এবং নায়িকা সেভাব সংবরণ করতে অসমর্থা হয়, তা হলে তাকে দীপ্তা বলে। ২৭।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীরাধার প্রতি বিশাখা ঃ

'তোমার যে অশ্রুজল ভিজাইল ক্ষিতিতল নিশ্বাসে নাচিছে অঙ্গবাস।
পুলকে দন্তুর অঙ্গ বুঝি কৃষ্ণলীলারঙ্গ তোমার শ্রুতিপুটে কৈল বাস॥'

তোমার পদ্মনয়নের জলবিন্দুতে ক্ষিতিতল সিক্ত হচ্ছে, ঘন-নিঃশ্বাসে কুচাংশুক (কাঁচুলি) নৃত্য করছে, রোমাঞ্চিত তনু দন্তুর হয়েছে; বক্ষস্থল নত ও উন্নত হচ্ছে (heaving), এবং দেহ কণ্টকিত হচ্ছে। হে সখি! তাই আমার স্থির বিশ্বাস হচ্ছে যে, মাধবের লীলা হয়তো তোমার কর্ণমূল পর্যন্ত এসে পৌচেছে। ২৮।

পাঁচ, ছয় অথবা সমস্তভাব যদি একসঙ্গে উদ্ভূত হয়ে প্রেমের

পরমোৎকর্ষ-পর্যায়ে উপনীত হয়, তা হলে তাকে উদ্দীপ্ত অবস্থা বলে। এই অবস্থাপ্রাপ্তা নায়িকাকে উদ্দীপ্তা নায়িকা বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরহিণী ললিতার দশা বর্ণনা করে, উদ্ধব বলেছিলেন—সখা, তোমার বিরহে ললিতা এমন কাতর হয়েছেন যে, অবিরল অশ্রুধারায় তিনি স্নান করছেন। মুক্তাকলাপের মত স্বেদবিন্দু তাঁর সর্বাঙ্গের শোভা বর্ধন করছে। রোমাঞ্চকর কাঁচুলিতে হৃদয়তট আবৃত করে রেখেছেন; চন্দনতুল্য পাণ্ডুর অঙ্গকান্তি প্রকাশ ক'রে, মুখে গদগদ বাক্য উচ্চারণ করছেন। তোমার সঙ্গে নবসঙ্গমের জন্যই যেন সজ্জিতা হয়ে ললিতা স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করছেন।

উদ্দীপ্ত ভাবগুলির ভেদ কোথাও কোথাও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু সাত্ত্বিকভাব সকল এই উদ্দীপ্ত ভাবেরই পরম উৎকর্ষ ও পরাকাষ্ঠা সাধন করে।

'উদ্দীপ্তির বিশেষ 'সূদ্দীপ্তা' নাম হয়।
সাত্ত্বিকের উৎকৃষ্টতা বড় তাথে রয়॥' ২৯ ॥

যথা—

পূর্বাহ্নে গৃহনিক্রান্তা শ্রীরাধা বনপথে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে, তাঁর অঙ্গে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকল প্রকাশিত হতে লাগলো। কোন সখী দূর থেকে শ্রীমতীর সেই অবস্থা দেখে, ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেল। বললে—মাধব! তোমার বংশীধ্বনি শুনে, শ্রীরাধা স্বেদসিক্তা হয়ে উঠেছেন। অশ্রুজলে তিনি বৎসগণের তৃষ্ণা নিবারণ করছেন। আপদমস্তক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, এবং তনু এমন মুকুলিত হয়ে উঠেছে যে, মুগ্ধ বিদ্যার্থীরা ভারতীর প্রতিকৃতি ভ্রমে তাঁর আরাধনায় রত হয়েছে। নিরন্তর স্বেদবারি ও অশ্রুপাতে শ্রীমতীর চম্পক বর্ণ পাণ্ডুর হয়েছে। হে গোবিন্দ! সেই সাত্ত্বিক ভাবের পরাকাষ্ঠাদ্যোতক মূর্তি কৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণায় সহসা স্বেদসিক্ত শুভ্রবর্ণ ধারণ করায়, বিদ্যার্থীদের মনে ভারতীর প্রতিকৃতি বলে ভ্রম উপস্থিত হয়েছে। ৩০।

ইতি সাত্ত্বিক বিবৃতি

ব্যভিচারী ভাব ।১।

অমৃত সমুদ্রে তরঙ্গের মত স্থায়িভাব থেকে ব্যভিচারিভাবের উৎপত্তি হয়। এই ভাব স্থায়িভাবের পুষ্টিসাধন ক'রে আবার তাতেই মিলিয়ে যায়।

'বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ.' অর্থাৎ ব্যভিচারিভাব বিশেষরূপে স্থায়িভাবের অভিমুখী হয়, এবং স্থায়িভাবের মধ্যেই বিচরণ করে; কদাচ তার সীমা লঙ্ঘন করে না। হাবভাব, বাক্য, অঙ্গ অর্থাৎ ভ্রূ ও নেত্র প্রভৃতি এবং সত্ত্ব বা সাত্ত্বিকভাব থেকে উৎপন্ন অনুভাবের দ্বারা ব্যভিচারিভাব প্রকাশিত হয়। ব্যভিচারিভাব অস্থায়ী।

স্থায়িভাব বলতে সাধারণতঃ বুঝায়, নায়ক নায়িকার যে ভাব স্থায়ী ভাবে মনে রেখাপাত করে। ব্যভিচারী ভাব সেই ভাবের তরঙ্গায়িত সাময়িক উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাস প্রেমকে আরও ঘনীভূত করে, এবং প্রেমের মাধুর্য বৃদ্ধি করে।

নির্বেদাদি তেত্রিশটি ভাবের মধ্যে উগ্রতা ও আলস্য ভিন্ন সবগুলি ভাবকেই ব্যভিচারিভাব বলা হয়।২।

এই ব্যভিচারিভাবে সখী প্রভৃতির সঙ্গেও নায়িকার প্রেম সঞ্চারিত হয়।৩।

উক্ত ব্যভিচারিভাবে মরণাদিকে সাক্ষাৎ অঙ্গ বলে স্বীকার করা যায় না। তবে মরণাদি ভাব (নিজের মরণ কামনা বা উদ্যম) অনেক ক্ষেত্রে প্রণয়ের বৃদ্ধি সাধন করে। কিন্তু এই মরণ বলতে প্রকৃত মৃত্যু বা প্রাণত্যাগ বুঝায় না। তার অভিলাষ বা উল্লেখ মাত্র বুঝায়। প্রকৃত মৃত্যু বা প্রাণত্যাগ প্রণয়ের অপকর্ষ।৪।

প্রণয় বিষয়ে নায়ক-নায়িকার মুখে, বিশেষতঃ নায়িকার মুখে

মরণের ইচ্ছা প্রকাশ, প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যে বা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে।

'সুরতরু তল যব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখায় আগি।
দিনকর দিন ফলে শীত না বারল
হম জীয়েব কথি লাগি॥'
—বিদ্যাপতি

'কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ।
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়॥'
—গোবিন্দ দাস

'বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা।
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
পিয়া বিনু দগধয়ে যেন দাবে বন।'
—জ্ঞানদাস

'এ বিরহ হায় সহিতে পারি না, অনলে পশিব আমি।'
'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।'
'না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ফেলিও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো, তমালেরি ডালে॥'
—কীর্তন পদ

নির্বেদ

'নির্বেদঃ আত্মধিক্কারঃ' নির্বেদ বলতে আত্মধিক্কার, খেদ, অনুতাপ ও নৈরাশ্য বুঝায়।

মহার্তি, বিয়োগ ও ঈর্ষা থেকে নির্বেদের উৎপত্তি হয়।

অতিশয় আর্তিহেতু নির্বেদ

যথা—বিদগ্ধ মাধবে

নির্বেদবতী শ্রীরাধার উক্তি—

যাঁর উৎসঙ্গ-সুখ কামনায় গুরুজনদের নিকটেও লজ্জা শিথিল

করেছি, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সখীদের ক্লেশ ভোগ করালাম, মহান্ সতীধর্মে জলাঞ্জলি দিলাম, সেই কৃষ্ণ অবহেলা করলেন! আমার জীবনে ধিক্! উপেক্ষিতা হয়েও পাপীয়সী এখনো জীবিত আছে।

বিপ্রয়োগ বা বিপ্রিয়হেতু নির্বেদ—যথা উদ্ধব সন্দেশে

প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—

সখি! মুকুন্দের প্রতি আমার প্রেমগন্ধ কিছু মাত্র নাই। তবে যে আমি তাঁর জন্য রোদন করি, সে শুধু লোককে জানাবার জন্য যে আমি তাঁর প্রণয়-পাত্রী। কেন না, সেই বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের মুখবিম্ব দর্শন করতে না পেয়েও আমি এই প্রাণকীট ধারণ করে আছি। ৫।

ঈর্ষাহেতু নির্বেদ

যথা—

শ্রীরাধার সৌভাগ্য সর্বজনবিদিত দেখে, ঈর্ষায় (in jealousy) অসহিষ্ণু হয়ে চন্দ্রাবলী আক্ষেপ করেছিল। পদ্মা তাই দেখে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—সখি! তোমার গভীর গরিমার কথা ভুলে গিয়ে, অমন মলিন বদনে নিজেকে ধিক্কার দিও না। চন্দ্রের সঙ্গে তারকার (অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে শ্রীরাধার) পার্থক্য পৃথিবীতে কে না জানে! ।৬।

বিষাদহেতু নির্বেদ

ইষ্টবস্তু না পেয়ে যে বিষাদ বা অনুতাপ হয়, তাকে বিষাদহেতু নির্বেদ বলে।

পূর্বরাগবতী শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন—সখি! আজ আর নিঃশঙ্ক হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যসুধা পান করতে পারলাম না। তাঁর মুখকমলে চঞ্চল দৃষ্টিনিক্ষেপও করতে পারলাম না। অনেকদিনের পর এমন সুন্দর অবসর পেয়েছিলাম, কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য! হতভাগী জরতী (জটিলা) ছল ক'রে আমায় রোধ করেছে। ৭।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—একবিংশ অধ্যায়, সপ্তম শ্লোকে এবং গীতগোবিন্দে পৌর্বাহ্নিক বিষাদ এবং প্রারব্ধকার্য অসিদ্ধির জন্য বিষাদের উদাহরণ আছে।

পৌর্বাহ্লিক বিষাদ—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে।

শ্রীমতীর বিষাদের কথা উল্লেখ ক'রে, ব্রজসুন্দরীরা বলাবলি করতে লাগলেন—সখীগণ, প্রিয়দর্শনেই চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের চোখেব সার্থকতা; তাছাড়া আর কি ফল আছে, তা আমাদের বুদ্ধিব অগম্য। ব্রজরাজতনয় বয়স্যগণসহ গাভীদল নিয়ে বনে প্রবেশ করছিলেন; তাঁর অধরে অনুক্ষণ বেণু শোভা পাচ্ছিল, মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করছিলেন। সেই ভুবনমোহন রূপ যারা দর্শন করেছে, তাদেরই নয়ন সার্থক। তা ছাড়া, অন্য কেউ সে মাধুর্যের আস্বাদ পায়নি।

প্রারব্ধকার্যের অসিদ্ধিহেতু বিষাদ—গীতগোবিন্দে

কলহান্তরিতা শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সখি! আমার মন নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথাই ভাবে; ভুলেও তাঁর প্রতি কোপ প্রকাশ করতে চায় না। তাঁর দোষের কথা ছেড়ে দিয়ে, কেবল পরিতোষই বহন করে। আমায় পরিত্যাগ করে, তিনি অতিশয় তৃষ্ণাকুল হয়ে যুবতীদের সঙ্গে বিহার করছেন। তা জেনেও মন আমার নিরন্তর তাঁর প্রতিই অভিলাষী। আমায় আর কামশাস্ত্র পড়িয়ে কি করবে বলো?

বিপত্তিহেতু বিষাদ—ললিত মাধবে।

প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপ করতে করতে বললেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের নর্মবাক্য শ্রুতিপুটে পান করতে পারিনি, নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁর মুখকমলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারিনি, তাঁর বিশাল বক্ষে গাঢ়রূপে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে পারিনি, তাই ভেবে আমার মন বিকল হয়ে পড়েছে। ৮।

অপরাধহেতু বিষাদ

কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বিলাপ করে বললেন—সখি! আমি কুটিলবুদ্ধি হয়ে মাধবের সুমধুর বচনে কর্ণপাত করিনি। তিনি আমার পায়ে ধ'রে সাধলেও আমি তাঁর দিকে দৃক্‌পাত করিনি। হিতবাক্য অবহেলা করেছি। তাই আমার অন্তর আজ তুষানলে দগ্ধ হচ্ছে। ৯।

দৈন্য। ১০।

দুঃখ, ত্রাস এবং অপরাধ থেকে দৈন্যের উৎপত্তি হয়।

যথা—বিল্বমঙ্গলে

দুঃখের জন্য দৈন্য—

'শুন কৃষ্ণের মুরলী তোরে ভাগ্যবতী বলি সদা থাক কৃষ্ণমুখচন্দে।
তোমার চরণ ধরি কহিছি বিনয় করি মোর দশা কহিও গোবিন্দে॥'

বা—যথা

রাস-আরম্ভে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের উদাসীনতাব্যঞ্জক আচরণে ও বাক্যে ব্যথিতা হয়ে, চাটুবাক্য প্রয়োগ করে বললে—হে দুঃখ-নাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার উপাসনা করবো বলে গৃহত্যাগ ক'রে, যোগিদের মত তোমার পদপ্রান্তে এসেছি। হে পুরুষভূষণ, তোমার মুখের সুন্দর হাসি দেখে, চিত্তে তীব্র কাম বহ্নি জ্বলে উঠেছে। অধীনাদের দাস্যের অধিকার দাও।

ত্রাসহেতু দৈন্য

বনবিহারকালে একটী উড়ন্ত ভ্রমর মুখ পদ্মের দিকে ধাবমান হচ্ছে দেখে, শ্রীমতী হাত নেড়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিজে তাকে নিবারণ করতে না পেরে, ত্রাসে বিহ্বলা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বললেন—হে অঘদমন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার পায়ে পড়ি, এই দুষ্ট ভ্রমরকে তাড়াও। ১১।

অপরাধহেতু দৈন্য

শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন—সখি! মাধবকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমি সত্যই অপরাধ করেছি। কিন্তু আমার কোন দোষ নাই। মানরূপী দুষ্ট ফণী আমায় দংশন করেছিল, সেই বিষে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিলাম। হে সুন্দরি! আমার অপরাধের দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে, তুমি শিখিপিঞ্ছমৌলিকে অনুনয় কর যে, তিনি যেন আমার প্রতি বিমুখ না হন। ১২।

গ্লানি বা নির্বলতা। ১৩।

শ্রম, মনঃপীড়া ও রতি—এই তিনটী থেকে গ্লানির উৎপত্তি হয়।

শ্রমহেতু গ্লানি

যথা—

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বললেন—যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জলকেলি করতে গিয়ে পঙ্কজাক্ষী শ্রীমতী শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শিথিল প্রকোষ্ঠ থেকে মণিবলয় স্খলিত হয়ে পড়েছিল যমুনার জলে। কিন্তু শ্রমজনিত গ্লানি বা অবসাদে তিনি তা রোধ করতে পারেন নি।

'কৃষ্ণ সঙ্গে জলকেলি কৈল রাধা সখী মিলি মণিবলয় পড়িছে খসিয়া।
সখীগণ হাসে তারে তুলিয়া লইতে নারে অঙ্গ সব পড়িছে ভাঙ্গিয়া॥'

আধি বা মনঃপীড়াহেতু গ্লানি—হংসদূতে

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, বিরহিণা শ্রীরাধার মানসিক অবস্থা দেখে, ললিতা একটী হংসকে দূত কল্পনা ক'রে বলেছিল—হে বিহঙ্গ! তুমি মথুরায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলো যে, মনঃপীড়ায় শ্রীমতীর দশম দশা উপস্থিত হয়েছে। তিনি আর জীবিত থাকবেন না। সখীরা প্রতিকারের চেষ্টা ক'রে বিফল মনোরথ হয়েছে। কিন্তু সেই কুবলয়সদৃশা রাধা তোমার আশা ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই জোর ক'রে তিনি প্রাণ ধারণ ক'রে আছেন।

রতিহেতু গ্লানি

যথা—গীতগোবিন্দে

কন্দর্পচিহ্নিত রতিকেলি-সঙ্কুল সমরের প্রারম্ভে শ্রীরাধা দয়িতকে জয় করবার জন্য সাহসে ভর ক'রে, সম্ভ্রম বজায় রেখে যে সব কাজ করতে আরম্ভ করলেন, তাতে তাঁর জঘনস্থল শ্রান্তিতে নিস্পন্দ হলো; বাহুদুটি শিথিল হয়ে এলো, এবং ক্লান্ত বক্ষস্থল উৎকম্পিত হতে লাগলো। অবসাদে চোখদুটি মুদিত হয়ে এলো। পৌরুষ রস কি কখনো নারীর পক্ষে সহজসাধ্য হয়? । ১৫ ।

শ্রম । ১৬ ।

শ্রম সাধারণতঃ তিন রকমের—পথশ্রম, নৃত্যশ্রম, ও রতিশ্রম।

পথশ্রম

দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর অভিসার যাত্রার শ্রম বর্ণনা করে বললে—

'দুই তিন পদ যেঞা কেলিপদ্ম ফেলাইয়া কেশমালা ফেলে কত দূরে।
কণ্ঠের মুক্তার মালা তারপর ফেলি দিলা শ্রমে অঙ্গ হৈল জরজরে॥
কৃষ্ণপ্রেম অন্তরে দূরে অভিসার করে শ্রোণী ভরে চলিতে না পারে।
বহু চিন্তা কৈল তায় তার উপায় নাহি পায় দুঃখী হৈয়া নিন্দে নিতম্বেরে॥'

নৃত্যহেতু শ্রম

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বললেন—আজ রাসলীলায় নৃত্যের আতিশয্য হেতু অনিন্দিতা ক্ষীণাঙ্গিনীদের গতিবিলাস শিথিল হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে পদ্মহস্ত রেখে দাড়িয়ে আছে। শ্রম বশতঃ প্রতি পদক্ষেপে স্বেদ-উদ্গম হচ্ছে। তাই তাদের চূর্ণ অলকের অগ্রভাগ ললাট দেশে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। ১৭।

রতিশ্রম

রতিশ্রান্তা বিশাখাকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বিশাখিকে! রতিশ্রমে তোমার বাহুদুটি শিথিল হয়েছে। গণ্ডযুগে ঘন স্বেদবিন্দু উদ্গত

হয়ে তোমার মূর্তি অনুপম মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সেই মাধুর্য আমার প্রমদাক্রান্ত চিত্তকে অতিশয় প্রীত করে। ১৮।

মদ বা বিবেকহারী উল্লাস। ১৯।

মধুপানজনিত মত্ততায় বিবেকশূন্যতা ঘটে, তাকে মদ বলে।

যথা—

কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বললে—দেবি! দেখ, কি আশ্চর্য। যে রাধা লজ্জায় কখনো শ্রীকৃষ্ণের সামনে মুখতুলে কথা বলতে পারতেন না, সেই কিশোরী আজ অনঙ্গমধুপানে আত্মহারা হয়ে শারীর মত অনর্গল পাঠ আবৃত্তি করে চলেছেন। ২০।

গর্ব

সৌভাগ্য, রূপ, গুণ ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ বা সর্বোত্তম-আশ্রয় থেকে গর্বের উৎপত্তি হয়। গর্বিতা নায়িকা অন্যকে অবহেলা করে।

সৌভাগ্যহেতু গর্ব

'সখীগণ সঙ্গ ছাড়ি, ছাড়ি সব ব্রজনারী কৃষ্ণ তোমার দুয়ারে দাঁড়াঞা।
কুণ্ডল রচিছ তুমি বারবার বলি আমি কৃষ্ণপানে চাহ গো ফিরিঞা॥'

কুঞ্জগৃহে অবস্থিতা গর্বিতা শ্রীরাধাকে বিশাখা বললে—সখি! বান্ধবীদের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে, এবং উৎসুক প্রেয়সীদের ভজনা না ক'রে, শ্রীকৃষ্ণ তোমারই দ্বারে এসে তোমার মুখপানে চেয়ে আছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তুমি একবারও তাঁর দিকে চেয়ে দেখছো না ঃ হাসিমুখে বসে বসে যুঁইফুলের মকরকুণ্ডল তৈরি করছো!

রূপহেতু গর্ব

চন্দ্রাবলীর রূপগরিমায় গর্বিতা হয়ে, তার সখী পদ্মা ললিতাকে বলেছিল—এ পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে চন্দ্রাবলীর মুখচন্দ্রিমার অনুপম সৌন্দর্য-পুঞ্জের স্তব করতে পারে! তার মুখের ওই লাবণ্য-প্রভায় মুগ্ধ হয়ে, শিখিপুচ্ছকিরীটী শ্রীকৃষ্ণও তার গৃহসমীপবর্তী কাননের কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

যথা বা—বিদগ্ধ মাধবে

ললিতা পদ্মাকে বলেছিলেন—চন্দ্রাবলীর রূপের গর্ব ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ শ্রীরাধার আবির্ভাব না হয়। প্রদীপ্ত সূর্যের আবির্ভাবে চন্দ্রের কান্তি যেমন ম্লান হয়ে যায় শ্রীমতীর আবির্ভাবে চন্দ্রাবলীর রূপও তেমনি নিষ্প্রভ হয়। ২১।

গুণহেতু গর্ব

এই ব্রজে গোপিকা কপোতীরা ততক্ষণই বকম্ বকম্ ক'রে আনন্দ দান করে, যতক্ষণ ললিতার কোকিলকণ্ঠে সুমধুর কলধ্বনি ধ্বনিত না হয়। ২২।

সর্বোত্তম-আশ্রয় হেতু গর্ব

অন্য নায়িকাদের তুলনায় কোন নায়িকা যদি সর্বোত্তম ব্যক্তির আশ্রয় লাভে সক্ষম হয়, বা ইষ্ট বস্তু লাভ করে, তাহলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ হেতু গর্বিতা হয়।

সৌভাগ্য, রূপ, গুণ বা সর্বোত্তম-আশ্রয়হেতু যে শ্রেষ্ঠত্ববোধ নায়িকার মনে সঞ্চারিত হয়, তাকে Superiority Complex বা Pride of Supremacy বলা চলে।

যথা—বিষ্ণুপুরাণে

সত্যভামা দূতমুখে ইন্দ্রপত্নী শচীকে জানিয়েছিলেন—তোমার পতি ইন্দ্র, তা আমি জানি। তিনি যে স্বর্গের রাজা, তাও আমি জানি। কিন্তু আমি মানবী হয়েও তোমার উদ্যানের ওই পারিজাত হরণ করাতে পারি। ২৩।

এখানে সত্যভামা সর্বোত্তম-আশ্রয় গৌরবে গরীয়সী ও গর্বিতা।

ইষ্টলাভহেতু গর্ব

আধিক্য বর্জনের জন্য বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়া হলো না। শ্রীমতী একদিন সখীদের সামনে পাচনির সঙ্গে বাঁশীর তুলনা ক'রে, শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বনের গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। এখানে ইষ্টলাভহেতু নায়িকার মনে গর্ব সঞ্চারিত হয়েছে। ২৪।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে উল্লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রে মিলিত যুবতী-সভায় দ্রোপদীকে নিজের স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত জানিয়ে লক্ষ্মণা বলেছিলেন—রাজ্ঞি! আমি বিষদ হাস্য ও উরুকুন্তল এবং কুণ্ডল-কান্তিযুক্ত বক্ত্র উন্নত ক'রে, চারিদিকে উপবিষ্ট রাজাদের নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। তারপর সেইসব রাজাদের সামনে স্বল্প পদ-বিক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে, অনুরক্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের গলায় মালা দিলাম। ২৫।

ইষ্টলাভ এবং নিজের রূপগুণের শ্রেয়তাবোধ হেতু লক্ষ্মণার মনে যে গর্বের সঞ্চার হয়েছিল, সেই গর্বে উন্নতগ্রীবা হয়ে অন্যান্য রাজন্যবর্গের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করে, তিনি গর্বিত মন্থরপদে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর গলায় মাল্যদান করেছিলেন।

শঙ্কা ।২৬।

চৌর্য, অপরাধ ও পরের ক্রূরতা—এই তিনটি কারণে শঙ্কার উৎপত্তি হয়।

চৌর্যহেতু শঙ্কা

'কৃষ্ণ নিদ্রা গেল দেখি বাঁশী লঞা বিধুমুখী লুকাইল লতার ভিতরে।
অঙ্গের যে ছটাগণ তমঃ করে বিনাশন তাথে রাধা শঙ্কিতা অন্তরে॥
রাধা করে বিধির নিন্দন।
হেন অঙ্গ মোর কৈল অন্ধকার দূরে গেল। বিধি নাহি বুঝে প্রিয়জন॥'

অপরাধহেতু শঙ্কা—ললিতমাধবে

নিশীথ অভিসারে কুঞ্জকুটীরে যাবার সময় রজনীর গাঢ় অন্ধকার সম্পদস্বরূপ হয়েছিল। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন চারিদিকে প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়লো, নায়িকা শঙ্কিতা হয়ে উঠলো—'হায়, এখন কেমন করে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ করবো? সবাই যে দেখতে পাবে!' এই আশঙ্কায় পালী বিহ্বলা হয়ে পড়লো। সে যে গোপন-অভিসারে এসে সমাজনিন্দিত কাজ করেছে, এই অপরাধ-

বোধ তাকে শঙ্কিত করে তুললো। পাছে দূর থেকে কেউ দেখতে পায়, এই ভয়ে সে মুখ নীচু ক'রে, শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিকে চেয়ে দ্রুতপদে কুঞ্জভবন থেকে বেরিয়ে গোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করলো। বেণী মুক্ত ক'রে, এলায়িত কেশরাশি মুখমণ্ডলে ও স্কন্ধদেশে ছড়িয়ে দিল, যাতে সামনে এসে পড়লে কেউ তাকে চিনতে না পারে। রাত্রি জাগরণে পালীর অঙ্গ অলস ও অবসন্ন হয়েছিল। ২৮।

উত্তমা স্ত্রীগণ প্রকৃতিগতভাবেই ভীরু। তাই তাঁরা সমাজ, ধর্ম ও লোকলজ্জার ভয়ে স্বভাবতই শঙ্কিতা হন। আত্মমর্যাদা বিষয়ে সচেতনতার জন্য বিদগ্ধ নারীর চিত্তে সর্বদাই শঙ্কা থাকে।

অন্যের ক্রূরতাহেতু শঙ্কা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীকৃষ্ণ জটিলার কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে বললেন—আমার বিনোদবৃত্তান্তের রহস্য যদি প্রকাশ পায়, তা হলে লঘুহৃদয় অভিমন্যু অবিলম্বে শ্রীমতীকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে। না হয়, নির্জন কোন স্থানে লুকিয়ে রাখবে, অথবা মথুরায় নিয়ে চলে যাবে। তখন উপায় কি হবে! ।২৯।

ত্রাস

আকাশে ঘনঘটা ও বিদ্যুৎ দেখে, ভয়ানক কোন জন্তু দেখে, বা কোন উগ্র শব্দ শুনে, নারীর অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

বিদ্যুৎ-দর্শনে ত্রাস

রূপমঞ্জরী কুন্দবল্লীকে বললে—

'জলদের দ্যুতি দেখি ত্রাস পাঞা বিধুমুখী কৃষ্ণের কোলেতে লুকাইল।
দ্বিতীয় বিদ্যুৎ যেন মেঘে প্রবেশিল পুনঃ সেই শোভা সখীরা দেখিল॥' ।৩০।

ভয়ানক জন্তু-দর্শনে ত্রাস

হিংস্র জন্তু দর্শনে নারীর মনে ত্রাসের সঞ্চার তো হতেই পারে; এমন কি, ভ্রমর বা মধুমক্ষিকা দেখেও তাঁরা সন্ত্রস্তা হয়ে ওঠেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বললেন—প্রিয়ে! তোমার কানে যে রক্তপদ্ম দুলছে, তার মধুপান করবার জন্য ভ্রমরেরা ঝঙ্কার করে বেড়াচ্ছে। সেই ত্রাসে তুমি ব্যাকুলা হয়ে উঠেছ; তোমার ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখি ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। কিন্তু হে রাধে! তোমার ওই ভ্রমরসদৃশ শঙ্কিত আঁখির চঞ্চল দৃষ্টি আমার চিত্তে আনন্দ বিস্তার করছে। ৩১।

উগ্রনিস্বন বা ভয়জনক শব্দহেতু ত্রাস

মেঘের গুরুগম্ভীর শব্দে, বা অন্য কোন ভয়াবহ শব্দ শুনে, নায়িকা সন্ত্রস্তা হয়ে নায়কের হৃদয়লগ্না হয়। মেঘের গর্জনে ভীতা হয়ে শ্রীরাধা মান পরিত্যাগ ক'রে বক্ষোলগ্না হয়েছিলেন বলে, শ্রীকৃষ্ণ মেঘের বন্ধুকৃত্য স্বীকার করেছিলেন। ৩২।

আবেগ। ৩৩।

প্রিয়দৃষ্টি, প্রিয়শ্রুতি, অপ্রিয় দর্শন ও অপ্রিয় শ্রবণ থেকে আবেগের সঞ্চার হয়। চিত্তের সম্ভ্রম হেতু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়াকে আবেগ বলে।

প্রিয়দৃষ্টি বা প্রিয়দর্শনহেতু আবেগ বা চিত্তবিভ্রম

অনুরাগিণী শ্রীরাধা সখীকে বললেন—

'জলধর সুন্দর যুবা কোন নাগর আমার নিকটে দেখা দিল।
চঞ্চল নয়ন কোনে চাহিয়া আমার পানে ধৈরয হরিয়া মোর নিল॥' ।৩৪।

যথা ললিতমাধবে

—দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলেছিলেন—সখা, তরু সমীপবর্তিনী ললিতাকে চিনতে পেরে এবং সেখানে প্রকৃতিমধুরা রাধার প্রতিকৃতি দেখে ও শঙ্খচূড়মণির পরিচয় পেয়ে, আমার মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণা হতে লাগলো। ৩৫।

প্রিয়শ্রবণজনিত আবেগ—ললিতমাধবে

দূরাগত মুরলীধ্বনি শুনে নায়িকারা আবেগ-চঞ্চলা হয়ে ছুটে চললেন। কারো এক পায়ে নূপুর, কারো বা কটিদেশ থেকে মেখলা স্খলিত হয়ে পড়ে।

অপ্রিয়দর্শনে আবেগ

রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার পথে যাত্রা করলেন। তাই দেখে, শ্রীমতী আবেগচঞ্চলা হয়ে রথাগ্রে ভূলুণ্ঠিতা হলেন। চোখের জলে তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে শ্রীরাধার দেহমন রোদনের ভারে ভেঙ্গে পড়েছে বাষ্পাকুল নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে আছেন।

অপ্রিয় শ্রবণজনিত আবেগ

কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বললে—দেবি! মধুপুরী গমন সম্পর্কে ব্রজরাজের আদেশে দ্বারপাল যে ঘোষণা প্রচার করছেন, তা তো সামান্য নয়! এ ঘোষণা বজ্রের চেয়েও কঠিন ও নির্মম। এই ঘোষণা শুনে, আভীর-অঙ্গনাদের চিত্ত গভীর আবেগে আকুল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠেছে। ৩৬।

উন্মাদ বা চিত্তবিভ্রম

অত্যন্ত আনন্দে বা বিরহে চিত্তে উন্মাদ ভাব উদ্ভূত হয়।

প্রৌঢ়ানন্দ বা অত্যন্ত আনন্দে বিভ্রম

বৃন্দা বললেন—সখি! ওই দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীমতী উন্মাদ হয়ে প্রমদবিহ্বলা হয়ে উঠেছেন। ভ্রম বশতঃ ভ্রমরিকা দেখে, শ্রীমতী প্রিয়সখীজ্ঞানে তাকে বলছেন, 'তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমায় আলিঙ্গন করবার জন্য যে নবযুবা আসছে, তাকে রোধ করো। ৩৭।

বিরহহেতু উন্মাদ—যথা

মথুরায় এসে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীমতীর বিরহের অবস্থা বর্ণনা ক'রে বললেন—যদুপতি! তোমার বিরহে অতিশয় উত্তপ্তা হয়ে, রাধা লুলিতকেশে বিলুণ্ঠিতা হচ্ছেন। কখনো বা ভ্রূকুটি ক'রে আঙ্গুল ফুটিয়ে, নিজের অধর দংশন করে, কংসকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

কোথাও বা তমাল গাছ দেখে, উতরোল হয়ে সেই দিকে ছুটে চলেছেন। বিরহে তিনি উন্মাদিনী হয়েছেন। ৩৮।

অপস্মার

অতিশয় দুঃখে নায়িকার চিত্তের যে বৈক্লব্য এবং দেহের বৈগুণ্য ঘটে, তাকে অপস্মার (Epilepsy or Hysteria) বলে। ৩৯।

গভীর দুঃখ বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থেকে তরুণী নায়িকার মূর্চ্ছা (Hysteria) বা মৃগী (Epilepsy) রোগের উৎপত্তি হয়।

যথা—

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন ব্যক্তিকে দূতরূপে পাঠাবেন মনস্থ ক'রে ললিতা বললেন—তাঁকে ব'লো, কৃষ্ণ। তোমার বিরহে আমার প্রিয়সখীর কখনো অঙ্গবিক্ষেপ, কখনো উচ্চ প্রলাপ, কখনো বা চক্ষু-তারকা উদ্বর্তিত হচ্ছে। কখনো কখনো তিনি ফেনরাশি উদ্গীরণ করছেন। গুরুজনেরা তাঁকে এই রকম বিকারগ্রস্ত দেখে, জল্পনা-কল্পনা করছেন যে, তিনি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ৪০।

ব্যাধি। ৪১।

যথা—রসসুধাকরে

শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর বিরহের কথা জানিয়ে সখী বললে—হে মাধব! তোমার বিরহে শ্রীমতীর এমন সন্তাপজ্বর উপস্থিত হয়েছে যে, পুষ্পশয্যায় শয়ন করলেও তাঁর উত্তপ্ত অঙ্গের স্পর্শে পুষ্পদল শুষ্ক হয়ে চূর্ণিত পরাগরাশিতে পরিণত হচ্ছে। ব্যজনের পদ্মপত্র তাঁর দেহের উত্তাপে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। স্তনমণ্ডলে বিলেপিত চন্দন ক্ষণকালের মধ্যেই শুষ্ক হয়ে বিদীর্ণ হচ্ছে। সুশীতল পদ্ম-মৃণালের আভরণ অঙ্গে ধারণ করলে, দেহের উত্তাপে সেগুলি ঝলসে গিয়ে, অগ্রভাগ ফেনময় হয়ে উঠছে। ৪২।

মোহ

হর্ষ, বিরহ বা বিষাদ থেকে মোহের উৎপত্তি হয়।

হর্ষহেতু মোহ—

যথা—বিদগ্ধমাধবে

ললিতা ও বিশাখাকে শ্রীমতী বললেন—সখি। অর্ধপ্রস্ফুটিত নীলোৎপলকান্তি শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় করকমলস্পর্শে যখন কৌতুকে আমার দেহমন আলোড়িত হয়েছিল, আনন্দে মোহগ্রস্ত হয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে—কোথায় আমি, কে আমি, কি করছি! কিছুই বুঝতে পারিনি।

'নীলোৎপল জিনি বর্ণ সেই সে পুরুষরত্ন যবে মোরে পরশ করিল।
কিবা করি কোথা যাই কেবা আমি কোথা ঠাঁই সেই হতে সব পাশরিল॥'

যথা বা—মদ্ভাগবতদশমে

সমর্থার রতিবিষয়ে মোহ উপস্থিত হলেও এই রকম অবস্থার উদ্ভব হয়। দেবাঙ্গনারা বিমানযোগে আকাশ পথে বিচরণকালে, বনিতাচিত্তবিমোহন পরম রূপবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং তাঁর মৃদু বংশীধ্বনি শুনে, মুগ্ধা ও কামোন্মত্তা হয়ে উঠেছিলেন। দেবতাদের অঙ্কে থেকেও তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তাঁদের কুসুম-কবরী শিথিল হয়েছিল এবং নীবিবন্ধন স্খলিত হয়ে পড়েছিল।

বিশ্লেষ বা বিচ্ছেদহেতু মোহ

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে শ্রীরাধাকে কেমন করে চিনবো?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দেখবে সুন্দরীদের মধ্যে যিনি সুশীতল কিসলয় শয্যায় শয়ন করে আছেন, সজল চোখে সখারা যাঁর সেবা যত্ন করছে, বিচ্ছেদ-বেদনায় অঙ্গ অতিশয় কৃশ হয়েছে, শুধুমাত্র কণ্ঠের স্পন্দন হেতু অনুমিত হচ্ছে যে, প্রাণবায়ু এখনো আছে, তিনিই বরাঙ্গিনী শ্রীরাধা। ৪৩।

বিষাদে মোহ—শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে

অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণু বাজিয়ে ধেনুপাল নিয়ে সুবল ও অন্যান্য সখাদের সঙ্গে আনন্দবিভোর চিত্তে গোষ্ঠ হতে ফিরে আসেন, ব্রজের পথে গজেন্দ্রগমনে তাঁর চরণচিহ্ন অঙ্কিত হয়, তখন গোপাঙ্গনারা তাই দেখে নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে ভাবে—হায়! আমরা সুবল ও অন্যান্য সখাদের মত ভাগ্য যদি পেতাম! সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতে থাকতে তাদের চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তারা মোহগ্রস্তা হয়। তাদের কেশবন্ধন এলিয়ে পড়ে এবং অঙ্গের বসন স্খলিত হয়। ৪৪।

মৃতি বা প্রাণত্যাগ

মৃতি বলতে প্রকৃত মৃত্যুর কথা উল্লিখিত হলো না। মরণের উদ্যম বা মরণ কামনার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। সমর্থা, সমঞ্জসা ও স্থায়িভাবসম্পন্না কৃষ্ণপ্রিয়াগণ নিত্যসিদ্ধা। তাদের মৃত্যু সম্ভব নয়। শুধু বিরহে, বিচ্ছেদে ও বিষাদে তারা মরণ কামনা করে ও মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই, ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে।

'মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিলুঁ মুখ॥
—গোবিন্দ দাস।

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সুমুখি! যতদিন গান্ধিনীতনয় অক্রূরের সংকল্প সুস্পষ্টভাবে না জানা যায়, ততদিন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যে-পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডল তৈরি করতাম, অঙ্গনের সেই ফুল্লমালতীকে তুমি সযত্নে বাঁচিয়ে রেখো। আমি আর বাঁচবো না। ৪৬।

'এই যে মালতীলতা যার পুষ্প নবপাতা গোবিন্দ পরিত নিজ কাণে।
তুমি তাথে করি প্রীতি জল দিও নিতিনিতি, আমি না বাঁচিব আর প্রাণে॥'

আলস্য

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের কৃষ্ণ সম্পর্কে কোন আলস্য সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম অটুট থাকলেও, জটিলা প্রভৃতির ভয়ে নায়িকার ভঙ্গিমায় আলস্য সূচিত হতে পারে। জরতী বা জটিলা প্রভৃতির পক্ষে অবশ্য আলস্য সম্ভব।

যথা—

জটিলার আগমন বার্ত্তা শুনে শ্রীরাধা ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু গোষ্ঠ থেকে রূপমঞ্জরী এসে বললে—কোনো ভয় নাই। তোমার শাশুড়ী নিরন্তর দধিমন্থন ক'রে, শ্রান্তি ভরে গা আড়ামোড়া দিয়ে, হাই তুলতে তুলতে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় চূড়া বাঁধতো পারো। ৪৭।

জাড্য

ইষ্ট এবং অনিষ্ট শ্রবণ বা দর্শন, অথবা বিরহ ইত্যাদি থেকে জাড্য বা জড়তার উৎপত্তি হয়।

যথা—ইষ্টশ্রবণ-হেতু

কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বললে,—দেবি! পুরদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শুনে, মনোরমা শ্রীরাধা সম্ভ্রমবতী হয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও যেতে পারলেন না। নিমীলিত নেত্রে জড় পদার্থের মত নিশ্চল হয়ে রইলেন। ৪৮।

'হরির নূপুর দুয়ারে বাজিছে তাহা শুনি শশিমুখী।
চলে যেতে চাহে চলিতে না পারে মনে হলো বড় দুখী॥'

অনিষ্টশ্রবণ-হেতু—ললিতমাধবে

পৌর্ণমাসী খেদের সঙ্গে বললেন—চন্দ্রাবলি! শ্রীকৃষ্ণ আজ মথুরায় চলে যাচ্ছেন। এখন তুমি মালা গাঁথবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ!

এই কথা শুনে, চন্দ্রাবলীর পদ্মহস্ত থেকে অর্ধ-গ্রথিত মালা স্খলিত হয়ে পড়লো ঃ 'হায় আমার অদৃষ্ট!' চন্দ্রাবলীর সংজ্ঞা যেন মুহূর্তে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এলো। সত্যই তার দশান্তর ঘটলো; আসন্ন বিচ্ছেদের কথা শুনে সে নিদারুণ জড়তা প্রাপ্ত হলো। ৪৯।

ইষ্ট দর্শন বা অনিষ্ট দর্শনেও নায়িকার একরম জড়তা উপস্থিত হয়ে থাকে। গোপবালারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হ'লে, কত অভিনব নর্মবাক্যে আনন্দ বিস্তার করে। তারা ধন্যা। কিন্তু হায়! রাধা শ্রীকৃষ্ণকে সামনে দেখে, কেমন যেন জড় ও নিষ্পন্দাঙ্গী হয়ে যান।

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বললেন—দেবি! আজ বনের মধ্যে শ্রীরাধা যখন বিহার করছিলেন, হঠাৎ দূরে ক্রুদ্ধ অভিমন্যুকে দেখে তিনি স্তম্ভিতা ও জড়পদার্থের মত নিশ্চল হয়েছিলেন। ৫০—৫১।

বিরহহেতু জাড্য

বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধার বিরহের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে, বৃন্দা বলেছিলেন—হে মুরারি, যদিও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে শ্রীমতী তাম্বুল হাতে নিয়েছিলেন, তবুও বিরহে তাঁর অন্তর এমন জড় ও মুহ্যমান হয়েছিল যে, সে তাম্বুল তিনি মুখে দিতেও ভুলে গিয়েছিলেন। নাগবল্লী কিশলয় যেমনকার তেমনি তাঁর হাতে ছিল। মুখের গুবাক মুখেই ছিল, চিবানো হয় নি। ৫২।

ব্রীড়া বা লজ্জা

নবসঙ্গম দশা, অকার্য ও স্তুতি—এই তিনটি কারণে নায়িকার লজ্জার উদ্ভব হয়।

নবসঙ্গম-হেতু লজ্জা

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—প্রথম মিলনের দিন শ্রীমতীকে যখন বললাম যে, এসো, পুষ্পশয্যায় শয়ন করো। শ্রীমতী লজ্জায় অধোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললাম যে, এই অনুগত জন

বারবার প্রার্থনা করছে, প্রসন্না হও। কিন্তু এই স্তুতিবাক্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা সত্ত্বেও শ্রীমতী নিকুঞ্জলক্ষ্মীর মত লজ্জাবনতমুখী হয়ে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৫৩।

'কুসুম শয়নে বসসিয়া আসি দুয়ারে দাঁড়ায়ে কেন।
বিনয় করিয়া রাধিকারে আমি ডাকিলাম পুনঃপুনঃ॥
আধোমুখ হঞা তবহি রহিলা কিছুই না কহে লাজে।
নিকুঞ্জদেবতা আপনি যেমন দাঁড়ায়ে দুয়ার মাঝে॥'

অকার্য-হেতু লজ্জা

মালতী নাম্নী কোন গোপিনী জোর ক'রে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠহার কেড়ে নিয়ে গলায় পরেছিল। মালতীর মাতামহী তার কণ্ঠে সেই হার দেখে বলেছিলেন—বা বেশ! বিত্তার্জনে বেশ পটীয়সী হয়েছ দেখছি।

এই তিরস্কার শুনে, মালতী তার কণ্ঠস্থিত মণিহারের দিকে চেয়ে লজ্জায় অধোমুখী হয়েছিল। ৫৪।

নিশীথ অঘটনে বা অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত ক্ষেত্রে নবসঙ্গম বা তজ্জনিত অকার্য হেতু, নিশাবসানে নায়ক ও নায়িকা লজ্জায় কেউ কারো মুখপানে চাইতে পারে না।

প্রশংসা বা স্তব-হেতু লজ্জা

পৌর্ণমাসী গার্গীর নিকট শ্রীরাধার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ শ্রীমতী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নিজের প্রশংসা শুনে, শ্রীরাধা লজ্জায় নতমুখী হলেন।

শ্রীরাধার এই অবস্থা দেখে, বৃন্দা বললেন—লজ্জার কি আছে! যা বলছে, তা তো মিথ্যা নয়। সত্যি কথা শুনে সঙ্কুচিতা হচ্ছ কেন? তোমার কীর্তি-কৌমুদীতে জগৎ সমুজ্জ্বল। তাই শ্রীকৃষ্ণের বুকে তুমি অক্ষয় জ্যোৎস্নারাশির মত উদ্ভাসিতা হয়ে আছো। ৫৫।

অবজ্ঞা-হেতু লজ্জা—গীতগোবিন্দে

অন্য কোন প্রিয়ার সঙ্গে নিশা যাপন কালে তার পায়ের আলতার দাগ শ্রীকৃষ্ণের বুকে লেগেছিল। তাই দেখে শ্রীরাধার মনে প্রণয়ভঙ্গের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা সঞ্চারিত হলেও তিনি বলেছিলেন—হৃদয়ে যে তোমার প্রিয়তমার পায়ের আলতা লেগে অনুরাগের রঙ ফুটে উঠেছে! আশ্চর্য! দেখে আমার শোকের চেয়ে লজ্জাই বেশী হচ্ছে। নায়কের অঙ্গে অন্য নারীর পায়ের আলতার দাগ দেখে, নায়িকার মনে বিতৃষ্ণা, বেদনা ও অবজ্ঞার সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না হয়ে, নায়িকার মনে লজ্জার সঞ্চার হচ্ছে। ৫৬।

অবহিত্থা বা আকার গোপন। ৫৭।

নায়ক বা নায়িকা ক্ষেত্রবিশেষে মনোগত ভাবের বহিঃপ্রকাশ গোপন করে থাকেন। এই আত্মগোপন করাকে অবহিত্থা বলে। অবহিত্থা নানা কারণে ঘটে থাকে। কুটিলতা (Shrewdness), লজ্জা, দাক্ষিণ্য, (Courtesy), ভয় ও গৌরব-দাক্ষিণ্য (Sense of prestige or dignity) ইত্যাদি নানাকারণে নায়ক-নায়িকারা অনেক সময় মনোগত ভাব গোপন করে থাকেন।

জৈহ্ম্য বা কাপট্যে যথা—জগন্নাথবল্লভ নাটকে

শশিমুখীর মুখপদ্মনিঃসৃত মধুর বাক্য শুনে, শ্রীকৃষ্ণ মত্তপ্রায় হয়ে মস্তক আন্দোলিত করতে লাগলেন এবং মদনাবেশে অভিভূত হলেন। কিন্তু হৃদয়ের সেই বিকার গোপন ক'রে, হাসিমুখে বললেন—এ কি রকম কথা হলো? । ৫৮।

জৈহ্ম্য বা কাপট্য ও লজ্জায় অবহিত্থা যথা—উদ্ধবসন্দেশে

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা শুনে, শ্যামলার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

সখীর সামনে লজ্জা পেয়ে, সে পুলকের কথা গোপন ক'রে, শীতের কথা বললে।

'সেই ব্রজরাজপুত্র কালিন্দীতীরের ধূর্ত তার বার্ত্তা না কহ আমারে।
এ যে নাচে রোমচয়, এ মোর পুলক নয়, হিমের পবনে শীত করে॥'

দাক্ষিণ্যে যথা—ললিতমাধবে

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বললেন—চন্দ্রাবলী ক্রুদ্ধা হলেও তার মুখচন্দ্র থেকে স্নিগ্ধ জ্যোতি লুপ্ত হয় না। দাক্ষিণ্য (courtesy) হেতু সে কখনো মধুর বাক্য পরিত্যাগ করে না। কিন্তু তার দুর্নিবার মনোব্যথা ও রোষ প্রকাশ পায় উষ্ণ নিঃশ্বাসে এবং কাঁচুলির মৃদু কম্পনে।

গৌরব-দাক্ষিণ্য বা মর্যাদাবোধ-হেতু উত্তমা নায়িকা অনেক সময় মনোগত উষ্মা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রকাশ না ক'রে, মনেই আহুতি দেন।

হ্রী বা লজ্জা-হেতু অবহিত্থা যথা—বিদগ্ধমাধবে

অধীরা রাধা সর্বদাই নবনব আনন্দোচ্ছ্বাসে অত্যন্ত মধুরা। কালিন্দীতীরে শ্রীকৃষ্ণের তর্জনগর্জন সকল তিনি অতিকষ্টে গোপন করবার চেষ্টা করেন, বান্ধবীদের নিকট লজ্জায় তিনি কখনই সে মনোবেদনা প্রকাশ করেন না। যদিও তাঁর তনুবনের হৃদয়কুঞ্জে কৃষ্ণের সেই বিজয়ক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ৫৯।

এখানে আকার গোপনের কারণ লজ্জা ব'লে উল্লিখিত হলেও, শ্রীরাধার মর্যাদাসম্পন্ন প্রকৃতি এবং শালীনতা-বোধই তাঁকে আত্মপ্রকাশে অধিকতঃ নিরস্ত করে। শ্রীরাধার মত উত্তমা ও সর্বগুণ সম্পন্না নায়িকা কখনো অন্যের কাছে নিজের মর্যাদা বা গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কারে তাঁর অন্তররাজ্যে বিপ্লব ঘটে গেলেও, বাহ্যতঃ তার প্রকাশ কোনদিন হয় না। শ্রীমতীর

স্বাভাবিক প্রফুল্লতা অপরাপর গোপাঙ্গনার নিকট সমানভাবে বজায় থাকে।

লজ্জা ও ভয়হেতু অবহিত্থা

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট এসে শ্রীমতীর দূতী বললে—মাধব! শ্রীরাধা হৃদয়ে তোমার প্রতি অনুরাগ বহন করেন; তাই শমীবৃক্ষের অন্তরে দাহ থাকা সত্ত্বেও বাহিরে যেমন সবুজ পত্রপল্লব শোভিত হয়, তিনিও তেমনি স্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিতা হয়ে থাকেন; লজ্জায় ও প্রণয়বিঘ্নভয়ে কদাচ অন্তরের জ্বালা তিনি বাহ্যতঃ প্রকাশ করেন না। ক্ষমাগুণে শ্রীমতী সর্বদাই সরসা ও স্ফূর্তিযুক্তা হয়ে থাকেন। ৬০।

ভয়হেতু অবহিত্থা

যথা—

ললিতার কোন সখী চন্দ্রাবলীর চরিত্রের কথা শুনে, সখীদের সামনে বললে যে, চন্দ্রাবলী তার স্বামীর সম্মুখে গৃহসজ্জায় রত ছিল। হঠাৎ কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে, তার সারাদেহ কেঁপে উঠেছিল। পাছে সে-অবস্থা স্বামীর চোখে পড়ে এই ভয়ে, তাড়াতাড়ি অবহিত্থাপূর্বক আকাশে গর্জিত মেঘের প্রতি দোষারোপ ক'রে ধূর্ততার সঙ্গে সে দেহকম্পনের কারণ গোপন করেছিল।

গৌরব এবং দাক্ষিণ্য-হেতু অবহিত্থা বা আকার-গোপন।

যথা—

চন্দ্রমুখীর কোন এক সখীকে বৃন্দা বলেছিলেন—সুন্দরি! তোমার প্রিয়সখী তাঁর স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য প্রতিপক্ষীয় রমণীর কেশপাশে দোদুল্যমান দেখে; যদিও অত্যন্ত ব্যথিতা ও বিষণ্ণা হয়েছিলেন, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়াদরের জন্য মনের ক্ষোভ সংবরণ করে, তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন। গৌরব

(dignity) এবং দাক্ষিণ্য (courtesy) বজায় রাখবার জন্য তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। ৬১।

উত্তমা নায়িকা অনেক সময় নিজের ও দয়িতের শালীনতা এবং গৌরব রক্ষার জন্য মনোগত বেদনা ও ক্ষোভ নীরবে বহন করেন, বাহ্যতঃ প্রকাশ করেন না।

স্মৃতি

পূর্ব অনুভূত ও জ্ঞাত বস্তুর বা বিষয়ের পুনরায় মানসিক স্ফূর্তির নাম স্মৃতি (Memory)।

'সাদৃশ্যের দরশন আর দৃঢ়াভ্যাস।
ইহাতেই হয় চিত্তে স্মৃতির প্রকাশ॥

সাদৃশ্য দর্শন (Law of Association or Similarity) এবং দৃঢ় অভ্যাস (Repetition of Perception)-হেতু স্মৃতির স্ফূর্তি হয়।

সাদৃশ্য-দর্শনে স্মৃতি যথা—হংসদূতে

মথুরা-গমনোদ্যত হংসরূপী দূতকে সম্বোধন করে ললিতা বললেন—হে বিহঙ্গ! তমালবৃক্ষ দেখে, গোপাঙ্গনাদের স্মৃতিপটে শ্রীকৃষ্ণের কথা জেগে উঠেছে। সেই স্মৃতিতে চিত্ত আলোড়িত হওয়ায়, সে চপলারা উত্তপ্ত দেহে গিরিপরিসরে অবস্থান করছে। যাবার পথে, তুমি যমুনার জলকণাসিক্ত তোমার ওই সুশীতল পক্ষের ধীর ব্যজনে তাদের স্বেদকণা অপনোদিত করো। ৬২।

দৃঢ় অভ্যাসহেতু স্মৃতি

একই বস্তু বা বিষয় পুনঃপুনঃ দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ হেতু স্মৃতিপটে গভীর রেখাপাত করে। এইভাবে জাত স্মৃতিকে দৃঢ়-অভ্যাসজাত স্মৃতি বলা হয়। দৃঢ়-অভ্যাসজাত স্মৃতি যখন-তখন কারণ ব্যতীতও মানসলোকে উদিত হতে পারে। এই প্রকার দৃঢ় অভ্যাস থেকে

সংশ্লিষ্ট বস্তু বা উপলক্ষ্য সম্পর্কেও মনের স্মৃতি-সংসর্গ ঘটে (Condition Reflex)।

যথা—

প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপের সঙ্গে উদ্ধবকে বললেন—শ্রীকৃষ্ণের সেই অমৃতস্রাবী বাক্য, অঙ্গ পরিমল, সেই ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল চূড়া, সেই তমালসদৃশ তনুরুচি, সেই কেলিকৌশল সকল এবং শরদিন্দুনিন্দী শ্বেতপদ্মসদৃশ নয়নদুটি ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার চিত্ত বিস্মৃত হতে পারে না। সেগুলি আমার মানসলোকে অবরহ জেগে ওঠে। ৬৩।

উল্লিখিত বস্তুগুলির মধ্যে যে-কোন একটী দেখলেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হয়। কোথাও কোন বংশীধ্বনি শুনলেই শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভূত হয়। এগুলিকে সংস্পর্শ-স্মৃতি বলা চলে।

বিতর্ক। ৬৪।

বিতর্ক দ্বিবিধ

প্রথম, 'বিমর্শ' বা কারণ অন্বেষণের নিমিত্ত বিতর্ক এবং দ্বিতীয়, 'সংশয়'হেতু বিতর্ক অর্থাৎ কেন এমন হলো, সেটা জানবার জন্য; অথবা কোন বিষয়ে সংশয় হলে, তার সমাধানের জন্য মনে যে বিতর্ক সমুপস্থিত হয়।

বিমর্শহেতু বিতর্ক

যথা—

আনুষঙ্গিক কতকগুলি কারণের উপস্থিতিতে শ্রীরাধার মনে বিতর্কের সৃষ্টি হলো—

'ভৃঙ্গ সব ঘুরেফিরে মধুপান নাহি করে জাড্যে শুক দাড়িম্ব না খায়।
বিবর্ণা হরিণীগণ চমকিত দুনয়ন তৃণপানে ফিরিয়া না চায়॥
বিতর্ক জাগিছে মনে হয়ত বা এইবনে রহিয়াছে ইহার কারণ।
গজেন্দ্র জিনিয়া গতি বুঝি সেই ব্রজপতি এই পথে করেছে গমন॥'

'ব্যাপ্তিগ্রহণরূপো বিচারঃ পূর্বপূর্বানুভবাৎ'। পূর্বপূর্ব অনুভূতি থেকে শ্রীমতীর মনে যে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে, তাই থেকে তিনি বিচার করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এই বনেই আছেন এবং এই পথে বন-মধ্য প্রবেশ করেছেন। ৬৫।

সংশয়হেতু পক্ষদ্বয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে না পারলে, মনে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

যথা—ললিতমাধবে। ৬৬।

প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা ভ্রমণ করতে করতে শৈলশিখরে মেঘ পুঞ্জীভূত দেখে, মনে মনে বিতর্ক ক'রে বললেন—অহো! শিখি-পুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গিনীদের আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে ওই দূরে বিলাস করছেন। অথবা, হয়তো শ্রীকৃষ্ণ নন, বিদ্যুদ্দাম-শোভিত মেঘমালা গিরিশিখর আশ্রয় করে আছে।

এখানে একই গুণধর্মবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যে কোনটি সত্য, সে বিষয়ে মনে সংশয়ের উৎপত্তি হওয়ায়, বিতর্কের উদ্ভব হচ্ছে। বিদ্যুৎ শোভিত জলধর ও সুন্দরী-আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ উপমাগতভাবে একই রূপে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, বিদ্যুৎশোভিত মেঘ দেখে, গৌরাঙ্গী-আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ বলে ভ্রম হচ্ছে এবং সেইহেতু সংশয়ের উৎপত্তি হচ্ছে (Error due to Similarity of objects)। এমত অবস্থাতেই ভ্রান্তি বা বিবর্তভেদ (Error or Illusion) ঘটে। মনে যতক্ষণ এই অনুভূতি সংশয়ের পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ দ্রষ্টার কারণ-অন্বেষণের সচেতনতা বিদ্যমান থাকে; সেই জন্য মনে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

চিন্তা

ইষ্ট বা আকাঙ্খিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের আশঙ্কা থেকে মনে চিন্তা বা ভাবনার উদয় হয়। ৬৭।

ইষ্টের অলাভ-হেতু চিন্তা

যথা—পদ্যাবলীতে

কেমন করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ হবে, এই কথা পূর্বরাগবতী শ্রীরাধা ভাবছিলেন। তাই দেখে, বিশাখা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সখি! আহারে তোমার বিরতি, কোন কাজেই মন নাই, নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ, একাগ্র মন মৌন হয়ে আছে, বিশ্ব যেন তোমার কাছে শূন্য। কি হলো তোমার? তুমি কি যোগিনী, না বিয়োগিনী? কি, তাই সত্যি করে বলো।

যথা বা—বিদগ্ধমাধবে

পূর্বরাগান্বিত শ্রীকৃষ্ণ যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে চিন্তা করছিলেন, কেমন করে শ্রীরাধার সঙ্গলাভ হবে! তাঁর সেই অবস্থা দেখে পৌর্ণমাসী বললেন—

'গোবিন্দের দুই আঁখি অধিক চঞ্চল দেখি নিঃশ্বাস বহিছে খরতরি।
কেমন বা সে রমণী বশ কৈল ব্রজমণি, তাহাকেই চিন্তা করে হরি॥'

মুরারির নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত হচ্ছে। দীর্ঘশ্বাসে মল্লিকা-মালা ম্লান হচ্ছে। এই গোকুলে কে সে এমন ধন্যা রমণী, যার জন্য স্বয়ং মুরারি ধ্যাননিষ্ঠ হলেন?। ৬৮।

অনিষ্ট প্রাপ্তি-হেতু চিন্তা

যথা—

নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বললেন—দেবি! বাল্য চলে গেলে যেমন শ্রীরাধার অঙ্গে মধুর সৌন্দর্যরাশি দীপ্ত হতে লাগলো, তেমনি পদ্মার মুখপদ্ম মধুকরের অন্তরে খেদ সৃষ্টি ক'রে, বিশীর্ণ হতে লাগলো। শ্রীরাধার সৌন্দর্য-বিকাশ পদ্মার মনে অনিষ্টের ছায়াপাত করলো। তার ইষ্টলাভের পথে নিদারুণ অন্তরায় হলো শ্রীমতীর যৌবন সমাগম। তাই অনিষ্ট আশঙ্কায় পদ্মার মনে চিন্তাক্লেশ উপস্থিত হলো। ৬৯।

যথা বা—

চন্দ্রাবলীকে চিন্তাক্লিষ্টা দেখে, সারী বললে—অয়ি চন্দ্রাবলি! শ্রীরাধার সৌভাগ্য দেখে বিষণ্ণা হয়ো না। চিন্তা কি! জ্যোতির্বিদেরা জানেন যে, কৃষ্ণপক্ষে তারাই বলবতী হয়। অতএব এত দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই। পক্ষান্তর হলে, আবার ইষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ৭০।

মতি

বিচারজনিত অর্থনির্ধারণ বা মননকে মতি বলে। ৭১।

যথা—পদ্যাবলীতে

মাথুর বিরহে বিশীর্ণাঙ্গী শ্রীরাধাকে দেখে, পৌর্ণমাসী সস্নেহে বলেছিলেন—বৎসে! কৃষ্ণের অদর্শনে তুমি মর্মাহত হয়ে আছো। আমি উপদেশ দিচ্ছি, যতদিন শ্রীকৃষ্ণ না আসেন, ততদিন তুমি নারায়ণে মনোনিবেশ ক'রে দুস্তর সময় অতিবাহন কর।

শ্রীরাধা বললেন—(শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখপদ্মনিঃসৃত)

'আলিঙ্গন করি মোরে চরণে ঠেলুন দূরে, কিম্বা মারুন মর্ম্মাহত করি।
যা করু তা করু সেই মোর মনে আর নেই, কেবল প্রাণনাথ মোর হরি ॥'

ভালোমন্দ বিচার ক'রে শ্রীরাধার মতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত হয়েছে তাই তিনি পৌর্ণমাসীকে বললেন—প্রিয়তমের যা অভিরুচি, তাই বিধান করুন। তিনি যে আমার প্রাণনাথ! অপর কেউ নন। ৭২।

সমঞ্জসার উদাহরণ

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট সুনন্দনামক বিপ্রকে পাঠিয়ে রুক্মিনী জানালেন-হে পরমপুরুষ! দেববন্দিত শিব-ব্রহ্মাদি যখন তোমার চরনপদ্মের উপাসনা করেন, তখন আর অল্পপুণ্য নৃপতিদের কথা কি বলবো! হে জগৎপতে! তুমি মাধুর্যের সাগর, আমার মত কোন্ কন্যাজন তোমার চরণে দাসী হতে না চায়!। ৭৩।

ধৃতি

মনের স্থৈর্য সম্পাদনের নাম ধৃতি। ৭৪।

দুঃখের অভাব এবং উত্তম-প্রাপ্তি থেকে মনের পূর্ণতা হয়। এ অবস্থায় মন অচঞ্চল হয়। মনের এই অচঞ্চল অবস্থার নাম ধৃতি।

দুঃখাভাব-হেতু ধৃতি

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

'শুনিয়া কৃষ্ণের নাম উল্লাস করায় প্রাণ খলবল করয়ে অন্তর।
তথাপি না দুঃখ করে অচঞ্চল ধৈর্যধরে সুগম্ভীর রাই কলেবর॥'

উত্তমপ্রাপ্তি-হেতু ধৃতি

যথা—

পদ্মার প্রতি বিশাখার উক্তি :

'মৃগীদশা গুণশ্রেণী নবীন যৌবন ধনি সৌদামিনী জিনিয়া কিরণ।
গম্য যেন সুগাম্ভীর্য্য অচঞ্চল স্থির ধৈর্য্য সদা কৃষ্ণগত রাধামন॥'

কি কামনায় শ্রীরাধা প্রত্যহ দেবপূজায় যত্নবতী হন, এ কথা পদ্মা জিজ্ঞেস করলে, বিশাখা বলেছিল—পৃথিবীতে শ্রীরাধার আর কি কাম্য আছে! তাঁর নবযৌবনমঞ্জরী নিত্য স্থিরভাবে বিরাজ করছে : রূপ এত অপরূপ যে, মৃগনয়না গোপাঙ্গনারা সে রূপ দেখে বিস্মিতা হয়েছে; গুণরাশি এমন অত্যাশ্চর্য যে, ত্রিলোকে তৎতুল্য গুণ আর কারো নাই। অধিক কি, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার প্রতি আসক্ত-চিত্ত হয়ে অন্য কোন কান্তার স্পৃহা একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন। অতএব শ্রীরাধা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কি কামনা করবেন!। ৭৬।

হর্ষ। ৭৭।

অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্টলাভ থেকে হর্ষের উৎপত্তি হয়।

অভীষ্ট দর্শন-নিমিত্ত হর্ষ

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

শুকদেব বললেন—হে রাজন্! সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখে, অবলাগণের নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। দেহে প্রাণসঞ্চারিত হলে যেমন হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হর্ষে উদ্বেলিত হয়, তেমনি আনন্দ-উদ্বেলিত চিত্তে তাঁরা সকলে উঠে বসলেন। ৭৮।

যথা বা—ললিতমাধবে

শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সখি! ইনি কি সেই গোপিকা কুমুদিনীদের বিকাশকারী চন্দ্র, না গোকুল-যৌবনরাজ্যের মূর্তিমান উৎসব! অথবা আমার মানস কোকিলের আনন্দবিধায়ক বসন্ত ঋতু? কেন না, হে কৃশোদরি! ইনি আমার তু'নয়নে অমৃত-তরঙ্গ সঞ্চারিত করছেন। ৭৯।

অভীষ্টলাভ-হেতু হর্ষ

যথা—ললিতমাধবে

শ্রীরাধার আনন্দবিভোর অবস্থা বর্ণনা ক'রে নববৃন্দা বললেন—

'রাই যব শ্যামর ও মুখ হেরই সুখসায়র আসি অঙ্গহি ভরই।
আঁখি উপেখি কতহি কত কহই নাগর পেখনে নিমেষ কি সহই॥
সহজে তুটি আঁখি সো বিহি করই শ্যাম ত্রিভঙ্গ রূপহি নাহি ধরই।
এতই কহই ধনি সুখে তনু ভরই হরষ সরস রস মাধব রচই॥'

শ্রীমতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হলো, ভুজবল্লরী স্তম্ভিত হলো, আলিঙ্গন করতে পারলেন না; বাক্য গদগদ হলো, মুখে উত্তর যোগাল না। মহামিলনের ক্ষণ উপস্থিত হলে, কুরঙ্গনয়নার প্রণয়বৃত্তিই তাঁর প্রেমের বিঘ্নকারক হলো। ৮০।

ঔৎসুক্য

ইষ্টদর্শন ও ইষ্টপ্রাপ্তির স্পৃহায় উৎসাহের সঙ্গে কাল যাপন করাকে ঔৎসুক্য বলে।

ইষ্টদর্শনের স্পৃহাহেতু ঔৎসুক্য

যথা—হংসদূতে

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করছেন শুনে, পুরাঙ্গনা তাঁর পরিচারিকাকে বললেন—মুগ্ধে! ক্ষ্যান্ত হও, আর বেশরচনার দরকার নাই। আমি যাই। সখি, ওই শোন, অলিন্দে পুরবালাদের কলরব উঠছে! বৃন্দাবন-পুষ্পধন্বা এসেছেন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। দক্ষিণপদে অলক্তক না দেওয়া হয়, না হোক।

ইষ্টপ্রাপ্তির স্পৃহাহেতু ঔৎসুক্য

যথা—গীতগোবিন্দে। ৮১।

হে মাধব! তোমার আগমন প্রতীক্ষায় বাসকসজ্জা শ্রীরাধা অঙ্গে নানা আভরণ ধারণ করেছেন। গাছের পাতা নড়লে, মনে করছেন—তুমি বুঝি এলে! উৎসুক হয়ে, কখনো শয্যা রচনা করছেন, কখনো বা চিন্তায় কাল যাপন করছেন। সেই লীলাময়ী কোনক্রমেই তোমা বিহনে রাত্রিযাপন করতে পারবেন না।

যথা বা—

'আজু আওব যব নাগর রসিয়া। মান করি হাম রব মুখ ফিরিয়া॥
সো যব আদরে হেরব নয়নে। তাহে নাহি হেরব, হেরব গহনে॥
যবহু কোরে মঝু লেওব শ্যাম। হোই সমুখ মুখ চুম্বব হাম॥
যো বোল বোলব বদনহি বদনে। মাধবে সাধব সাধব নিজনে॥

ঔগ্র্য বা উগ্রতা

নায়ক-নায়িকাদের পরস্পরের প্রতি উগ্রতা প্রণয়াস্বদনের সাক্ষাৎ অঙ্গ বলে পরিগণিত নয়। তবে জটিলা প্রভৃতি বর্ষীয়সীদের ক্ষেত্রে উগ্রতা প্রযোজিত হয়েছে। কেন না, সে ক্ষেত্রে উগ্রতা নায়ক-নায়িকার প্রণয়-পরিপন্থী হয়, এবং মিলনে দুর্লভত্ব সৃষ্টি করে। মিলনের পথে বাধা এবং লাঞ্ছনাভীতি থাকলে, প্রণয়-রসাস্বাদনের মাধুর্য বৃদ্ধি হয় ও স্থায়িভাবের পুষ্টি সাধিত হয়। ৮২।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

একদিন শ্রীকৃষ্ণ মানভঞ্জনের জন্য শ্রীরাধার নিকট গিয়ে সাধ্য-সাধনা করছিলেন; সেই সময় এক মুখরা বর্ষীয়সী এসে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন—কানাই, এরা সব মেয়েছেলে। এদের মাঝখানে তোমার থাকা উচিত নয়। তুমি এখান থেকে যাও।

তবুও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে থেকে যাচ্ছেন না দেখে, বৃদ্ধা উগ্রতার সঙ্গে বললেন—ওরে চঞ্চল! তোর ধর্মভয় নাই? আমার নাতনীরা অতি নবীনা। আমার বয়স হয়েছে, এই দ্বিপ্রহর বেলাতেও ভালো ক'রে চোখে দেখি না। তুমি যদি আমার প্রাঙ্গন থেকে না যাও, তা হলে এখনই আমি মহারাজ কংসের নিকট থেকে অশ্বারোহী আনিয়ে, তোমার সমুচিত শাস্তি বিধান করবো। ৮৩।

অমর্ষ

অধিক্ষেপ বা অপমান-হেতু অসহিষ্ণুতাকে অমর্ষ বলে। ৮৪।

অধিক্ষেপ-হেতু অমর্ষ

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে অসহিষ্ণু হয়ে, রুক্মিণী আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন—হে অচ্যুত! মহাদেব এবং ইন্দ্রের সভায় তোমার যে গুণগান হয়, সে গুণগান যে সব রমণীর কানে প্রবেশ করে নি, গো-অশ্বাদিতুল্য হীনপদবাচ্য রাজারাই তাদের পতি হওয়ার যোগ্য গোবিন্দ নন।' ৮৫।

'যে বলিলে রাজগণ তাথে মোর নাহি মন, তাহাদের পতি হোক তারা।
যাহাদের কর্ণমূলে না প্রবেশে কোনকালে তোমার গুণের মধুধারা॥'

শ্রীকৃষ্ণের বিদ্রূপ উক্তি শুনে, রুক্মিণীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো; এবং অমর্ষ হেতু অন্যান্য নায়িকা ও রাজন্যগণ সম্পর্কে তিনি এই তাচ্ছিল্য সূচক উক্তি করলেন।

অপমান-হেতু অমর্ষ

শ্রীকৃষ্ণের আচরণে অপমানিতা বোধ ক'রে, ললিতা শ্রীরাধাকে বললেন—সখি! কৃষ্ণের উপর থেকে তুমি তোমার মন ফিরিয়ে নাও। যুবতীদের স্তনতটে সর্বদাই তাঁর অর্ধদৃষ্টি। সেই ধূর্ত কামিনীদের সঙ্গে কেলি ক'রে বলপূর্বক তাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং তাদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন ক'রে, নিঃশঙ্ক চিত্তে তাদের পরিত্যাগ করেন। ৮৬।

এখানে অপমান-হেতু ললিতার অমর্ষ বা অসহিষ্ণুতা সঞ্চারিত হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কেও তিনি ক্রোধ পরবশ হয়ে, এরূপ উক্তি করেছেন।

অসূয়া

পরের সৌভাগ্যে বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতাকে অসূয়া বলে। পরের সৌভাগ্য বা গুণপনার প্রতি অসহিষ্ণুতা থেকেই অসূয়ার উৎপত্তি হয়।

সৌভাগ্যে অসূয়া

রাসলীলার শেষে হঠাৎ শ্রীরাধাকে দেখতে না পেয়ে, চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা বলে উঠলো—

'এই পথে গেছে হরি এক নারী কান্ধে করি ইহা মোরা কৈনু অনুমান।
অতি ভার বৈয়া গেছে পদচিহ্ন ডুবি আছে দেখি কাঁপে আমাদের প্রাণ॥'

নৃত্য শেষে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে নিয়ে রাসমণ্ডপ থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন দেখে, শ্রীরাধার সৌভাগ্য কল্পনায় চন্দ্রাবলী প্রভৃতির অন্তরে অসূয়া বা বিদ্বেষ সঞ্চারিত হলো। ৮৭।

যথা বা—

গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে, ব্রজাঙ্গনারা পরস্পর বলাবলি করলেন—আহা! ওই বাঁশীর কি অনির্বচনীয় সৌভাগ্য!

বাঁশী যে কি পুণ্য করেছিল, তা বলতে পারি না। যে কৃষ্ণের অধর সুধা পানের জন্য গোপিনীরা আকুল, বাঁশী সেই অমেয় অধরসুধা একাই আকণ্ঠপানে পরিতৃপ্ত হয়। ৮৮।

গুণহেতু অসূয়া

পদ্মা তার নিজের গাঁথা বনমালার প্রশংসা করছিল। তার বনমালা সত্যই সুন্দর হয়েছিল, এবং নিপুণতার পরিচয় দিচ্ছিল। কিন্তু তার এই গুণপনায় বিদ্বেষ পরবশ হয়ে, বিশাখার কোন সখী তাকে বললে—মুগ্ধে! তোমার চেয়ে আমার প্রিয়সখী অনেক ভালো বনমালা গাঁথেন। তিনি অনেক বেশী নিপুণা। কিন্তু প্রণয়াশ্রুতে তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়েছিল, এবং হাতদুটি সিক্ত হয়েছিল; তাই তিনি মনোযোগ সহকারে মালা গাঁথতে পারেন নি। নইলে তাঁর মত সুন্দর বনমালা আর কেউ গাঁথতে পারে না। ৮৯।

এখানে পদ্মার নিপুণতা বা গুণপনা দেখে, বিশাখার সখী অসূয়া পরবশ হয়ে উঠেছে।

চাপল্য

চিত্তের লঘুতা হেতু যে গাম্ভীর্যের অভাব ঘটে, তাকে চাপল্য বলে॥ ৯০।

অনুরাগ ও দ্বেষ থেকে এই চাপল্যের উদ্ভব হয়।

রাগ তথা অনুরাগ-হেতু চাপল্য

যথা—

কন্দর্প-বিলাসোৎসুক শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিয়ে ললিতা বললেন—হে কৃষ্ণ! এই গোকুল-সরোবরে প্রস্ফুটিত ফুল্ল-কমলিনীসকল নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে চিরকাল কেলি করো। কিন্তু এই অলব্ধকুসুমা অর্থাৎ অঋতুমতী মৃদ্বী নলিনীকে হাত দিয়ে ছুঁয়ো না, তার অঙ্গস্পর্শ ক'রো না। ৯১।

'আর ব্রজের রমণী প্রফুল্লিত কমলিনী তাহে ক্রীড়া কর আশা পুরে।
আমি কিছু নাহি জানি অপুষ্পিত কমলিনী কৃষ্ণ হস্তে না ছুঁইহ মোরে॥'

যথা বা—গীতগোবিন্দে।

রাস-উল্লাসে বিভ্রান্ত হয়ে শ্রীমতী চাপল্যভরে আভীরসুন্দরীদের সামনে শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বললেন—'মাধব, তোমার বদন সুধাময়!' এইভাবে স্তুতিচ্ছলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বন করলেন। মাধবের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। ৯২।

দ্বেষহেতু চাপল্য

যথা—

মহাভাববতী শ্রীরাধা বনমালার প্রতি দ্বেষান্বিতা হয়ে ললিতাকে বললেন—সখি! গুণসঙ্গরহিত ওই বনমালা কৃষ্ণের বুকে লয় প্রাপ্ত হোক। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের ওই কণ্ঠদেশ আমাদের নিখিল-সৌভাগ্যের আস্পদ। কিন্তু ওই কুটিল বনমালা ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ পরিত্যাগ করে না, আমাদের নিবিড় আশ্লেষে বাধা দেয়—অন্তরাল সৃষ্টি করে। সুতরাং অচিরাৎ ওই বনমালার নাশ হওয়াই ভালো। ৯৩।

নিদ্রা

চিত্তের নিমীলনকে নিদ্রা বলে। ক্লান্তি বা অবসাদ থেকে নিদ্রার উৎপত্তি হয়।

ক্লম বা ক্লান্তি হেতু নিদ্রা।

যথা—

নান্দীমুখীর প্রতি বৃন্দার উক্তি: ক্লান্তিভরে গোবিন্দ শ্রীরাধার বুকে মাথা রেখে পর্বত-কন্দরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘন নিঃশ্বাসের স্পন্দনে তাঁর উদরতল নতোন্নত হচ্ছে। মুক্তামালা পুষ্পশয্যায় লুটিয়ে পড়েছে। শিথিল নীবীবন্ধ একহাতে ধরে আছেন; অলস অঙ্গ নিদ্রায় এলিয়ে পড়েছে।

'শ্বাস বহে নাসিকায় উদর বন্ধুর তায় অভিনব পুষ্পের আস্তরে।
রাধিকার স্তনগিরি তারে উপাধান করি নিদ্রা যান পর্বত কন্দরে॥'

নায়িকার কুচকুম্ভে উপাধান করা প্রেমিকের অতিকাম্য সম্ভোগ। ('Pillowed on her ripening breast'—Keats.) ।

দ্বিতীয় উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে মাথা রেখে শ্রীমতীর নিদ্রা বর্ণিত হয়েছে।

যথা—হংসদূতে

মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের অভিলাষ জ্ঞাপন ক'রে ললিতা বললেন—'হে কৃষ্ণ! অলিন্দে কালিন্দীকমল-সুরভিত এই কুঞ্জগৃহে শ্রীমতী সদ্য-প্রস্ফুটিত মাধবীপুষ্পে চিকুর-সজ্জা রচনা ক'রে, কবে তোমার ক্রোড়ে মাথা রেখে মুকুলিত নেত্রে নিদ্রা যাবেন; আর আমি নব কিশলয়গুচ্ছে ব্যজন ক'রে তাঁর সেবা করবো!' ৯৪।

সুপ্তি ও স্বপ্ন

যে নিদ্রায় চিত্তে বিবিধ চিন্তা বা নানাবস্তুর অনুভব বর্তমান থাকে, তাকে সুপ্তি বলে। ইন্দ্রিয়গণের উপরতি, শ্বাস এবং চক্ষু মুদ্রণ প্রভৃতি তার অনুভাব। এ অবস্থায় স্বপ্নাবেশ হয়।

যথা—

স্বপ্নাবেশে শ্রীরাধা—

'পথ ছাড় চঞ্চল যাব যমুনার জল এই বাক্য কহিয়া স্বপনে।
গোবিন্দের ভুজ লঞা তাহে নিজশির দিয়া রাধা নিদ্রা যায় কুঞ্জবনে॥'

শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহুতে মাথা রেখে, শ্রীমতী নিদ্রামগ্না হয়েছেন। তাঁর অলস অঙ্গ নিদ্রায় এলিয়ে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থ কৌস্তুভ মণি তাঁর স্তনাগ্রে শোভা পাচ্ছে। ক্লান্ত দেহে যখন শ্রীরাধা এই ভাবে দরীকুঞ্জে ঘুমিয়ে ছিলেন, স্বপ্নাবেশে তিনি বলে উঠলেন—'হে চঞ্চল কৃষ্ণ! আমার পথ ছাড়ো। আমি যমুনার তীরে জল আনতে যাবো।'

শ্রীমতীর এই স্বপ্নাবেশ দেখে এসে, রূপমঞ্জরী পুষ্পচয়নকারিণী রতিমঞ্জরীকে এই বৃত্তান্ত বলেছিল।

বা—

নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্খলিত মুরলী শয্যায় পড়ে ছিল। শ্রীরাধা সেটি অপহরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে, লুকিয়ে রাখবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু নিদ্রাতুর শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল গণ্ডে পুলক দেখে, শ্রীমতী চকিতা হয়ে উঠলেন। মুরলী হরণ করা হলো না। ৯৫।

বোধ বা নিদ্রানিবৃত্তি

নিদ্রাভঙ্গের পর প্রবুদ্ধতা বা জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবকে বোধ বলে।

যথা—

পৌর্ণমাসীর প্রতি বৃন্দার উক্তি :

'সিংহ মহা শব্দ করে নিদ্রার প্রমোদ হরে সেই শব্দে হরি করে স্তুতি।
রাধার পীন পয়োধর লাগিয়াছে অঙ্গ পর তাথে মনে বাড়ে বড় প্রীতি॥'

সিংহের গর্জন শুনে, শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। ভয়ে তিনি চঞ্চলনেত্রা হয়ে গিরিসদৃশ পয়োধর যুগলের গাঢ়নিপীড়নে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেছিলেন। সিংহের গর্জন শুনে শ্রীমতী ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু পীন পয়োধর-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বর্ধিত হয়েছিল।

সখীর প্রতি স্নেহ

যথা—

ললিতার কোন সখীকে রূপমঞ্জরী বললে—

'শৈল 'পরি হরিসঙ্গে রাধিকা বিহরে রঙ্গে রোমগণ করিছে নর্তন।
ললিতার মুখশশী অলকা পড়িছে খসি তাহা রাধা করয়ে মার্জন॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারকালে, নিজে পুলকে আকুলিতা হয়েও,

শ্রীরাধা তাঁর প্রিয়বান্ধবী ললিতার চূর্ণ-অলকগুলি সস্নেহে কপোল-প্রান্ত থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। ৯৬।

দশা চতুষ্টয়

দশা চার রকম—উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি।

উৎপত্তি বা ভাবসম্ভব

ভাবের সম্ভাবকে উৎপত্তি বলে। যথা—

শ্রীরাধার মুখমাধুর্য একবার আস্বাদন ক'রে, আবার আস্বাদনের পর শ্রীকৃষ্ণ রাধার সখীকে বললেন—শশিমুখি! তুমি আর বলো না যে, শ্রীরাধা অতিশয় মৃদুস্বভাবা। কুঞ্জে তাঁর পুরুষভাব দেখেঁ, আমি সেকথা তোমায় বলেছিলাম ব'লে, শ্রীমতীর নয়নের দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠেছিল। তিনি ক্ষুব্ধা হয়েছিলেন। তাই আমি তাঁরই আশ্রয় নিলাম। ৯৭।

সন্ধি

সমান রূপ বা ভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণ বা সমন্বয়কে সন্ধি বলে।

সমান রূপদ্বয়ের সন্ধি। ৯৮।

যথা—

পৌর্ণমাসীর প্রতি বৃন্দা :

'চিরকাল পরে রাধার ভবনে বিনোদ নাগর যায়।
তা দেখি রায়ান মনেতে রুষিয়া অরুণ নয়নে চায়॥
তাহারে দেখিয়া রাধার নয়ান নিমেষ ছাড়িয়া দিল।
চিত্রের পুতলি যেমন রহয়ে তেমনি রাধিকা হল॥'

এখানে একটী ভাব ইষ্টরূপ ও আর একটী অনিষ্টরূপ—কোনটিই অপরটির চেয়ে কম নয়। এই দুটি সমান ভাব একই সঙ্গে আবির্ভূত হওয়ায় যে সন্ধি হলো, তাতে শ্রীমতী নিষ্পন্দাঙ্গী হলেন। স্বর্ণপ্রতিমার মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। এখানে দ্বিবিধ জাড্যের সমন্বয় হলো। ৯৯।

ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধি

যথা—ললিতমাধবে

পৌর্ণমাসীর উক্তি :

'পর্ব্বতের ভার জানি মনেতে বিষাদ মানি দুঃখিত সে সব গোপীগণ।
সদা কৃষ্ণমুখ দেখি তাথে বড় হয় সুখী সদাই দ্বিবিধ গোপী মন ॥

শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণ দেখে, এবং ওই পর্ব্বতের গুরু-ভারের কথা ভেবে, গোপাঙ্গনাদের মনে নিদারুণ উদ্বেগ সঞ্চারিত হলো। কিন্তু কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য উৎফুল্লতা বশতঃ মনে একসঙ্গে ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সমন্বয় বা সন্ধি হলো। প্রথম, প্রিয়তম দর্শনের আনন্দ। দ্বিতীয়, পর্ব্বতের গুরুভারের কথা ভেবে চিত্তের উদ্বেগ ও সন্তাপ। ব্রজবল্লভাদের হৃদয় দ্বিধা হতে লাগলো।

এই উদাহরণে উদ্বেগজনিত বিষাদ এবং প্রিয়তম-দর্শন জনিত হর্ষ—এই উভয় ভাবের সমন্বয় বা সন্ধি হয়েছে। ১০০।

ভিন্ন হেতু-নিমিত্ত সন্ধি

যথা—

বৃন্দা কুন্দলতাকে বললেন :

'রাধার সহিত নব অনুরাগ যবে বাঢ়াইল হরি
পদ্মারে ললিতা ইঙ্গিত করয়ে কত অবহেলা করি ॥
পদ্মা তাহা শুনি চরণে ধরণী লিখয়ে মৌন করি।
বদন বহিয়া ঝর ঝর হঞা কত পড়ে স্বেদবারি ॥'

এখানে কৃষ্ণের জন্য চিন্তা, এবং হায়, কৃষ্ণ এ কি করলেন! এই মনোভাব, এবং ললিতার প্রতি অমর্ষ বা অসহিষ্ণুতাজনিত কোপ (Intolerance) সঞ্চারিত হওয়ায়, পদ্মা পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে বা দাগ কাটতে লাগলো। তার মুখপদ্ম থেকে অবিরত ঘাম ঝরে পড়ছিল।

এই উদাহরণে চিন্তা এবং অমর্ষের সন্ধি হয়েছে। ১০১।

শাবল্য

যেখানে ভাবনিচয় মনে উদিত হয়ে, এক ভাব অন্য ভাবকে উত্তরোত্তর মর্দিত করে, তাকে শাবল্য বলে।

যথা—

কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বললেন—অহো! যাদের সঙ্গে নবযুবা শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বিহার করছেন, সেই মৃগনয়না সুন্দরীরাই ধন্য। আমার যদৃচ্ছাচার ও চপলতা দেখে, ললিতা আমার নিন্দা করবে। কিন্তু কি করবো! মন যে আমার সেই ইন্দুবদন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। হায়, যে নির্মম বিধাতা মান-গরলের সৃষ্টি করেছে, তাকে ধিক্।

এখানে চপলতা, শঙ্কা, ঔৎসুক্য এবং অমর্ষ ইত্যাদি ভাব পরস্পরকে সম্মর্দিত করছে।

শান্তি বা ভাবের লয়

চিত্তে যখন ভাবের নিবৃত্তি ঘটে, তখনই শান্তির সঞ্চার হয়।

যথা—

নান্দীমুখী বললে—সখি! যে মানরূপী মহীরুহ কমলার চিত্ততটীকে বেষ্টন করেছিল, সখীদের অতিকুশল যুক্তি-কুঠারের দ্বারা তাকে ছেদন করা যায়নি। দূতীদের নিপুণ বাক্য-নির্ঝরের দ্বারাও তা বিচলিত হয়নি। কিন্তু আজ বংশীনাদ আন্দোলিত মৃদু পবনহিল্লোলে সেই বিরাট তরু অচিরাৎ উন্মূলিত হলো।

শ্রীমতীর চিত্তে ভাবের প্রাবল্য-হেতু মান এবং অস্থিরতার উদ্ভব হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণে বংশীধ্বনি মৃদু পবনহিল্লোলে ভেসে আসায় মুহূর্তে চিত্তের সেই ভাবোন্মত্ততা নিবৃত্ত হলো। শ্রীমতীর মান-অভিমান-গ্লানি সব নিমেষে মুছে গিয়ে, মনে শান্তি সঞ্চারিত হলো। ১০২।

ইতি ব্যভিচারিভাববিবৃতি

স্থায়িভাব

শৃঙ্গাররসে মধুরা রতিকে স্থায়িভাব বলে। অতি সহজ কথায় বলতে হ'লে বলা যায়, নায়ক ও নায়িকার যে ভাব মনে স্থায়ী ভাবে রেখাপাত করে, তাকেই স্থায়িভাব বলা হয়। অর্থাৎ হাস্য প্রভৃতি অনুকূল ভাব এবং ক্রোধাদি প্রতিকূল ভাবকে আয়ত্তে রেখে, যে ভাব আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখে, তাকেই স্থায়িভাব বলে। মধুর রসে কৃষ্ণবিষয়ক রতিকেই স্থায়িভাব বলা হয়েছে। এই রতি দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ।

মুখ্য রতিকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, স্বার্থ ও পরার্থ। এদের প্রত্যেকটিকে আবার পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—শুদ্ধ, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা।

গৌণ রতিকে সাতভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা।

এই সকল রতির আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু কেবলমাত্র শেষোক্ত কয়েকটি অর্থাৎ হাস্য বিস্ময় ইত্যাদি ভাব দেহকে আশ্রয় করে বিবর্তিত হয়। সুতরাং এগুলির আলম্বন দেহাদি। এই সকল রতির ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা (action) আছে।

উল্লিখিত মুখ্য এবং গৌণ রতি যতক্ষণ রসাবস্থা প্রাপ্ত না হয় (do not merge into absolute pleasure), ততক্ষণ এদের স্থায়িভাব বলা হয়।

মধুরা রতি

যথা—গোবিন্দবিলাসে

কালসর্পের জিহ্বার অগ্রভাগের মত গোপীগণের চমৎকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধুর্যে যাঁর অন্তর বিদ্ধ হয়েছে, এবং যিনি আপন অরুণাভ নয়ন

দ্বয়ের ঘূর্ণিত প্রান্তদৃষ্টিতে সতীদের হৃদয় চূর্ণিত করেছেন, সেই মুকুন্দ হৃদয়ে মধুরা রতি সঞ্চার ক'রে সকলের চিত্তে অপরিমেয় আনন্দ বিস্তার করুন।

যথা বা—দানকেলিকৌমুদীতে

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞেস করলেন—সখা! গিরিগোবর্ধন-শিখরে অরোহন ক'রে, আপনকর্ণে শোভিত মণিকুণ্ডলের দীপ্তিতে উজ্জ্বল কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ ক'রে, শাণিত ভ্রূধনুকম্পনে মন চুরি করেন, উনি কে? অতিসম্ভ্রমের সঙ্গে উনি যে আমার চিত্তকে ব্যগ্র ক'রে তুলেছেন।

রতি আবির্ভাবের হেতু

অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান ও তার বিশেষত্ব এবং উপমা ও স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতি (amor) উদ্ভূত হয়। এই কারণগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে।

অভিযোগ

নিজেনিজে বা অন্যের মাধ্যমে নিজের মনোভাব প্রকাশ করাকে অভিযোগ বলে। সুতরাং অভিযোগকে দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, স্বাভিযোগ এবং পরকর্তৃক বা অন্যের মাধ্যমে অভিযোগ।

স্বাভিযোগ

নিজের মনের কথা বিশাখার কাছে প্রকাশ ক'রে শ্রীমতী বললেন—সখি! আমি যমুনাতীরের বনে মাধবকে দেখেছিলাম। আমায় দেখে, তিনি আমার অধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, একটী কচি লতার নবপল্লব দংশন করতে লাগলেন। তাই দেখে, আমার অন্তর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

এখানে নিজে এই অভিযোগ উত্থাপিত ক'রে শ্রীমতী বিশাখাকে বলতে চান, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না। সখি, অবিলম্বে

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুমি আমার মিলনের ব্যবস্থা করো, আমায় অভিসারে নিয়ে চলো।

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন—সখা! যাঁর চঞ্চল দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যিনি যমুনাতটে পদ্মবন সৃষ্টি ক'রে অর্থাৎ সখীজনসহ পদ্মের মত প্রস্ফুটিতা হয়ে, আমার চিত্তভ্রমরকে বলপূর্বক হরণ করে নিচ্ছেন, সেই চঞ্চল-চপলনয়না কে?

কুবলয়-সদৃশা শ্রীরাধা তাঁর চঞ্চল লোচনের আকর্ষণে বলপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের চিত্তহরণ করছেন, এই অভিযোগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁর প্রবল মিলনেচ্ছা প্রকাশ করছেন। ১।

পরকর্তৃক অভিযোগ

অন্যে যখন নায়ক বা নায়িকার মিলন-আকাঙ্খা-নিপীড়িত মনের কথা উভয়ের যে-কোন একজনের পক্ষ থেকে অপরকে জানায়, তখন পরকর্তৃক অভিযোগ সূচিত হয়।

যথা—

কোন এক পত্রহারী দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার গভীর অনুরাগের কথা জানিয়ে বললে—

'তোমার সম্বাদ শুনি চঞ্চল হইলা ধনী তার মন হইল ঘূর্ণ্যমান।
ভাবের তরঙ্গে ভাসে অঙ্গের বসন খসে তথাপি নাহিক তার জ্ঞান॥'

বিষয়

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটিকে বিষয় বলে। ২।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যে-কোন একটি বা ততোধিক বিষয়কে অবলম্বন ক'রে চিত্তে রতিলিপ্সা সঞ্চারিত হতে পারে। সেইজন্য ওই পাঁচটিকে রতি আবির্ভাবের হেতু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দ-নিমিত্ত

যথা—বিদগ্ধমাধবে

ললিতা শ্রীরাধাকে জিজ্ঞেস করলেন - সখি! তুমি কেন এমন বিবশা হচ্ছ?

উত্তরে শ্রীমতী বললেন—ওই কদম্ববনের অন্তরাল থেকে কোন্ এক অপূর্ব সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হয়ে আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো, তা আমি বুঝতে পারলাম না। হায়, ওই ধ্বনি বুঝি আজ আমাকে কুলবধূর ধর্মগর্হিত কোন এক অনির্বচনীয় দশায় উপনীত করবে। আমি যে আর কুল-মান রাখতে পারছি না। ৩।

যথা বা—

শ্রীরাধা কোন সখীকে বললেন—একে ওই কৃষ্ণ নামের একটী অক্ষর শুনেই আমার বুদ্ধি লোপ হচ্ছে। তার ওপর আবার সেই পুরুষের বংশীনাদ কর্ণে প্রবেশ ক'রে আমায় উন্মাদ ক'রে তুলেছে। সেই স্নিগ্ধ নবজলধরকান্তি পুরুষকে ক্ষণেক দেখে, তাঁর মূর্তি আমার চিত্তে লগ্ন হয়ে আছে। হায়, কেমন ক'রে এই তিনটী পুরুষরত্নের রতি আমি বহন করবো? তার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। ৪।

স্পর্শ-হেতু

যথা—

ব্যগ্রতার কারণ জিজ্ঞেস করলে, শ্রীরাধা সখীকে বললেন—

সখি! নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রজপুরের ভিতর দিয়ে আমি পথ ধরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোন পুরুষের অঙ্গে আমার অঙ্গ ঠেকলো। আমি শিউরে উঠলাম। আমার দেহ রোমাঞ্চিত হলো। চেয়ে দেখ, আজো সেই রোমাঞ্চ ক্ষণকালের জন্য উপরত হলো না। ৫।

রূপ-হেতু

যথা—

দূতরূপী হংসকে সম্বোধন ক'রে ললিতা বলছেন—মথুরায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলো যে, তাঁর রূপ-দর্শনে উন্মত্তা রাধা বিরহানলে দগ্ধ হচ্ছে। পুড়ে মরছে, তবুও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম সে ত্যাগ করতে পারছে না। আগুনের রূপ দেখে পতঙ্গের যে অবস্থা হয়, কৃষ্ণের রূপে আকৃষ্টা শ্রীরাধার ঠিক সেই দশা হয়েছে। তাঁর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। হতাশ হয়ে শ্রীমতী সেই প্রেমানলেই বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অগ্নিদাহ সহ্য করছেন। ৬।—হংসদূত।

উদাহরণ

যথা—পদাবলীতে

'জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥'

—বিদ্যাপতি

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পুতলি হায় থির নাহি বাঁধে॥'

—লোচন দাস।

'তুয়া রূপ আকর্ষণ রাধা কৈল দরশন হিতাহিত কিছুই না জানে।
প্রেমানলে প্রবেশিল তাপে আত্মা খোয়াইল কীট যেন পুড়য়ে দহনে॥'

—শচীনন্দন

রস-হেতু

যথা—

'অঙ্গ হৈল পুলকিত তনু যেন বিগলিত তরঙ্গিত হৃদয় হইল।
রাধার এমন দেখি মনে অনুমানি সখি ললিতারে কহিতে লাগিল॥
আমি ইহার বুঝিলাম কারণে।
কৃষ্ণের অধরামৃত তাম্বুলের চর্ব্বিত তুমি দিলে রাধার বদনে॥'

হে সখি! আজ হঠাৎ যখন তোমার এই মুগ্ধা সখীর অঙ্গে পুলকোদ্গম হয়েছে, গাত্রভঙ্গ হচ্ছে অর্থাৎ গা আড়ামোড়া দিচ্ছে এবং অন্তরে অনুরাগ সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে, তখন নিশ্চয়ই দয়িতের সঙ্গে কোন রস-সংযোগ ঘটেছে। নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল এনে তুমি শ্রীমতীর মুখে দিয়েছ। নইলে হঠাৎ তাঁর এমন বিকার উপস্থিত হলো কেন? ।৭।

গন্ধ-হেতু

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত বৈজয়ন্তী মালা আঘ্রাণ ক'রে কোন গোপাঙ্গনা মোহপ্রাপ্ত হলো। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে, বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে বললে—সখি, যে গাছের ফুলে এই অনুপম বৈজয়ন্তী মালা গাঁথা হয়েছে, সে সুখময় তরু কোথায় আছে? কি আশ্চর্য! চেয়ে দেখ, এই মালা গলায় দিয়ে কেউ রাত্রিযাপন করেছেন। কিন্তু পরিভুক্ত হলেও এ মালার গন্ধে ভ্রমরেরা আকৃষ্ট হচ্ছে, আমার চিত্তে বারবার স্তম্ভ (Stupor) উপস্থিত হচ্ছে।৮।

লোকোত্তর বস্তুর এমন কোন অনিবার্য প্রভাব আছে, যাতে অবিলম্বে রতি ও রতিবিষয়ক আলম্বন প্রকটিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীদের বা শ্রীরাধার প্রেম যে সব সময় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির উপর নির্ভর ক'রে সঞ্চারিত হয়েছে, তা নয়। শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর অনিবার্য প্রভাব তাঁদের প্রভাবান্বিত করেছে, যার জন্য তিনি শ্রীমতী ও গোপাঙ্গনাদের নিকট রতিবিষয়ক আলম্বন রূপে প্রকটিত হয়েছেন।৯।

সম্বন্ধ

কুল, রূপ, শৌর্য ও শীল ইত্যাদির সামগ্রিক গৌরবকে অর্থাৎ আধিক্যকে সম্বন্ধ বলে।১০।

কুলাদির গৌরব-হেতু

যথা—

কোন ব্রজসুন্দরী বললেন—যাঁর বীরত্বের কাছে পর্বত কন্দুক সদৃশ (ভাঁটার মত) হয়েছে, যাঁর রূপ নিখিল বিশ্বের ভূষণ স্বরূপ, যিনি আভীরশ্রেষ্ঠ নন্দের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যাঁর গুণ অপরিমেয়, এবং অনির্বচনীয় লীলায় বিশ্বজগৎ-কে যিনি বিস্মিত করেছেন, সেই লোকাতীতচরিত্র মুরলীধর কার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়েছেন! তাঁর বেণুরব সেই সব কুল-রূপ-শৌর্য ও শীলাদি সম্বন্ধে সকল কথা মনে করিয়ে দিয়ে, কার চিত্তে রতি উৎপন্ন না করে? ।১১।

'সখি, হেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার মুরলী শুনি হেন কে রমণীমণি যে করয়ে ধৈর্য্য সম্বরণ॥'

—শচীনন্দন।

অভিমান

পৃথিবীতে অগণিত রমণীয় বস্তু আছে, তা থাক। কিন্তু আমি এইটিই চাই—এইটিই আমার প্রার্থনীয়, এই ধরণের নির্ণয়কে বা আত্মনির্বাচনের নিশ্চয়তাকে সুধীগণ অভিমান ব'লে অভিহিত করেছেন। ১২।

তাৎপর্য : মমতার আধার বা প্রেমাস্পদ বিষয়ে অনন্যসঙ্কল্পের নাম অভিমান। এই অভিমান রূপাদির অপেক্ষা না রেখেও, নায়ক-নায়িকার চিত্তে রতি উৎপাদন করে।

যথা—

নান্দীমুখীকে শ্রীরাধা বললেন :

'এই তো ধরণী মাঝে অনেক নাগর আছে তাহারা অনেক রস জানে।
তাহাদিকে কুলবতী স্বয়ম্বরে কৈল পতি তাহা মোর নাহি লাগে মনে॥
চূড়া নাহি যার মাথে বেণু নাহি যার হাতে গিরিধাতু নাহি যার দেহে।
হউক না সে সুন্দর বিদগ্ধ নাগরবর তৃণসম নাহি গণি তাহে॥'

পৃথিবীতে বিদগ্ধচূড়ামণি মাধুর্যগুণালঙ্কৃত যত পুরুষই থাক না কেন, শ্রীরাধা শিখিপুচ্ছমৌলি মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন নায়ককে তৃণতুল্যও মনে করেন না। এখানে শ্রীমতীর এই অনন্যমানসিকতা অভিমানের পরিচায়ক। ১৩।

তদীয় বিশেষ

পদ, গোষ্ঠ ও প্রিয় প্রভৃতিকে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহের বিশেষ বলা হয়।

পদ—যথা

এক্ষেত্রে পদ বলতে পদচিহ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪।

পদচিহ্ন বা পদাঙ্ক

কোন নবাগতা গোপবধূ বৃন্দাবনে প্রবেশ করেই আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বললে—সখি! কালিন্দীতটভূমিতে এ কার চরণচিহ্ন অঙ্কিত দেখছি? সুস্পষ্ট বজ্র-চক্র-পদ্মচিহ্নের পঙ্‌ক্তি! এ পদচিহ্ন দেখেই যে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। হৃদয়কোরক প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। তনুলতিকা রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

গোষ্ঠ

বৃন্দাবন-সংলগ্ন প্রান্তর বা গোচারণ-ভূমিকে গোষ্ঠ বলে।

যথা—

দেশান্তর হতে সমাগতা কোন নববিবাহিতা গোপাঙ্গনা ব্রজভূমে এসেই বললে—সখি! এই ব্রজভূমি অপূর্ব মাধুর্যে আমার হৃদয় উৎফুল্ল করে তুলেছে। এত মধুরিমা আমি পূর্বে কোথাও কখনো দেখিনি। নিশ্চয়ই এখানে ত্রিভুবনমোহন মধুরমূর্তি কোন শ্রেষ্ঠ নাগর বিহার করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু নায়িকার অন্তরে রতি এবং রতিবিষয়ক আলম্বনকে একই সঙ্গে অবিলম্বে প্রকটিত করে

তোলে। গোষ্ঠে প্রবেশ করেই নববধূ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুগুলি দেখতে পেল এবং সেগুলি দেখামাত্রই তার অন্তরে রতি এবং রতিবিষয়ক আলম্বনের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা উদিত হলো।

প্রিয়জন

যে ব্যক্তি প্রগাঢ়ভাবে হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হয়, এবং যার দ্বারা হৃদয় আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়, তাকেই প্রিয়জন বলে। ১৫।

যথা—

শ্রীরাধাকে দেখে কোন নববধূ বললে—

'রাধারে দেখিতে মোর গুরুজন নিবারিল বারেবার।
তথাপি রাধারে দেখিলাম আমি সকল মাধুরী সার॥
সেইদিন হতে তৃষিত নয়নে চারিদিক পানে চাই।
শ্যামলবরণ একটি পুতলি তাহাতে দেখিতে পাই॥' ১৬।

উপমা

কোন বস্তুর সঙ্গে অন্যকোন বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকলে তাকে সেই বস্তুর উপমা বলা হয়।

যথা—

কোন গোপকুমারী রাজসভায় একজন নটের নৃত্য দেখে বললে—সখি। এই নট যার অনুকরণ ক'রে নৃত্য করছে, তার মত নবজলধরকান্তি কোনো যুবা কি তোমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে? তাহলে আমায় তার কাছে নিয়ে চলো। ১৭।

এখানে সাদৃশ্য দর্শনে নায়িকার মনে উপমান বা কৃষ্ণবিষয়ক রতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

যথা বা—

কোন ব্রজবালার রতি-উৎপাদনের হেতু বর্ণনা ক'রে, বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

'কৃষ্ণতুল্য মেঘলেখা ইন্দ্রতুল্য শিখিপাখা বিদ্যুৎ হয়াছে পীতাম্বর।
সে মেঘ দেখিয়া ধনি নয়নে বহিছে পানি ভাবে অঙ্গ হইল স্থিরতর॥'

সেই ব্রজবালা নবজলধর দেখে, হে গোকুলেন্দ্র!—এই কথা ব'লে, তোমার প্রতি অর্পিতচিত্তা হয়ে অবস্থান করছে।১৮।

স্বভাব

যা বাহ্য কোন হেতুর অপেক্ষা না রেখে, স্বতই বা আপনা-আপনি প্রকটিত হয়, তার নাম স্বভাব। এই স্বভাব নিসর্গ এবং স্বরূপ ভেদে দু'রকম। ১৯।

নিসর্গ

সুদৃঢ় অভ্যাসের জন্য মনে যে সংস্কার গড়ে ওঠে, তার নাম নিসর্গ। গুণ, রূপ ও শ্রুতি থেকে এই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। জন্মান্তরের সংস্কার আপনা-আপনি প্রকাশ পায়। ২০।

গুণ-শ্রবণ নিমিত্ত স্বভাব

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শুনে আকৃষ্টা হয়ে, রুক্মিণী বলেছিলেন—সখি! অগ্রজ আমায় তিরস্কার করেন, করুন। সুহৃদ্‌বর্গ যদি পরিত্যাগ করে, করুক। পিতা যদি লজ্জিত হন, হোন। মায়ের চোখে যদি জল পড়ে, পড়ুক। কিন্তু যাঁর সর্ববিধ রূপ ও গুণের কথা শুনেছি, স্বভাবতঃ সেই যদুত্তমের প্রতিই আমার মন সর্বতোভাবে অনুরক্ত হয়েছে। চেদিরাজ্যের কোনো নরপতির প্রতি আমার চিত্তে কোন আকর্ষণ নাই। ২১।

'শুনি কৃষ্ণের গুণগান ভুলিয়াছে মোর মন শিশুপালে করে ঘৃণাকার।
যে বল সে বল মোরে মোর মন যদুবরে কিছু না বলিহ মোরে আর ॥'

যথা বা—

রুক্মিণী নিত্যপ্রেয়সী। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রতি। কিন্তু অন্য নায়িকার পক্ষেও রূপ ও গুণাদির কথা শুনে, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে নৈসর্গিকী রতির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন—

কোন ব্রজসুন্দরী তার সখীকে বললে—তিনি অসুন্দর হোন বা সুন্দরশ্রেষ্ঠই হোন, গুণহীন হোন বা গুণিশ্রেষ্ঠই হোন, আমার প্রতি তিনি বিদ্বেষ প্রকাশ করুন বা করুণার সাগরই হোন, তবুও আজ সেই শ্যামই আমার গতি। ২২।

স্বরূপ

কারণ না থাকলেও যা স্বতঃসিদ্ধভাবে চিত্তে রতিভাব সঞ্চার করে, সেই বস্তুবিশেষকে স্বরূপ বলে। এই স্বরূপ নিষ্ঠাভেদে তিন প্রকার। যেমন—কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয়নিষ্ঠ। ২৩।

কৃষ্ণনিষ্ঠ যথা—

দৈত্যপ্রকৃতি ব্যতীত অন্যজনের পক্ষে কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ অনায়াস-লভ্য। ২৪।

যথা—

কৌতুক বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ একদিন নারীবেশ ধারণ ক'রে ব্রজ-বীথিকার পথে যাচ্ছিলেন। বিমানচারিণী দেবীগণ তাঁকে দেখে পরস্পর বললেন—প্রিয় সখি! ওই সম্মুখে যাঁকে দেখছো, উনি গোপী নন। নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ নারীবেশ ধারণ করেছেন। নইলে, আমরা সুরস্ত্রী, ওই অপরূপ রূপ দেখে আমাদের মনও এমন চঞ্চল হয়ে উঠবে কেন! একমাত্র সূর্য ভিন্ন নিখিল বিশ্বে সর্বজনের নয়নের অন্ধকার কে দূর করতে পারে? সে যোগ্যতা আর কার আছে বলো!

যাদের অসুর বা দৈত্যপ্রকৃতি নয়, অর্থাৎ যারা দিব্য প্রকৃতি-বিশিষ্ট তাদের অন্তর কৃষ্ণনিষ্ঠ হওয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখানে কৃষ্ণপ্রীতি সঞ্চারিত বা উৎপন্ন হয়। তাই দেববালাদের মনে স্বতই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-অনুভব-জনিত সুখ উৎপন্ন হলো। ২৫।

ললনানিষ্ঠ স্বরূপ

ললনানিষ্ঠ স্বরূপ আপনা-আপনি উদ্দীপিত হয়, এবং এই স্বরূপ জন্মগত (Innate) ব'লে নায়কের বা শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন বা গুণ শ্রবণ ছাড়াও তাঁর প্রতি অতিক্রান্ত রতি উৎপাদন করে। ২৬।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণকে না দেখেই এবং তাঁর গুণাগুণের কথা সম্যক্ না শুনেই অতিদূরবর্তিনী কোন নায়িকার অথবা শ্রীরাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি রতি সঞ্জাত হলো। তাঁর অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি সখীকে বললেন—

'নাহি দেখি নাহি শুনি হেন যে পুরুষমণি মোর মন করে সম্ভাবন।
ঘনশ্যাম পীতাম্বরে সঙ্কল্প করিয়া তারে বৃথাই ঘুরয়ে মোর মন॥'

উভয়নিষ্ঠ স্বরূপ

নায়কের প্রতি নায়িকার এবং নায়িকার প্রতি নায়কের এই প্রকার স্বভাবনিষ্ঠা যদি উভয়তঃ হয়, তাহ'লে তাকে উভয়নিষ্ঠ বা কৃষ্ণ-ললনানিষ্ঠ স্বরূপ বলে।

যথা—ললিতমাধবে

ললিতার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি :

'দ্বিজ বেশ ধরি রবি পূজিবারে বুঝি সে নাগর এল।
নহে কেন মোর তনু পুলকিত অন্তর দ্রবিয়া গেল॥
গগন মাঝারে শশধর যদি উদয় নাহিক করে।
চন্দ্রকান্তমণি কেন বা গলিবে বঞ্চন না কর মোরে॥' ২৭॥

বিলাসের আধিক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে অভিযোগ অর্থাৎ রূপ, গুণ ও অনুভব প্রভৃতি উদ্দীপনের কথা বলা হলো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদের রতি প্রায়ই স্বভাবসিদ্ধ। ২৮।

রতির তারতম্য

তারতম্য-ভেদে রতি তিন শ্রেণীর হতে পারে। যেমন—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। রত্নের সঙ্গে তুলনা করলে, পর্যায়ক্রমে মণি, চিন্তামণি ও কৌস্তুভমণির সঙ্গে এই ত্রিবিধ রতির তুলনা করা যায়।

সাধারণী রতিও অতিসুলভ নয়, তাই মণির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। কুব্জা প্রভৃতির কৃষ্ণপ্রেম সাধারণী রতির পর্যায়ভুক্ত।

সমঞ্জসা রতি চন্দ্রকান্তমণি, অর্থাৎ আরো দুর্লভ। তাই কৃষ্ণ-মহিষীগণ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষে সমঞ্জসা রতি সম্ভব নয়।

আর সমর্থা রতির তুলনা করা হয়েছে কৌস্তুভমণির সঙ্গে। কৌস্তুভমণি যেমন ত্রিভুবনে সুদুর্লভ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েই শোভিত, তেমনি সমর্থা রতি একমাত্র ব্রজগোপাঙ্গনা ভিন্ন অন্য কোন নায়িকার পক্ষে সম্ভব নয়। ২৯।

সাধারণী রতি

এই রতি কখনো অতিনিবিড় হয় না; প্রায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ নায়ককে দেখেই সঞ্জাত হয়। নায়ককে দেখে বা তাঁর সংস্পর্শে এসে, যে ভালবাসা সম্ভোগ-ইচ্ছা জাগ্রত করে, তাকেই সাধারণী রতি বলে। ৩০।

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

সম্ভুক্তা হয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতিবিশিষ্টা হয়ে কুব্জা বললে—হে বাঞ্ছিত! এখানে আরো কিছুদিন আমার সঙ্গে বাস করো এবং রতিক্রীড়া করো। হে পদ্মলোচন! তোমায় ছাড়তে আমার প্রাণ চায় না। ৩১।

প্রণয়ের গাঢ়তার অভাব হেতু, কুব্জার অন্তরে যে রতি তা স্পষ্টতঃ সম্ভোগ ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই শ্রেণীর রতিতে সম্ভোগ

বাসনা হ্রাস পেলেই আকর্ষণ হ্রাস পায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সম্ভোগেচ্ছাই রতি উৎপত্তির হেতু। তাই এই রতিকে সাধারণী রতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে (Voluptuous attraction)। ৩২।

সমঞ্জসা রতি

যেখানে পত্নীত্বের অভিমান থাকে, গুণাদি শুনে রতি উৎপন্ন হয়, প্রণয় নিবিড় অথচ কখনো কখনো সম্ভোগেচ্ছা বা সম্ভোগের তৃষ্ণা থাকে, সেখানে রতি সমঞ্জসা। ৩৩।

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণী লিখে পাঠালেন—হে মুকুন্দ! তুমি কুল-শীল-রূপ-বিদ্যা-বয়স-সম্পদ ইত্যাদি সর্ববিষয়ে অতুলণীয়। তুমি বিশ্বজনের মনোভিরাম। কোন্ বুদ্ধিমতী কুলবতী কন্যা তোমায় পতিত্বে বরণ করবার অভিলাষ না করে! । ৩৪।

সমঞ্জসা রতিতে যখন সম্ভোগেচ্ছা প্রবল হয় এবং পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন হাবভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা কঠিন হয়। সমঞ্জসা নায়িকা যদি শুধুমাত্র রমণেচ্ছাজ্ঞাপক হাবভাবের সাহায্যে নায়ককে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে, তা হলে নায়কের চিত্ত আকৃষ্ট না হয়ে প্রায়ই বিমুখ হয়। ৩৫।

পত্নীপ্রেমের নিবিড়ত্ব ও সেই সঙ্গে সময়োচিত সম্ভোগেচ্ছার সমঞ্জস সংমিশ্রণকে সমঞ্জসা রতি বলা হয়।

যথা—

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেছেন—রাজন্ ষোড়শসহস্র পত্নীও তাঁদের গূঢ় হাসি, কটাক্ষ এবং ভ্রূভঙ্গিমা প্রভৃতি কামশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ হাবভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনে কাম সঞ্চারিত করতে সমর্থা হন নি। তাঁদের সুরতবিষয়ক কুশলী অনঙ্গবাণ ব্যর্থ হয়েছিল। ৩৬।

সমর্থা রতি

সাধারণী এবং সমঞ্জসা রতির চেয়ে কিছুটা অন্যরকম সম্ভোগেচ্ছা যাতে নায়ক এবং নায়িকা একীভূত ভাব প্রাপ্ত হয়, তাকে সমর্থা রতি বলে। ৩৭।

স্ব স্ব রূপের সমন্বয়ে অথবা ললনানিষ্ঠ স্বভাবের জন্য কৃষ্ণ সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গে নায়িকার সংযোগ ঘটলে, সমর্থা রতি উৎপন্ন হয়। এই রতি উৎপন্ন হলে, নায়িকা তার কুল-মান-ধর্ম-ধৈর্য্য-লজ্জাদি সবকিছু বিস্মৃত হয়। এই রতি এত নিবিড় হয় যে, তাতে আর কোনো ভাবান্তরভেদ থাকে না। ৩৮।

এখানে নায়িকা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা হয়ে, কুল-মান-লজ্জা প্রভৃতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে, নিজেকে নিবেদন করে দয়িতের নিকট। সমর্থা রতিতে নায়িকার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। আপন প্রেমে সে আপনাকে পূর্ণাহুতি দেয়। এই সমর্থা রতিই (Selfless love) শ্রেষ্ঠ রতি এবং এই রতি একমাত্র ব্রজদেবীগণের ভিতরেই মূর্ত হয়েছে।

যথা:—

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

'ত্রিভুবনে যত নারী রাধা হয় সর্বোপরি দেখি সেই রূপের তরঙ্গ।
তোমার কথা মনোহারী গুরুজন শঙ্কা করি তার কাছে না করে প্রসঙ্গ॥
পথে চলে যাও তুমি হয় নূপুরের ধ্বনি সেই ধ্বনি শুনিয়া কিশোরী।
কখনো যা না শুনিল তার কর্ণে না কহিল উঠে রাধা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করি॥'

তোমায় না দেখেও, তোমার কথা না শুনেও, শুধুমাত্র তোমার নূপুরের ধ্বনি শুনে তোমার সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ ঘটলো, তাতে শ্রীমতী গুরুজনের গৌরব ভুলে গিয়ে, আপন প্রণয়নিষ্ঠ স্বরূপ হেতু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ!' ব'লে নিবিড়-রতিবিশিষ্টা হয়ে উঠলেন। ৩৯।

'অদ্ভুত বিলাস ইহা অতি চমৎকার।
সম্ভোগেচ্ছা বিশেষের ভেদ নাহি তার॥'

সবচেয়ে অদ্ভুত এই যে, এই রতি কখনো সম্ভোগেচ্ছা-বিশেষ ভেদে হয় না। শুধুমাত্র কৃষ্ণের সুখের জন্যই সমর্থা রতির এই উদ্যম প্রকাশ পায়। ৪০।

পূর্বোক্ত সমঞ্জসা রতিতে কখনো কখনো আত্মসুখের উদ্যম সম্ভব হয়। ৪১।

যেমন—রুক্মিণী দেবীর পত্র পেয়েই শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগরে গিয়েছিলেন।

সত্যভামার আনন্দবিধানের জন্য তিনি পারিজাত আহরণ করে এনেছিলেন।

মহাভাব

সমর্থা রতি প্রৌঢ় (mature) হলে মহাভাবদশাপ্রাপ্তি ঘটে। এইজন্য মুক্ত এবং প্রধান ভক্তগণ সমর্থা রতির সাধন করতে চান। কিন্তু সহজলভ্য হয় না। ৪২।

যথা—

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে :

উদ্ধব বললেন—পৃথিবীতে এই সব গোপাঙ্গনাদের জন্মই সার্থক। কেন না, তাঁরা অখিলাত্মা গোবিন্দের প্রতি এই প্রকার প্রেমবিশিষ্টা হয়েছেন। এই প্রেম সামান্য নয়। মুনিগণ মুক্ত হয়েও এই প্রেম বাঞ্ছা করেন। আমরা সকলেই করি। এই অনন্ত ভগবানের কথায় যিনি রসাস্বাদন করেন, তাঁর ব্রহ্মজন্মে প্রয়োজন কি ? । ৪৩।

প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি

সমর্থা রতিকে যদি প্রতিকূল ভাব বিচলিত করতে না পারে, তাহলে তাকে প্রেম বলে। প্রেম যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে পরিণত হয়। ৪৪

মৃত্তিকায় রোপিত ইক্ষুগ্রন্থি থেকে যেমন ইক্ষুদণ্ড জন্মায়, তারপর সেই ইক্ষু থেকে রস, রস থেকে গুড়, খণ্ড, শর্করা ইত্যাদি যথাক্রমে

উৎপন্ন হয়, তেমনি রতি থেকে প্রেম, প্রেম থেকে রাগ, রাগ থেকে অনুরাগ এবং অনুরাগ থেকে মহাভাব ইত্যাদি যথাক্রমে ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়।

পণ্ডিতগণ স্নেহাদি ছয়টি ভাবকেই প্রায় প্রেম অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ৪৫।

সমর্থা-রতিবিশিষ্টা প্রেয়সীর যে জাতীয় প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সঞ্জাত হয়, শ্রীকৃষ্ণেরও সেই জাতীয় প্রেম সেই নায়িকার প্রতি সঞ্চারিত হয়।

প্রেম

ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও যার ধ্বংস হয় না, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি সেই ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।

যুবক-যুবতী, নর ও নারী, নায়ক এবং নায়িকা—উভয়ের অন্তরে পরস্পরের প্রতি যে-ভাব ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও কখনো ধ্বংস হয় না, অর্থাৎ সকল অবস্থায় স্থায়ী হয়, তাকে প্রেম বলে।

'সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে॥
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥' ৪৬॥

যথা—

পূর্বরাগবতী শ্রীরাধা নান্দীমুখীকে বললেন—সখি! তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো, তা'হলে ধর্মের নামে শপথ ক'রে বলতে পারি যে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলাম—'হে লম্পট, আমার কাঁচুলিতে হাত দিও না। যদি দাও, আমি লজ্জাসরম ত্যাগ ক'রে ননদিনীকে বলে দেবো।' কিন্তু ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেও তিনি আমার পথ ছাড়েন নি। অতএব হে প্রিয়সখি, আমি ঘোর বিপদে পড়েছি। গৃহপতি শাস্তি দিলে, দিন। আমার অন্য কোন উপায় নাই।

এখানে, ভয় দেখালেও শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত হচ্ছেন না; গৃহস্বামী শাস্তি দিলেও, শ্রীরাধা সেই শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত, তবুও অন্য কোন উপায় তিনি অবলম্বন করতে পারেন না। এই উদাহরণের দ্বারা এই কথাই প্রকাশ পায় যে, ধ্বংসের কারণ (ভীতি ও শাস্তি) থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের ভাববন্ধন ধ্বংস হচ্ছে না। সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি শ্যামের ও শ্যামের প্রতি শ্রীরাধার উভয়নিষ্ঠ প্রেম প্রকাশ পাচ্ছে। ৪৭।

যথা বা—

বৃন্দা কুন্দলতাকে বললেন—সখি! শ্রীরাধার অসামান্য রূপ, অনুরাগ ও সদ্‌গুণাবলীর তুলনায় অন্য কান্তা তুচ্ছ। তবুও চন্দ্রাবলী এবং কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে ভাবক্রম, তা কখনো ম্লান হয় না। কি আশ্চর্য!

শ্রীরাধার রূপ, গুণ এবং অনুরাগ চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণানুরাগ ধ্বংস করবার পক্ষে যথেষ্ট হলেও, তার সে অনুরাগ বা ভাবক্রম ধ্বংস হচ্ছে না। এই অনুরাগ প্রেম। প্রকৃত প্রেম যখন সঞ্চারিত হয়, তখন নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হলেও সে প্রেম ধ্বংস হয় না। মান, বিচ্ছেদ, কলহ ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সর্ববিধ কারণ থাকা সত্ত্বেও নায়ক ও নায়িকার এই ভাববন্ধন শিথিল হয় না।

প্রেমভেদ

প্রেমকে তিনটী পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। নিবিড়তার তারতম্য অনুযায়ী প্রেমের এই তিনটী ভাগ নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রৌঢ় প্রেম

বিলম্বেও যখন প্রিয়জনের চিত্তবৃত্তি জানা যায় না, এবং নায়িকার মনোভাব জানতে না পারায় নায়কের চিত্তে ক্লেশ সঞ্চারিত হয়, তখন তাকে প্রৌঢ় প্রেম বলে।

কাল অতীত হলেও যখন নায়ক এসে নায়িকার সঙ্গে মিলিত হন না, এবং তার জন্য নায়িকার চিত্তে ক্লেশ সঞ্চারিত হয়, তখন তাকেও প্রৌঢ় প্রেম বলে।

তবে উভয় ক্ষেত্রেই একজন অপরের ক্লেশের কথা চিন্তা ক'রে উদ্বিগ্ন হয়। প্রেম ভিন্ন এই পারস্পরিকতা (reciprocity) থাকে না, এবং মমত্ব বিবেচনায় এই প্রৌঢ়ত্ব থাকে ব'লেই একে প্রৌঢ় প্রেম বলা হয়। ৪৮।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলেছিলেন :

'হে সখা নিকুঞ্জে যাহ যাঞা রাধিকারে কহ আমার মুখের এক বাণী।
আমার বিলম্ব দেখি মনে না হইও দুঃখী তিলেক বিলম্বে যাব আমি॥
এথা এক মহামত্ত আসিয়াছে দুষ্ট দৈত্য আমি তায় করি বিনাশন।
মিলিব গা প্রিয়াসঙ্গে করিব অনেক রঙ্গে উৎকণ্ঠিত আছে মোর মন॥'

মধ্য প্রেম

যে প্রেমে নায়ক অন্যকোন কান্তার জন্য অপেক্ষা করছেন জেনেও নায়িকা অধীরা হয় না, সহ্য করে, সে প্রেমকে মধ্যম বা মধ্য প্রেম বলে। ৪৯।

যথা—

চন্দ্রাবলীর সঙ্গে সম্ভোগরত শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অহো! সর্ববিষয়ে মনোহারিণী চন্দ্রাবলীকে এখন লাভ করেছি, এবং তার সঙ্গে শারদ রাত্রির উপযুক্ত সম্ভোগ ক্রীড়া পর্যাপ্ত ভাবে করলাম—যে ক্রীড়াতরঙ্গ দেখে কন্দর্পসেনাও চমৎকৃত হয়েছে। এখন আমার চিত্ত অপেক্ষা করছে শ্রীরাধার জন্য।

চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলনকালে শ্রীরাধার কথা মনে উদিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মধ্যম। তবে অন্য নায়িকার সঙ্গে তুলনা করলে, চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রৌঢ়।

একমাত্র শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য নায়িকা সম্ভোগকালে চন্দ্রাবলীর কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে উদিত হতে পারে। কিন্তু শ্রীরাধার সঙ্গে মিলন কালে অন্য নায়িকার কথা তাঁর মনে উদিত হয় না; এমন কি, চন্দ্রাবলীর কথাও মনে পড়ে না। সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি তাঁর প্রেম সর্বাধিক প্রৌঢ়। শ্রীরাধা তাঁর প্রিয়সখী কমলার প্রতি অতিশয় প্রীতিসম্পন্না ব'লে, কমলার নিকট অভিসারকালে তিনি শ্রীরাধাসঙ্গমের সমতুল সুখানুভব করেন, এবং তখনো চন্দ্রাবলীর কথা তাঁর মনে উদিত হয় না। অতএব শ্রীরাধা এবং তাঁর অতিপ্রিয় সখী কমলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সমধিক প্রৌঢ়। তবে রাধা-প্রেমের তুলনায় সখীদের প্রেম মধ্যম।

মন্দ প্রেম

সর্বদা আত্যন্তিকরূপে পরিচিত থাকলেও, যে প্রেম অন্য কান্তাকে উপেক্ষা করে না, বা তার অপেক্ষাও করে না, তাকে মন্দ প্রেম বলা যায়। ৫০।

বৃন্দাবনে মন্দ প্রেমের উদাহরণ বিরল। সেই হেতু দ্বারকায় এতাদৃশ প্রেমের উদাহরণ দেওয়া হলো।

যথা—

পুরোহিতপত্নী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন: হে মাধব! যে প্রেমবতী নায়িকা, তার প্রতি বিন্দুমাত্র উপেক্ষাও দোষের। অতএব সত্যভামার সখী মানিনী অশোকলতাকে অনুনয় করে নিয়ে এসো। ৫১।

এখানে অশোকলতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম যে মন্দ, তাই প্রমাণিত হচ্ছে। নিজে থেকে শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গ-কামনা করছেন না। তার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কথঞ্চিৎ অনাদর বা উপেক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই পুরোহিতপত্নী অনুরোধ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নায়িকার যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন।

প্রেয়সীদের বিষয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভেদ দেখানো হলো, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েও প্রেয়সীদের প্রেমভেদ আছে।

প্রৌঢ় প্রেম

যাতে বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা থাকে, তাকে প্রৌঢ় প্রেম বলে। ৫২।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভাবতে যেখানে নায়িকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, সেখানে তার প্রৌঢ় প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

ললিতা শ্রীমতীকে বললেন—সখি! তুমি মান ত্যাগ করো না। এই কথা শুনে, শ্রীমতী ললিতাকে বললেন—প্রিয়সখি! বারবার তুমি আমায় মান ক'রে থাকতে বলছো। বেশ, তা'হলে তুমি চিত্রফলকে কংসারির মনোহর মূর্তি অঙ্কিত করে এনে আমায় দাও। আমি অহঙ্কারের সঙ্গে মহামানিনী হয়ে গৃহকোণে বসে পরম সুখে সেই মূর্তি দেখে মুহূর্ত যাপন করবো। কর্ণকুহর রুদ্ধ করে রাখবো, যাতে তাঁর মধুর মুরলীধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ না করে। নইলে আমি বিচ্ছেদ সইতে পারবো না।

মধ্য প্রেম

যাতে কষ্টেসৃষ্টে ধৈর্যসংবরণ করা হয়, তার নাম মধ্যপ্রেম। ৫৩।

যথা—

কোন যূথেশ্বরী তাঁর সখীকে বললেন—

'এই ত দীঘল দিন কখন হইবে ক্ষীণ সন্ধ্যাকাল হইবে কখন।
যাহাতে কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া পাইব সুখ বনে হতে আসিবে যখন॥'

কষ্টেসৃষ্টে এই দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলে, সন্ধ্যা আসবে। তখন সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের গোধূলিধূসর-কেশদামযুক্ত মূর্তি এবং মধুর মৃদুহাস্যশোভিত মুখচন্দ্রিমা দেখতে পাবো। ৫৪।

মন্দ প্রেম

যে প্রেমে কোন-কোন সময়ে বিস্মৃতি ঘটে, তাকে মন্দ প্রেম বলে। ৫৫।

যথা—

কোন যূথেশ্বরী তাঁর সখীকে বললেন—সখি! প্রতিপক্ষ নারীর প্রতি ঈর্ষাহেতু আমি তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বনমালা গাঁথতে ভুলে গিয়েছি। এখন কি হবে! ওই ধেনুগণের হাম্বারব শোনা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছেন। আমার বনমালা যে এখনো গাঁথা হলো না!

এখানে ঈর্ষার জন্য প্রেমের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটেছে। সেই হেতু এই প্রেমকে মন্দ প্রেম বলা হয়েছে। কিন্তু নায়িকার অন্তরের আকুতি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধ্বংসের কারণ (ঈর্ষা) থাকা সত্ত্বেও অনুভব ধ্বংস হয়নি। তাই নায়িকার প্রেমকে অস্বীকার করা যায় না। প্রেমের প্রধান লক্ষণ এখানে বিদ্যমান। ৫৬।

স্নেহ

যে প্রেম পরম-উৎকর্ষে উপনীত হয়ে, নায়িকার চিত্তদীপ প্রজ্জ্বলিত করে এবং হৃদয় দ্রবীভূত করে, তাকে স্নেহ বলে।

স্নেহ উদিত হ'লে, শুধুমাত্র চোখের দেখায় তৃপ্তি হয় না। ৫৭।

যথা—ক্রমদীপিকায়

শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় এবং অতিমধুর অমৃতরসময় রূপপানে যাদের লালসা, তাদের সে রূপসুধাপানে আশা মেটে না। তাঁর প্রেমভার বহনে গোপসুন্দরীরা শ্রান্ত হয়ে, তাঁর চঞ্চল লোচনপদ্ম হতে প্রবাহিত প্রণয়-সলিল-রাশি উপভোগ করে, কিন্তু তাতেও তারা তৃপ্ত হয় না। লোকধর্ম ও নিন্দার ভয়ে তাদের অনুভব কখনও ধ্বংস হয় না। ৫৮।

যথা বা—

বৃন্দা শ্রীরাধাকে বললেন :

'কৃষ্ণের বদনবিধু তাহার কিরণসীধু তাহে রাধা নয়ন চকোর।
পুনঃ পুনঃ পান করে তবু নাহি ছাড়ে তারে সীধুপানে হইয়াছে ভোর॥
অদ্ভুত লাগিল সেই মাধুরী দেখিয়া।
কণ্ঠভরি সুধা খায় অশ্রুজলে উগরায়, তবু পীয়ে উন্মত্ত হইয়া॥'

অঙ্গসঙ্গ, অবলোকন ও শ্রবণ ক্রমানুযায়ী মনোদ্রব বা স্নেহ তিন প্রকার। যথা—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ। ৫৯।

অঙ্গসঙ্গে মনোদ্রব

যথা—

পালীর সখী শ্রীকৃষ্ণকে বললে :

'ঘনরসরূপ তুয়া তনুখানি যাহার পরশ পাঞা।
লাবণিয়া পালী মনেতে দ্রবিল বিলাসে কৌতুকী হঞা॥'

তুমি ঘনরসের স্বরূপ, পালীর লাবণ্যরসময়ী মূর্তি। তোমার আলিঙ্গনে সে কেন দ্রবীভূতা হবে না! ।৬০।

অবলোকনে বা বিলোকনে মনোদ্রব

যথা—

শ্যামার সখী বকুলমালা শ্রীকৃষ্ণকে বললে :

'তুয়া মুখ পদ্মসুহৃৎ শ্যামার হৃদয় ঘৃত দ্রবীভূত হইবারে পারে।
দেখি শ্যামার মুখচন্দ্র তুয়া মন চন্দ্রকান্ত না গলিলে চিত্র লাগে মোরে।'

হে কৃষ্ণ! শ্যামার হৃদয় ঘৃতসদৃশ, সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে, তা দ্রবীভূত হতে পারে। সেটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শ্যামার মুখচন্দ্রিমা প্রকাশিত হলে, তোমার চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয়ে জলধারায় পরিণত হচ্ছে। শ্যামা সন্দর্শনে তোমার চিত্ত স্থির ও স্তব্ধ হয়ে আসছে। অর্থাৎ শ্যামাকে দেখে তুমিও অতিশয় বিমোহিত হয়েছ।

শ্রবণে মনোদ্রব

যথা—

বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বললে :

হে মুরারি! তোমার নামার্ধ কানে প্রবেশ করলেই, চোখের জলে শ্রীরাধার বুক ভেসে যায়। মদনমধুতে বিভোরা হয়ে, শ্রীমতী বিমূঢ়া হন। সেই কুবলয়াক্ষী কখনো স্খলিতবসনা হন, কখনো বা জৃম্ভণ করেন। ৬১।

স্মরণ-হেতু মনোদ্রব

যথা—

হঠাৎ শ্রীরাধাকে অশ্রুপ্লুতা দেখে, নান্দীমুখী বললে :

'কৃষ্ণচন্দ্র করি মনে বসিয়াছ স্বভবনে তেঁই তনু কাঁপিছে সঘনে।
তোমার স্নেহ অতিশয় তাথে মন দ্রব হয় ইহা আমি বুঝিয়াছি মনে॥'

স্বরূপ অনুযায়ী স্নেহ দু'রকম—ঘৃত এবং মধু, অর্থাৎ ঘৃত-স্নেহ ও মধু-স্নেহ। এক শ্রেণীর স্নেহকে ঘৃতের সঙ্গে তুলনা করা যায়, অন্য শ্রেণীর স্নেহ মধুর সঙ্গে তুলনীয়। ৬২।

ঘৃত-স্নেহ

যে স্নেহ অত্যন্ত আদরময়, তাকে ঘৃতস্নেহ বলে। ৬৩।

ভাবান্তরের সঙ্গে মিলিত হ'লে ঘৃত-স্নেহের মাধুর্য বৃদ্ধি হয়। এই স্নেহ আপনা-আপনি স্বাদুতা লাভ করে না। পরস্পরের আদর জনিত স্নিগ্ধতা বা শীতলতায় এই স্নেহ ঘণীভূত হয়। প্রগাঢ় আদরে এই স্নেহের পুষ্টি হয় ব'লে একে ঘৃত-স্নেহ বলা হয়েছে। ৬৪।

যথা—

পদ্মা বললে :

দূর থেকে যাকে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আদর জানিয়ে নিজে উঠে গিয়ে আলিঙ্গন করেন, এবং যে নায়িকা নিজেও পবিত্র নিবিড় স্নেহে

শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত ক'রে রেখেছে, এবং কেলিবৃষ্টিতে সিতোপলার (ওলার) মত অতিক্রুত বিগলিত হয়ে যায়, সেই চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কার তুলনা হয়!

এই উদাহরণে মধু-স্নেহের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। ৬৫।

নিস্প্রয়োজন বোধে ঘৃত-স্নেহের দ্বিতীয় উদাহরণ এখানে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হলো না। মর্মমাত্র উল্লিখিত হলো। যথা—

পুনর্বার নৃত্যের জন্য রাসমণ্ডলে দাঁড়িয়ে, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর বাঁ হাতখানি আপন স্কন্ধে রাখলেন। চন্দ্রাবলী সে হাতখানি সরিয়ে নিয়ে মাধবের স্কন্ধে ডানখানি রেখে, মদনাবেশে বিগলিতা হলো। তাই দেখে, শ্রীমতীর কোন যুবতী সখী হেসেছিল। ৬৬।

গৌরব

যদিও গৌরব থেকে আদর উৎপন্ন হয়, তবুও এই দুটি স্নেহ পরস্পরের আশ্রিত। রতি বিষয়ে আদর থাকলেও, স্নেহ বিষয়ে সেটা আরও স্পষ্ট। ৬৭।

মধু-স্নেহ

প্রিয়ে, তুমি আমারই। কিংবা, আমার কৃষ্ণ!

নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি এই ধরণের আচরণে যে স্নেহ পরিবেশিত হয়, তার নাম মধু-স্নেহ। ৬৮।

'সহজে মধুর নানা রস সমাহার।
যদি উষ্মা ধরে সেই মধু সাম্যে তার॥'

যার মাধুর্য আপনা আপনি প্রকাশ পায়, সূক্ষ্মভাবে যে অনুভব নানারস-সমন্বিত এবং যা উষ্ণতা ও মত্ততা সঞ্চার করে, তার নাম মধু-স্নেহ। ৬৯।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন :

'স্নেহময় মাধুর্য সার তাহাতে নির্মাণ যার হেন রাধা সুধার প্রতিমা।
গুণ সংখ্যা নাহি তায় ভাব-উষ্মা সদা গায় কিবা দিব তাহার উপমা॥
সুবল, রাধা মোর মন হরি নিল।
যার নাম কর্ণপথে অর্ধমাত্র প্রবেশিতে সব মোর বিস্মৃতি হইল॥'

যা মধুর, তার মাধুর্য প্রকাশে অন্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। শ্রীরাধা স্বয়ং মধুরা। মধু যেমন নানা পুষ্পের সুধাসমন্বয়ে সমৃদ্ধ, শ্রীরাধাও তেমনি নানাগুণের সমন্বয়ে পরিপূর্ণা। তাই শ্রীরাধার স্নেহ মধু'র মতো মাদক ও উত্তেজক, এবং সেই অনুপমা নিবিড় আনন্দময়ীর সংস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ জগৎ বিস্মৃত হন। ৭০।

মান

যে স্নেহ উৎকর্ষ লাভ ক'রে নবতম মাধুর্য আস্বাদন করায়, এবং নিজেকে আচ্ছাদন করবার জন্য অদাক্ষিণ্য ধারণ করে, অর্থাৎ বাম হয়, তাকে মান বলে।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনবিহারকালে আপন স্নেহ-প্রাচুর্যে শ্রীমতী বিগলিতা হয়েছিলেন। তাঁর নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই দেখে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চোখে ফুঁ দিতে লাগলেন। সুন্দরী ভ্রূকুটি ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—তোমার গাভীদের পায়ের ধূলো উড়ছে। সেই ধূলো আমার চোখে প'ড়ে চোখ কড়কড় করছে। এখন আর ফুঁ দিয়ে কি হবে?

তাৎপর্য : থাক, দুঃখ দিয়ে আবার কপট ভালবাসা দেখানো কেন? খুব হয়েছে, এখন আর দরদ দেখাতে হবে না।

শ্রীমতীর এই প্রকার উক্তি ও নিবিড় স্নেহ-পরিবেশের মাঝখানে হঠাৎ ভ্রূকুটি সহকারে বামা হওয়ায়, মান প্রকাশিত হলো।

এই মান দু'রকমের হয়, উদাত্ত ও ললিত। ৭১।

উদাত্ত মান

ঘৃত-স্নেহ থেকে উদাত্ত মানের উৎপত্তি হয়। উদাত্ত মান আবার দু'প্রকারের। প্রথম, এই মান কোনক্ষেত্রে গহনক্রম বা দুর্বোধ্য রীতি ধারণ ক'রে বাইরে দাক্ষিণ্য বা সরলতা প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অদাক্ষিণ্য পোষণ করে। দ্বিতীয়, কোন ক্ষেত্রে বাইরে বামাভাব অর্থাৎ কোপ প্রদর্শন করে ও অদাক্ষিণ্য দেখায়। ৭২।

দাক্ষিণ্য-উদাত্ত মান

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কুন্দবল্লীকে বললেন :

'আমার বদলে রাধিকার নাম তাহা শুনি চন্দ্রাবলী।
মুখের হাস্য দ্বিগুণ করিল হাতে দেয় করতালি॥
বিনয় বচন শুনিয়া আমার বিনয় বচন কয়।
তাহা শুনি মোর সখাগণ যেন চিত্রপুতলি হয়॥'

শ্রীকৃষ্ণের মুখে রাধিকার নাম শুনে, চন্দ্রাবলীর অন্তরে যে আর্তি ও মানের উদ্ভব হলো, তা গোপন করবার জন্য সে হাস্যসহকারে করতালি দিল। এটা চন্দ্রাবলীর দাক্ষিণ্যযুক্ত উদাত্ত মান। ৭৩।

বাম্যগন্ধ উদাত্ত মান

যথা—বিষ্ণুপুরাণে

রাসলীলার পর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করেছিলেন। তার পর যখন তিনি ফিরে এলেন, তাঁকে দেখে কোন গোপাঙ্গনা ভ্রূকুটি ক'রে ললাট কুঞ্চিত করলেন, অথচ নেত্রভৃঙ্গের দ্বারা তাঁর মুখপদ্মের মধুপান করতে লাগলেন। ভ্রূকুটি ও ললাটভঙ্গের দ্বারা নায়িকার বামাভাব প্রকাশিত হলো। কিন্তু নেত্রে দাক্ষিণ্য ফুটে উঠলো। ৭৪।

যথা বা—

চন্দ্রাবলীর সখী অন্যকোন সখীকে বললে :

'পাশক খেলিতে ধনিরে জিনিয়া হরি চাহে আলিঙ্গন।
কুটিল নয়নে মনে চাহে ধনি হাতে করে নিবারণ॥'

পাশা খেলায় আলিঙ্গন পণ ক'রে চন্দ্রাবলী যখন পরাজিতা হলো, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। তাতে চন্দ্রাবলী কুটিল নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে, হাত নেড়ে তাঁকে নিবারিত করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মনে-মনে সে আলিঙ্গন কামনাই করছিল।

এখানে মাধব কর্তৃক পরাজিতা হয়েও, কুটিল নেত্রে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করায় বাহ্যতঃ বাম্যগন্ধ এবং হাত নেড়ে নিবারিত করবার চেষ্টায় দাক্ষিণ্য লক্ষণ প্রকাশিত হলো। ৭৫।

ললিত

যে মানে মধু-স্নেহ ও কৌটিল্য স্বতন্ত্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাকে ললিত মান বলে। বাচিক এবং মানসিক কৌটিল্যের নর্ম বিশেষকেও ললিত বলে। ৭৬।

কৌটিল্য-ললিত

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

রাসান্তর্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, মানময়ী শ্রীরাধার যে অবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা ক'রে শুকদেব বললেন—রাজন্! কোন এক গোপী প্রণয়-কোপাবেশে বিবশা হয়ে, ভ্রুকুটি ক'রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে, ওষ্ঠ দংশন করতে লাগলেন। ভ্রুকুটি-কটাক্ষের জন্য পরাভব যেন তাড়না করতে লাগলো।

শ্রীরাধার সুহৃৎ সকলের স্নেহও মধুস্নেহ। সেই স্নেহ থেকে উৎপন্ন ভ্রুকুটি-কটাক্ষ বা কৌটিল্য 'ললিত' মধ্যে পরিগণিত। নর্ম ললিত আরো সুন্দর।

যথা বা—

মঙ্গলার সখী তার কোন বান্ধবীকে বললে—

সখি! শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলেছিলেন—মাধবি! তোমার সখী এই

মঙ্গলা মদনোন্মত্তা হয়ে পথের মাঝখানে আমায় স্বয়ং আলিঙ্গন দিয়েছিলেন।

এই কথা শুনে, মঙ্গলা কুটিলবদনা হয়ে, নিজের কিরীটহার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করেছিল।

লজ্জাহেতু মঙ্গলা অধোবদনা হয়েছিল, এবং মুখখানি তির্যক ভঙ্গীতে নামিয়ে, মান প্রকাশ ক'রে, অবতংসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মৃদু আঘাত করেছিল। ভ্রূকুটি করেনি, তাই এই অতিসূক্ষ্ম দাক্ষিণ্যাংশ কৌটিল্য-ললিত।

যথা বা—

রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরীকে বললে—

সখি! দীর্ঘক্ষণ ধ'রে স্পর্শসুখ অনুভব করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অতি ধীরে ধীরে শ্রীরাধার চুচুকে (স্তনাগ্রে) পত্রবল্লী তিলক এঁকে দিচ্ছিলেন। বিলম্বের উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘকালব্যাপী স্পর্শসুখ অনুভব করা। কিন্তু তাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলি থেকে স্বেদ নির্গত হচ্ছিল। তাই দেখে, শ্রীমতী চঞ্চলেক্ষণা হলেন। কোপ প্রকাশ ক'রে তিনি পুলকান্বিত বামকুচের ধাক্কা দিয়ে কেশবকে দূরে সরিয়ে দিলেন। এতে মান প্রকাশিত হলো। কিন্তু ভ্রূকুটি বা অন্য কোনরকম কুটিলতা না থাকায়, যথেষ্ট দাক্ষিণ্যও প্রকাশিত হলো। কুচক্ষেপের দ্বারা যতখানি কোপ প্রকাশিত হলো, তার চেয়ে অধিক প্রকাশিত হলো আদর। সেইজন্য এক্ষেত্রে ঘৃত-স্নেহের চেয়ে মধু-স্নেহের লক্ষণই বেশী প্রকাশ পেল।

নর্ম ললিত

যথা—দানকেলিকৌমুদীতে

'মিছা না কহিবে তোমার রসনা সেহ বড় পুণ্যবতী।
কুলবতী সতীর অধর পানেতে সদাই যাহার রতি॥
তোমার যে কর সে বড় সুন্দর কেন বা কন্বিবে বল।
নীবির বন্ধন দেখিয়া যে কর সদা করে টলমল॥'

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নর্মবাক্য প্রয়োগ ক'রে ললিতা বললেন—হে অঘরিপু! তোমায় মিথ্যাবাদী আর বলি কেমন ক'রে? তোমার রসনা কি মিথ্যা বলতে পারে! সে যে সহস্র সাধ্বী রমণীর অধর-সুধা পান ক'রে পবিত্র হয়েছে। আর, তোমার ওই হাতদুটিই বা কেমন ক'রে বলপ্রকাশ করবে? ওই হাত এমন দয়ালু যে, সুন্দরীদের নীবিবন্ধন দেখলেই, অসহিষ্ণু হয়ে বন্ধন মোচন করবার জন্য সর্বদাই টলমল করে। ৭৭।

এখানে নর্মবাক্য ও কৌতুকচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিযোগ প্রকাশ করা হলো। পরিহাসচ্ছলে 'মান' প্রকাশিত হলেও, তা মধুস্নেহসিক্ত ও ললিত। ললিতা কৌশলে বিপরীত লক্ষণা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাবাদিত্ব ও নির্দয়তা ঘোষণা করলেন।

প্রণয়

মান যদি বিশ্রম্ভ ধারণ করে এবং প্রেম ও দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা'হলে প্রণয় সূচিত হয়। মান যখন নায়িকাকে সম্ভ্রমরহিতা করে, তখন সেই ভাববন্ধনকে প্রণয় বলে। অর্থাৎ যেখানে প্রণয় থাকে, সেখানে মান উদিত হ'লে নায়িকা বিশ্রম্ভ ধারণ করে। বিশ্রম্ভ বলতে বুঝায়, সম্ভ্রমবোধের শিথিলতা, কেলিকলহ ও যথেচ্ছ বিহার। এক্ষেত্রে নায়িকার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, নায়কের মন-প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ ও পরিচ্ছদ ইত্যাদির সঙ্গে তার নিজের মন-প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ ও পরিচ্ছদাদির কোন প্রভেদ নাই। উভয়ের সম্পর্ক নিঃসঙ্কোচ হয়ে ওঠে।

যথা--

কুঞ্জভবনে শ্রীকৃষ্ণের পাশে লীলারতা শ্রীরাধাকে উপবিষ্টা দেখে এসে, তাঁর অবস্থা বর্ণনা ক'রে রূপমঞ্জরী সখীকে বললে :

'হরির কর কুচোপরি, তাঁর স্কন্ধে গ্রীবা ধরি ভ্রুকুটিল কুটিল নয়ন।
প্রমোদাশ্রু নেত্রে বয় কৃষ্ণ অঙ্গে সিঞ্চয় পীতবাসে করয়ে মার্জন ॥'

এই উদাহরণে ভ্রুকুটির নিমিত্ত অসহিষ্ণুতা বা মান প্রকাশ পাচ্ছে। অশ্রু থেকে চিত্তদ্রব ও শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রে সেই অশ্রু মোছার জন্য নায়িকার নিঃসঙ্কোচ ভাব বা নিঃসম্ভ্রমতা প্রকাশ পাচ্ছে। ৭৮।

প্রণয়ের স্বরূপ হলো বিশ্রম্ভ। বিদগ্ধগণের মতে ওই বিশ্রম্ভ আবার দু'প্রকার। যথা, মৈত্র্য ও সখ্য।

মৈত্র্য

ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিনয়ান্বিত বিশ্রম্ভকে মৈত্র্য বলেন।

যথা—

স্বাধীনভর্তৃকা চন্দ্রাবলীকে তার কোন কিঙ্করী বলেছিল :

'তোমার যে শ্রীচরণ নাহি কর সঙ্কোচন তাহাতে নূপুর পরাইব।
যাহার শবদ শুনি লজ্জা পাবে মরালিনী বিপক্ষ কামিনী লাজ পাব॥'

অপর উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবত দশমে—

কোন গোপিনী তার অঞ্জলিবদ্ধ করতলে শ্রীকৃষ্ণের হাতদুটি চেপে ধরলেন। আবার কোন গোপিনী শ্রীকৃষ্ণের চন্দনচর্চিত বাহুদুটি নিয়ে নিজের স্কন্ধে ধারণ করলেন।

এই প্রকার আচরণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নায়িকাদের মৈত্র্য এবং দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পায়। এখানে নায়কের সঙ্গে নায়িকার আচরণ সম্ভ্রমরহিত হওয়ায় মিত্রতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই উদাহরণগুলিতে সুস্পষ্ট প্রণয় ও কৃষ্ণ-স্পর্শ-জনিত চিত্তদ্রব সূচিত হয়েছে। প্রণয় নিবিড় না হলে, করতল মধ্যে নায়কের করপল্লব চেপে ধরা বা তাঁর বাহুদুটি স্কন্ধে তুলে নেওয়া ইত্যাদি নিঃসঙ্কোচ আচরণ নায়িকার পক্ষে সম্ভব হয় না।

সখ্য

সাধ্বস্ অর্থাৎ সম্ভ্রম বা ভয় থেকে মুক্ত যে প্রণয়-বিশ্বাস তার নাম সখ্য। এই সখ্য প্রায় নিজের বশ্যতার মতোই। ৭৯।

যথা—

বিশাখা শ্রীরাধাকে জিজ্ঞেস করেছিল—সখি! কৌতুকভরে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে নিজের বাহুলতাদুটি রেখে, মাথাটি নত ক'রে তাঁর কানেকানে কি রহস্যবার্তা বলছিলে? ।৮০।

যথা বা—বিষ্ণুপুরাণে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সত্যভামার উক্তি:

তুমি বলো—'সত্যভামা আমার প্রিয়া।' সে কি সত্য?

'যদি তব সত্যবাণী পারিজাত তরু আনি মোর গৃহে কর আরোপণ।
তবে জানি মোর প্রতি তোমার অধিক প্রীতি, এইবারে জানি তোমার মন॥' ৮১।

অপর উদাহরণ:

চন্দ্রমুখীর কোন সখী তার বান্ধবীকে বলেছিল—আমার সখী চন্দ্রমুখী শ্রীকৃষ্ণের বুকে আপন মনোহর বক্ষোরুহ-কোরকদুটি রেখে, কুঙ্কুম দিয়ে তাঁর কপালে পত্রাঙ্কুর তিলক আঁকতে লাগলেন।

অথবা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

'গোপী সঙ্গে রাস করি অন্তর্ধান হৈল হরি গোপী লয়া করিল গমন।
গোপী কহে অহে হরি আমি ত চলিতে নারি লহ মোরে যেথা তোমার মন॥'

শ্রীকৃষ্ণ কোন এক গোপাঙ্গনাকে একদিন একাকিনী গভীর অরণ্যে নিয়ে গেলে, সেই গোপাঙ্গনা নিজেকে সকলের চেয়ে সৌভাগ্যবতী মনে করেছিল। তাই সে গৌরবদৃপ্তা হয়ে বলেছিল—হে কেশব! তোমার যেখানে ইচ্ছা আমায় নিয়ে চলো, কিন্তু আমি যে আর চলতে পারছি না।

এই উদাহরণগুলিতে সখ্য-বিশ্বাস হেতু নায়িকার দৃপ্তা ভাব, এবং সেইজন্য তার মান পরিলক্ষিত হয়। ৮২।

স্নেহ-প্রণয়-মান

স্নেহ থেকে প্রণয় উৎপন্ন হয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে মানের উদ্ভব হয়। কোথাও বা স্নেহ থেকে মান উৎপন্ন হয়ে, প্রণয়ে পরিণত হয়। সুতরাং প্রণয় ও মান—এই দুটির ভিতর পরস্পরের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। সেই জন্য পৃথক্ রূপে এগুলির উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে।

তা ছাড়া, উদাত্ত এবং ললিত—এই দুটি ক্রমের সঙ্গে মৈত্র্য এবং সখ্যের সুসঙ্গতি আছে। তার জন্য সুমৈত্র্য ও সুসখ্য সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে বলা হলো।

সুমৈত্র্য

প্রাতঃকালে চন্দ্রাবলী প্রসঙ্গে তার কোন সখী অন্য এক সখীকে বললে—সুন্দরি! মধুরিপু যখন সখীদের সামনে রজনীর সম্ভোগ-রহস্যের কথা বলতে উদ্যত হলেন, তখন মৃদুলা চন্দ্রাবলী ভ্রূভঙ্গি করতে লাগলেন ও নিজের করপল্লব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখ আবৃত করলেন। সঙ্কোচভরে তিনি অবনতমুখী হলেন।

সুসখ্য

যথা—

বৃন্দা নান্দীমুখীকে বললেন—

'একবার করি অধরচুম্বন খেলাপণ নিরমাণ।
জিনিয়া নাগর রাধার অধর দুবার করিল পান॥
তাহা দেখি রাধা কুটিল নয়নে চাহয়ে নাগর পানে।
ভুজলতা দিয়া অমনি বাঁধিল রোষ করি যেন মনে॥'

এই উদাহরণে অধিক দাক্ষিণ্য প্রকাশিত হলো ব'লে, এটিকে শ্রীমতীর ঘৃতস্নেহাংশরূপে গণ্য করা যায়।

মধু-স্নেহবতী শ্রীরাধার সুসখ্য

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ যখন সখীদের সম্মুখে তাঁর পীত উত্তরীয় পরিত্যাগ ক'রে বক্ষ উন্মুক্ত করলেন, অর্থাৎ বুকে নখরাঘাতের নূতন চিহ্নগুলি সখীদের সামনে খুলে দেখালেন, তখন ভ্রূকুটি ক'রে কম্পিতবদনা গান্ধর্বিকা কাঁচুলিবিমুক্ত রোমাঞ্চিত কুচদ্বয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ আবৃত করলেন। ৮৩।

শ্রীমতী হাত দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বুক আবৃত করবার চেষ্টা করলেন না, পাছে আবার তাঁর বুকে নখের আঘাত লাগে। এখানে নায়িকার অতিশয় সুসখ্য প্রকাশ পাচ্ছে। তবে ভ্রূকুটি এবং কম্পিত অধর ইত্যাদি বিপরীত লক্ষণায় তাঁর মান ও অসূয়া পরিলক্ষিত হলো।

রাগ

প্রণয়ের উৎকর্ষ-হেতু যেখানে চিত্তে অতিদুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়, তাহার নাম রাগ।

যথা—

ললিতা সখীদের বললেন :

'সূর্য্যের কিরণে তপ্ত সূর্য্যকান্তমণি যত, তাথে অদ্রিতট ক্ষুরধার।
তাহাতে দাঁড়াঞা রাধা না জানে মনের বাধা দেখে কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য অপার ॥
দেখ রাধা-প্রেমের মাধুরী।
ইন্দীবর সূর্য্যপরি যেমন চরণ ধরি অচঞ্চল রহিল সুন্দরী।'

প্রখর সূর্যকিরণে উত্তপ্ত বন্ধুরও অতিদুর্গম গিরিতটে তীক্ষ্ণধার করাল শিলাখণ্ডগুলির উপর দাঁড়িয়ে শ্রীরাধা কৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শনে অপার আনন্দ ও সুখ অনুভব করছেন। এই দুর্গম গিরিতটে দুঃখপ্রদ উত্তপ্ত ধারাল শিলাখণ্ডগুলিতে যেন পদ্মফুল বিছানো আছে। শ্রীমতী কোন দুঃখই অনুভব করছেন না। পরন্তু এত দুঃখও যেন তাঁর সুখানুভূতিতে পর্যবসিত হচ্ছে। ৮৪।

কৃষ্ণকে পাবার সম্ভাবনা যখন থাকে না, তখন কৃষ্ণ-সঙ্গের আভাস বা তাঁর সঙ্গজনিত অপবাদের দুঃখও সুখপ্রদ হয়। যে কলঙ্কের কথা শুনে দুঃখ পাবার কথা, তা শুনেও মনে আনন্দ সঞ্চারিত হয়। ৮৫।

রাগভেদ

রাগ দ্বিবিধ—নীলিমা ও রক্তিমা। ৮৬।

নীলিমা

নীলিমা রাগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, নীলী ও শ্যামা। নীলবৃক্ষ (Indigo) এবং শ্যামলতা (Green Creeper) এই দুটি বস্তুর রাগের বা বর্ণের সঙ্গে তুলনায় রাগকে যথাক্রমে নীলা ও শ্যামা রাগ বলে। ৮৭।

নীলীরাগ । ৮।

যে রাগের ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই এবং যা বাইরে খুব বেশী প্রকাশ পায় না, এবং সংলগ্নভাবকে আবৃত করে, বিদগ্ধগণ তাকে নীলী রাগ বলেন।

ধৌত বস্ত্রে নীল দিলে, নীল নিজেকে ততখানি প্রকাশ করে না, যতখানি তৎসংলগ্ন বস্ত্রের শুভ্রভাবকে আবৃত করে। বস্ত্রের শুভ্রভাব নীলের দ্বারা আবৃত হয় এবং নীলের নীলত্ব শুভ্রবাসে সমাহিত (absorbed) হয়। ফলে এই দুটি রাগের স্বতন্ত্র সত্তা আর প্রকট থাকে না। 'দোঁহার অক্ষয় রাগ প্রকাশ নাই তার।'

এই রাগ চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ৮৯।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভদ্রার উক্তি :

'বিশদ আশয়ে তুয়া প্রতারণা গুণ বলি পুনঃ মানে।
চন্দ্রাবলী সনে তোমার পীরিতি সখীরাও নাহি জানে॥' ৯০॥

শ্যামা রাগ

ভীরুতার জন্য যা অল্প প্রকাশিত, এবং যার জন্য চিরকাল ধরে সাধ্য-সাধনা করতে হয়, তাই শ্যামা রাগ। ৯১।

যথা—

কলহান্তরিতা ভদ্রার প্রতি তার সখীর উক্তি :

'পূর্ব্বে কুঞ্জের অন্তরে অল্পমাত্র অন্ধকারে না যাইতে কৃষ্ণের নিকটে।
সেই তুমি কুঞ্জঘরে অতিঘোর অন্ধকারে তারে খুঁজি পড়িছ সঙ্কটে॥'

ভীরুতার জন্য আগে তুমি দিনের বেলায় কুঞ্জভবনের অল্প অন্ধকারেও শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেতে চাইতে না, চকিতা হ'তে। আর এখন, সেই তুমি রজনীর গভীর অন্ধকারে অধিকতর অন্ধকারময় তমালবনে বিপন্না হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার দুঃখ এবং ভীরুতার জন্য গভীর অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানোর কষ্ট তোমার সুখানুভূতিতে পরিণত হয়েছে। ৯২।

রক্তিমা

কুসুম্ভ বা কুসুম ফুলের এবং মঞ্জিষ্ঠালতার যে রঙ, তার সঙ্গে তুলনীয় রাগকে রক্তিমা বা রক্তিম রাগ বলে। ৯৩।

কুসুম্ভ রাগ

'কুসুম্ভ রাগ যেই চিত্তে লাগয়ে তুরিত।
অন্যরাগ দ্যুতি ব্যঞ্জে শোভে যথোচিত॥' ৯৪ ॥

কুসুম্ভ পুষ্পের রঙ স্বভাবতঃ স্থায়ী নয়। কিন্তু অন্য জিনিসের সঙ্গে একত্র সিদ্ধ করলে সে রঙ স্থায়ী হয়। মঞ্জিষ্ঠালতার রঙ স্বভাবতঃ স্থায়ী। শ্রীমতী মঞ্জিষ্ঠারাগিণী। তাই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশে শ্যামলা প্রভৃতি যূথেশ্বরীদের কুসুম্ভরাগ স্থায়িভাব ধারণ করে। শ্রীমতীর মঞ্জিষ্ঠা রাগের দ্যুতি তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যামলার কোন অমিতার্থা দূতীর উক্তি :

'তোমার শ্রবণাবধি ভুজঙ্গ দেখয়ে যদি তারে তুয়া ভুজ বলি মানে।
নানাভাব পরচার এমন স্বভাব তার চিত্তধৈর্য্য ছাড়ে উন্মাদনে॥
তোমার সাক্ষাতে দেখি মুদিয়াছে দুই আঁখি, যে দশা হৈল সাক্ষাৎকার।
কিয়ে অনুরাগিণী কিম্বা হল বিরাগিণী, বুঝিতে আমার হল ভার॥' ৯৫॥

এই অনির্বচনীয় দশা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীরাধার বা তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশে শ্যামলার কৌসুম্ভরাগ স্থায়ী রাগে পরিণত হয়েছে। ৯৬।

মাঞ্জিষ্ঠ রাগ

যে রাগ কিছুতেই নষ্ট হয় না, অন্য কিছুর জন্যও অপেক্ষা করে না, সর্বদাই আপন কান্তির দ্বারা বৃদ্ধিশীল হয়, তাকেই মাঞ্জিষ্ঠ রাগ বলে। যেমন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পারস্পরিক রাগ।

মঞ্জিষ্ঠার রঙ যেমন জলে ধুয়ে ওঠে না, মাঞ্জিষ্ঠ রাগও তেমনি সঞ্চারিভাবের দ্বারা কখনো নষ্ট হয় না। এই রাগ স্বতঃসিদ্ধ শ্যামা রাগের মতো অনন্যসাপেক্ষ এবং আপনা-আপনি বৃদ্ধি পায়। মাঞ্জিষ্ঠ রাগ কুসুম্ভরাগের মতো পরিমিত নয়। অনুরাগ লক্ষণে এ রাগ অন্য কোন রাগের সঙ্গে মেশে না। ৯৭।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের রাগলক্ষণ সম্পর্কে পৌর্ণমাসীর উক্তি :

'উপাধি রহিত জন্ম কখন নহে ত ক্ষীণ অতিভয়েও রস বরিষণ।
ক্ষণে বাড়ে বহুতর অতি চমৎকৃতিকর রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্বোত্তম॥'

রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমানুবন্ধ উৎসব নিরুপম। উপাধি ছাড়াও উৎপন্ন হয়। কোন বিধি-নিষেধ, গুরুজনের ভয়, বা কষ্ট উপস্থিত হ'লে রসের অধিক উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি হয়। সেইখানেই এই প্রেমের চমৎকারিত্ব। ৯৮।

পূর্বে যে সব ভাবের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে চন্দ্রাবলী এবং রুক্মিণী প্রভৃতি নায়িকাদের ভাব হলো ঘৃতস্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র্য, সুমৈত্র্য ও নীলিমা রাগ। শ্রীরাধার ভাব হলো—মধুস্নেহ, ললিত, সখ্য, সুমৈত্র্য, নীলিমা, সুসখ্য এবং রক্তিমা প্রভৃতি। সত্যভামার মধ্যেও এই লক্ষণগুলি আছে। এসব ছাড়াও, ব্রজসুন্দরীদের মধুরাখ্য স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি বিবিধ ভেদ এবং স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ তটস্থ ও প্রতিপক্ষ প্রভৃতি প্রকারভেদ আছে।৯৯—১০১।

অনুরাগ

যতবার প্রিয়কে দেখে, ততবার যেন মনে হয় নতুন। যতবার অনুভব করে, ততবারই মনে জাগে অনাস্বাদিত অনুভূতি। এই অবস্থার নাম অনুরাগ। ১০২।

নায়কের মাধুর্য বা মধুরিমা মুহুর্মুহু অনুভূত হলেও, সেই মধুরিমাকে আবার অনুভব করবার অতিশয় তৃষ্ণাকেও অনুরাগ বলে।

যথা—

ললিতাকে শ্রীরাধা বললেন—সখি! শ্রীকৃষ্ণকে বারবার দেখেছি, তবুও যেন মনে হয়, পূর্বে কখনো এমন অপূর্ব মাধুর্য দেখিনি। কি বলবো, যে-কোন একটী অঙ্গে যে শোভা, আমার নয়ন তার অনুমাত্র আস্বাদন করতে পারে না। দেখেও মনে হয়, দেখা হলো না। ১০৩।

যথা বা—

শ্রীরাধা বললেন—এই শ্রীকৃষ্ণ কে, সখি! যাঁর ওই দু' অক্ষর নাম শুনলে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে?

ললিতা বললেন—একি বলছো রাগান্ধে! তুমি তো সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে ক্রীড়া করো।

শ্রীরাধা বললেন—সখি! হেসো না।

শুনে ললিতা বললেন—কিন্তু হে বিমোহিতে! এইমাত্র যে আমরা তাঁর হাতে তোমায় তুলে দিয়েছিলাম।

শ্রীরাধা উত্তরে বললেন—তা সত্যি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, জন্মের মধ্যে যেন আজই প্রথম দেখলাম ওই বিদ্যুৎ-সদৃশ প্রাণেশ্বরকে। ১০৪।

পরস্পর বশীভাব ও প্রেমবৈচিত্ত্য

এই অনুরাগে নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের বশীভূত হয়, উভয়ের বশীভাব স্পষ্ট হয়, এবং অনেক সময় নায়িকার অবশীভাব হয়, অর্থাৎ লজ্জাসরম ইত্যাদি থাকে না। অপ্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করবার আকাঙ্খা হয় এবং বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি হয়, অর্থাৎ নায়িকাকে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করা এবং তার সঙ্গে কলহ ও বিচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটানোর অনুভাব হয়। ১০৫।

বশীভাব

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্দলতার উক্তি :

'রাধা গোবিন্দের প্রেম যেন জম্বুনদ হেম পরস্পর বাড়িবারে চায়।
কৃষ্ণমন কুঞ্জর রাইক প্রেম নিগড় সদাবদ্ধ আছয়ে তাহায়॥
কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব মাধুরী।
যাহার প্রেমের গুণে রাধার মনোহরিণে বান্ধিয়াছে নিজবশ করি॥'

প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রেমবৈচিত্ত্যে বিপ্রলম্ভভাব পরে বর্ণিত হবে। ১০৬।

অপ্রাণীতে জন্ম-লালসা

যথা—দানকেলিকৌমুদীতে

ললিতাকে শ্রীরাধা বলেছিলেন :

'সাগরে যাইয়া কামনা করিব বেণু হব এইবার।
ত্রিভুবন মাঝে যতেক জনম বেণু সে সকল সার॥
যে তপ করিয়া মুরলী হয়েছে সদা রহে শ্যাম করে।
অধরের সুধা বড়ই মধুর মনোসুখে পান করে॥' ১০৭॥

বিপ্রলম্ভে স্ফূর্তি

যথা—

মথুরাগামী কোন পান্থকে সম্বোধন ক'রে ললিতা বলেছিলেন :

হে পথিক ! তুমি মধুরায় গিয়ে মাথুরানাথকে উচ্চকণ্ঠে এই কথা বলো যে, কোন ব্রজসুন্দরী তোমায় জানিয়েছে—হে কৃষ্ণ ! তুমি রাজধানীতে গিয়ে থাকতে চাও, স্বচ্ছন্দে থাকো। কিন্তু চারিদিকে স্ফূর্তিশীল হয়ে কেন আমার দুঃখিনী প্রিয়সখীকে বারবার এমন ক'রে দুঃখ দিচ্ছ ! ১০৮।

ভাব

অনুরাগ যদি আপনা-আপনি সংবেদনযোগ্য বা উন্মুখতা প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশ পায়, তা'হলে তাকে ভাব বলে। ১০৯।

যথা—

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন :

'জৌ রাধাকৃষ্ণ মন খেদে করি বিলেপন ভেদভ্রম দূর করি দিল।
ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্যের মাঝ শৃঙ্গার চিত্রকরাজ নবরাগ হিঙ্গুল তাথে দিল॥
বিরচিল বড়ই অদ্ভুত।
তাথে চিত্র কৈল যেই পরম মোহন সেই তাহা নহে কাহার বিদিত॥'

রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরের চিত্ত যেন জতু অর্থাৎ লাক্ষা। প্রেমের উত্তাপে দ্রবীভূত হয়ে দুটি চিত্ত একসঙ্গে মিলিত হলো। দুটি হৃদয়ের মধ্যে ভেদভ্রম দূরীভূত হলো। দ্রবণের দ্বারা স্নেহময় এবং একীভূত হয়ে মিলিত হওয়ায়, প্রণয় সূচিত হলো। জতুর হিঙ্গুলবর্ণের দ্বারা উভয়-চিত্তের মহাভাব অর্থাৎ অনুরাগের উৎকর্ষ সংবেদিত হয়। ১১০।

মহাভাব

উল্লিখিত ওই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের মধ্যে তত সুলভ নয়। কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীদের পক্ষেই সম্ভব। এই ভাবকে মহাভাব বলে। ১১১।

এই মহাভাবই শ্রেষ্ঠভাব এবং অমৃততুল্য সমৃদ্ধিতে চিত্তকে পরিপূর্ণ করে। চিত্ত নিজস্ব রূপ প্রাপ্ত হয়। ১১২।

বিদগ্ধগণ এই ভাবকে রূঢ় এবং অধিরূঢ় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ১১৩।

রূঢ়ভাব

যে মহাভাবে প্রণয়ের সাত্ত্বিক মনোভাবগুলি (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় বা মূর্ছা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ভাব) উদ্দীপ্ত হয়, তাকে রূঢ়ভাব বলে। ১১৪—১১৫।

রূঢ়ভাবের অনুভাব

রূঢ়ভাবের অনুভাবে নায়িকা একটি নিমেষও ধৈর্য রাখতে পারে না। সে অবস্থা দেখে, নিকটস্থ জনের মনেও ক্ষোভ উপস্থিত হয়। অতিঅল্পকালকে কল্পকাল ব'লে মনে হয়। এ অবস্থায় নায়কের সুখেও নায়িকার মনে দুঃখের শঙ্কা জাগে।

'একক্ষণ কান্তে যদি না দেখে নয়নে।
অতি অল্পক্ষণ কল্পকাল করি মানে॥
এই সব অনুভাব রূঢ়ভাবে হয়।
যোগ বিয়োগ উচিত করিএ নির্ণয়॥' ১১৬॥

নিমেষের অসহিষ্ণুতা

যথা—

অনেকদিন পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অভীষ্টলাভের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে তারা বলতে লাগলো, হায় বিধাতা! তুমি নয়নে পল্লব দিলে কেন? চোখের পাতা না থাকলে যে প্রিয়তমকে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে পেতাম।

যোগিগণের নিকট দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণকে তারা নয়নপথে হৃদয়ে আলিঙ্গন ক'রে, ভাবে গদগদ হয়ে উঠলো। ১১৭।

নিষ্প্রয়োজনবোধে প্রতিটী অনুভাবের পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ দেওয়া হলো না। ১১৮-১২২।

অধিরূঢ় ভাব

যাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবগুলি থেকে সাত্ত্বিকভাবসমূহ কোন বিশিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়, তাকে অধিরূঢ়ভাব বলে। ১২৩।

যথা—

মহাদেব পার্বতীকে বললেন :

'ত্রিভুবনের যত সুখ আর যত আছে দুখ সবে যদি একত্র মিলয়।
রাধার সুখদুঃখসিন্ধু তার যে একটিবিন্দু তাহার তুলনা নাহি হয়॥'

লোকাতীত কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সব সুখদুঃখ যদি একত্র করা হয়, তবুও শ্রীরাধার প্রেমোৎপন্ন মিলন ও বিরহের বিন্দুমাত্র সুখদুঃখের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। শ্রীরাধার সুখদুঃখসিন্ধুর তুলনায় সে যেন একটি বিন্দুর চেয়েও কম। ১২৪।

অধিরূঢ়ভাবের মোদন ও মাদন—এই দুই প্রকারভেদ হয়।

মোদন ভাব

যে অধিরূঢ় ভাবে রাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাবগুলির উদয় হয়, তার নাম মোদন। ১২৫।

যথা—ললিতমাধবে

'রাধাকৃষ্ণের উল্লাস কল্পতরু পরকাশ তাহে কলকণ্ঠনাদ শুনি।
স্তম্ভশোভা অতিশয় শোভিত অঙ্কুর হয় স্বেদজল মুক্তাফল জিনি॥
অতি শোভে সেই তরুবর।
অশ্রুজল মধু পড়ে কাঁপয়ে বিভ্রম ভয়ে তার মূল বড় দৃঢ়তর॥' ১২৬॥

যে অধিরূঢ় অনুভাবে কান্তাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ে বিক্ষোভ-ভয় সঞ্চারিত হয় এবং প্রেমসম্পদে মহীয়সী কান্তাগণের প্রেমাধিক্য ব্যক্ত হয়, তার নাম মোদন। ১২৭।

এই মোদন শ্রীরাধার যূথেই সম্ভব হয়, সর্বত্র হয় না। মোদনই হ্লাদিনী শক্তির প্রিয়তর শ্রেষ্ঠ বিলাস। ১২৮।

কান্তাগণের ক্ষোভকারিতা

যথা—

কুরুক্ষেত্র যাত্রাকালে ব্রজদেবীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন হয়েছিল, তার বর্ণনা শুনে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ চমৎকৃতা হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তরে ব্রজদেবীগণকে দেখবার অভিলাষ হলেও তাঁরা আপন-আপন গৃহে নির্জনে অবস্থান করছিলেন। শ্রীরাধার 'মোদন' ভাব উদিত হয়েছিল। কিন্তু রুক্মিণীর অতিশয় ক্ষোভ দেখে, তাঁর কোন এক সখী অন্যসখীকে বলেছিল—শ্রীরাধার প্রেমতরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণরূপ সাগর অবরুদ্ধ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের চেয়ে শ্রীরাধার প্রেমের আধিক্যই অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য ও গরীয়ান্।

ভদ্রা দেবীর বাণী স্তব্ধ হলো। কালিন্দীর বাষ্পমোচন হতে লাগলো। নর্মদায়িনী সত্যভামার ইতস্তত ভ্রমণ আরম্ভ হলো। গাম্ভীর্যশালিনী রুক্মিণী দেবী বিবর্ণা হলেন। তাঁদের ক্ষোভের অন্ত রইল না।

শ্রীমতীর মোদন ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হলে, মহিষীরা কথঞ্চিৎ সুস্থ হলেন। শ্রীরাধার স্তব ক'রে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর আপন-আপন গৃহে ফিরে গেলেন। কিন্তু শ্রীরাধা তাঁদের লক্ষ্যও করেন নি। তিনি আপন-ভাবে বিভোরা হয়ে ছিলেন। ১২৯।

প্রেমোরুসম্পদ্বতী বৃন্দাতিশায়িত্ব

যথা—

রুক্মিণী দেবীর সখীর উক্তি :

দেখ, শ্রীরাধার অনুরাগ সমুদ্রে যে তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, তার অন্বয়ভাব মহেশ্বরের অঙ্কস্থিতা পার্বতীকে, নারায়ণের বক্ষস্থিতা

লক্ষ্মীকে এবং শ্রীকৃষ্ণের মনোভৃঙ্গের নলিনী সত্যভামা ও প্রাণসখী চন্দ্রাবলীকে দূরে ক্ষেপণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে রুদ্ধ করেছে।

'যে ভবানী শিবগায়ে অর্ধঅঙ্গ হয়ে রয়ে নারায়ণের বক্ষে লক্ষ্মী রহে।
সত্যভামা বড় প্রিয়া চন্দ্রাবলী অতিশয়া তথাপি রাধার তুল্য নহে॥'

মোহন ভাব

বিশ্লেষদশাতে মোদন ভাব মোহন নামে কথিত হয়। এই মোহন ভাবে বিরহ-বিবশতার জন্য নায়িকার সাত্ত্বিক ভাবগুলি আরো সুষ্ঠুভাবে দীপ্তি পায়। ১৩০।

যথা—

বৃন্দাবন হতে উদ্ধব যখন মথুরায় ফিরে গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বৃন্দাবনের বার্তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন:

শ্রীরাধার তনু বিকম্পিত হচ্ছে, স্বরভঙ্গ হয়েছে, চোখের জলে যমুনা বয়ে যাচ্ছে, নয়ন বাষ্পাকুল এবং অঙ্গসকল জড়সড়। তোমার বিরহে চম্পকবরণী শ্রীরাধা পাণ্ডুর হয়ে শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছেন। তাতেও যেন শ্রীমতীর এক আশ্চর্য রূপ বিকশিত হয়েছে।

শ্রীমতীর এই মোহনভাবে সাত্ত্বিকভাবগুলি অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩১।

মোহনের অনুভাব

এই মোহনভাবে কান্তার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মোহ, শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করবার জন্য কান্তার অসহ্য দুঃখ স্বীকার, মরণপণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা এবং দিব্যোন্মাদাদি নানা অনুভাব হয়। একমাত্র বৃন্দাবনেশ্বরীতেই এই মোহনভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। সঞ্চারি মোহতেও এই ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৩২।

কান্তা-আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা

পদ্যাবলীতে কবি উমাপতি ধরের উক্তি:

যথা—

'দ্বারকার রত্নঘরে বসিয়াছে যদুবরে রুক্মিণী করিয়া আলিঙ্গন।
রাধাকুঞ্জে রাধা সঙ্গে স্মরয়ি সে সব রঙ্গে অমনি হইল মুরছন॥'

রাজপ্রাসাদে রুক্মিণী দেবীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, এমন সময় যমুনাতীরের কুঞ্জে শ্রীরাধার কেলি-পরিমল স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা উপস্থিত হলো। মাধবের এই প্রেম বিশ্বকে রক্ষা করুন। ১৩৩।

নিষ্প্রয়োজনবোধে মূর্চ্ছার অন্যান্য উদাহরণগুলি এখানে দেওয়া হলো না। ১৩৪-১৩৬।

মৃত্যুস্বীকার ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা

যথা—

ললিতার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি :

'তনু হোক বিনাশন তার যত ভূতগণ মহাভূতে করুক প্রবেশ।
বিধির চরণ ধরি বহুত বিনয় করি তাথে এই যাচিয়ে বিশেষ॥
যাথে স্নান করে হরি আমার অঙ্গের বারি সেই সরোবরে রহু যায়া।
কৃষ্ণ মুখ দেখে যাথে হেন সেই মুকুরেতে মোর তেজ রহু লয় হয়া॥
কৃষ্ণের যে অঙ্গন তাথে রহু শূন্যগণ ক্ষিতি রহু গোবিন্দের পথে
কৃষ্ণের যে বীজন মোর অঙ্গপবন চিরকাল লীন রহু তাথে॥'

দিব্যোন্মাদ

যে অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ এই মোহন ভাবে বিভ্রম সৃষ্টি ক'রে বিচিত্র দশার উদ্ভব করে, তাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি অবস্থাভেদ ঘটে।

উদ্‌ঘূর্ণা

'অঙ্গের বিবশতা হয়ে নানা চেষ্টা হয়।
উদ্‌ঘূর্ণা বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥'

বিবশতায় নানা চেষ্টার বিলক্ষণ প্রকাশকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে। ১৩৭।

এ অবস্থায় নায়িকা বিরহের আতিশয্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। বিরহ উদ্‌ভ্রমে নানা দশা উপস্থিত হয়।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব বললেন : হে কেশব! তোমার বিরহে ব্যথিতা শ্রীরাধার কোন্ দশাই বা না হলো! তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কখনো বাসকসজ্জায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করছেন। কখনো খণ্ডিতাভাব অবলম্বন ক'রে অতিশয় কোপবশতঃ নীল মেঘকে তর্জন করছেন। কখনো বা অভিসারিকা হয়ে নিবিড় অন্ধকারে একাকিনী ভ্রমণ করছেন। ১৩৮।

ললিতমাধবের তৃতীয় অঙ্কে, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর, শ্রীরাধার এই উদ্‌ঘূর্ণাভাব বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৩৯।

চিত্রজল্প

প্রিয়তমের সুহৃদের সঙ্গে যদি বিরহিণী নায়িকার দেখা হয়, তা হলে গূঢ়-রোষবশে নায়িকা যে অজস্র কথা বলে, তাকে চিত্রজল্প বলে। এইভাবে নানা কথা বলার পর, পরিশেষে নায়িকার মনে তীব্র উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়।—'এসব কথা কেন অন্যের কাছে বললাম!'

এই চিত্রজল্পের আঙ্গিক দশ রকমের। প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প।

এই দশবিধ চিত্রজল্প শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের 'ভ্রমর গীতে' বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৪০

প্রজল্প

অসূয়া, ঈর্ষা, ও মদযুক্ত অবজ্ঞা প্রকাশের সঙ্গে প্রিয়তমের অকৌশলের কথা অনর্গল ব'লে যাওয়ার নাম প্রজল্প। ১৪১।

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় অবস্থান কালে একদিন তাঁর পরম সুহৃদ্ উদ্ধব বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত বার্তাবহ

মনে ক'রে, গোপাঙ্গনারা নির্জনে নিয়ে গিয়ে, পরম সমাদরের সঙ্গে আতিথেয়তা করলেন। উদ্ধবকে দেখে শ্রীমতীর মনে হঠাৎ গূঢ় অসূয়া, ঈর্ষা, গর্ব, অনাদর ও পরিহাসপূর্ণ দিব্যোন্মাদভাব উদিত হলো। উদ্ধব তাঁকে প্রণাম করতে গেলে, তিনি চরণকমলের সৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমর কল্পনা ক'রে, উদ্ধবকে নানা প্রজল্প বাক্য শোনাতে লাগলেন। সে বাক্যে অসূয়া, মথুরাস্থ সপত্নীগণের প্রতি ঈর্ষা, গর্বযুক্ত অবজ্ঞা ও শ্রীকৃষ্ণের অকৌশলের কথা উদ্গীরিত হলো।

পরিজল্প

প্রভুর নির্দয়তা, শঠতা এবং চাপল্যদোষ প্রতিপন্ন ক'রে যাতে নিজের বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হয়, তাকে পরিজল্প বলে। ১৪২।

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

'অধরের সুধা যেই পরম মোহন সেই আমাদিকে করাইল পান।
ভৃঙ্গ যেন ছাড়ে ফুল করিতে মন ব্যাকুল হরি কৈল মথুরা পয়ান॥
নির্দয় সে যদুপতি চপল কুটিল অতি, ভাবিতে অদ্ভুত লাগে মোরে।
তার এই কিবা গুণ হরিল লক্ষ্মীর মন, আসি পুনঃ পদসেবা করে॥'

অধরসুধা পান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সদ্যসদ্য বৃন্দাবন ত্যাগ করায় শঠতা ও নির্দয়তা প্রকাশ পায়। তাঁর চপলতা এবং লক্ষ্মীর বা কমলার সরলতার কথা বলায়, নিজের বিচক্ষণতা সূচিত হয়।

বিজল্প

গূঢ়মানের অন্তরালে যেখানে সুস্পষ্ট অসূয়া প্রকাশ পায় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষোক্তি করা হয়, তাকে বিজল্প বলে। ১৪৩।

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

'হে দে হে নির্ব্বুদ্ধি ভৃঙ্গ ছাড়হ গানের রঙ্গ আমরা কেবল বনবাসী।
ত্বরায় যদুসভা যাও কৃষ্ণপ্রিয়া গুণ গাও সেথা গেলে পাবে সুখরাশি॥'

হে ভ্রমর! তুমি গোপীগণের মাঝখানে বারবার গান গাইছ কেন? এখানে গান গেয়ে কিছু মিলবে না। আমরা গৃহহীনা,

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। তোমার উপর আমাদের কোন কোপ নাই। তাই উপদেশ দিচ্ছি, কামযুদ্ধে যাদের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন, যদুপুরে গিয়ে সেই কৃষ্ণপ্রিয়াদের গুণগান করো। শ্রীকৃষ্ণ তাদের বক্ষোরোগের উপশম করেছেন। সুতরাং তারা অবশ্যই তোমার অভীষ্ট পূরণ করবে।

এখানে মানগর্ভ অসূয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নায়িকার উপহাসাত্মক কটাক্ষ প্রকাশ পায়। তৃতীয় ব্যক্তির কাছে নায়িকার এই ধরণের উক্তিকে বিজল্প বলে।

উজ্জল্প

যাতে গর্ব ও ঈর্ষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্যের কথা উল্লিখিত হয়, এবং সেই অসূয়ার সঙ্গে সর্বদাই আক্ষেপ থাকে, অর্থাৎ গুণে দোষারোপ করা হয়, তাকে উজ্জল্প বলে। ১৪৪।

যথা—

'স্বর্গভূমি রসাতল তাথে যে নারী সকল কেহ তোমার সুদুর্লভ নয়।
যে তোমার কপট হাস বাঁকা ভুরুর বিলাস যাথে পদ্মা পদদাসী হয়॥'

সংজল্প

পায়ে ধরে অনুনয় করতে চায়, কিছুতেই নিরস্ত করা যায় না, এমন ব্যক্তির কাছে আক্ষেপের সঙ্গে প্রিয়তমেব অকৃতজ্ঞতার কথা বলাকে সংজল্প বলে। এ অবস্থায় প্রিয়তমাও আক্ষেপে ভেঙে পড়েন। ১৪৫।

যথা—

'পদ ছাড় ভৃঙ্গ তুমি, তোমারে জানি যে আমি, তুমি বহু জান অনুনয়।
তোহে দেখি দূতবরে মুকুন্দ পাঠাল তোরে এ ত তোমার উপযুক্ত নয়॥
ওহে ভৃঙ্গ, দেখ আমাদের অপমান।
যার লাগি সব ছাড়ি, ছাড়ি গেল হেন হরি, তার সনে কিসের সন্ধান॥'

এই উদাহরণের প্রথমাংশে সোল্লুণ্ঠ আক্ষেপ এবং শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা, নির্দয়তা, নায়িকাদ্রোহিতা, ও প্রেমশূন্যতা প্রকাশ পায়।

বিরহিণী শ্রীরাধা পাদপতিত দূতকে বললেন—দৌত্যকর্মে তুমি পটু, পটুবাক্য প্রয়োগে বিলক্ষণ চতুর। মুকুন্দের হয়ে তুমি অনুনয় জানিয়ে দৌত্য করতে এসেছ। কিন্তু একথা বলো না যে, মুকুন্দের অপরাধ নাই। তাঁর জন্য ইহলোক পরলোক সব ত্যাগ করেছি। কিন্তু তিনি এমন অব্যবস্থিতচিত্ত যে, অনায়াসে আমাদের বিসর্জন দিলেন। তাঁর সন্ধান রাখা কি আমাদের উচিত?

শ্রীমতীর এই উক্তিতে আক্ষেপ, এবং দয়িতের অকৃতজ্ঞতা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। ১৪৬।

অবজল্প

শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, কামিত্ব এবং ধূর্ততার জন্য নায়িকার চিত্তে ভয় ও ঈর্ষার সঞ্চার হয়, এবং সেইজন্য সে দয়িতকে আসক্তির অযোগ্য ব'লে বর্ণনা করে। ১৪৭

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

'পূর্ব্ব জন্মে রাম হঞা বালি কপি বিনাশিয়া যেহ কৈল ব্যাধের আচার।
শূর্পনখার নাসাকর্ণ তাহা কৈল ছিন্ন ভিন্ন বড়ই নির্দ্দয় মন তার॥
পুনশ্চ বামন হয়া বলির সর্ব্বস্ব লয়া পুনঃ তারে করিল বন্ধন।
হেন কৃষ্ণবর্ণ যে তার সখ্য চাহে কে, তভু তারে নাহি ছাড়ে মন॥' ১৪৮॥

অভিজল্প

যিনি পক্ষিগণকেও খেদান্বিত করেছেন অর্থাৎ যাঁর জন্য বৃন্দাবনের পশুপক্ষীরাও বেদনার্ত্ত, তাঁকে ত্যাগ করাই উচিত: ভঙ্গিসহ এইরূপ অনুতাপ প্রকাশ করাকে অভিজল্প বলে। ১৪৯।

যথা—

হে মধুকর! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতিস্থাপন ক'রে আমরা যে দুঃখিনী হবো, তাতে আর বিচিত্র কি! তাঁর লীলার কথা শুনে, সমস্ত জীবজগৎ আজ খেদান্বিত ও দুঃখিত। বিহঙ্গেরা যেমন কুলায় ত্যাগ ক'রে দিক্‌দিগন্তে ঘুরে প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে, আমরাও তেমনি গৃহ ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ ক'রে, 'হা কৃষ্ণ!' ব'লে আক্ষেপ ক'রে বনে বনে ঘুরে, কোন রকমে প্রাণধারণ করে আছি। এ হেন কৃষ্ণকে ত্যাগ করাই উচিত।

ভঙ্গিসহ এই প্রকার উক্তি করাকে অভিজল্প বলে। ১৫০।

আজল্প

খেদ ও নৈরাশ্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও নির্মমতার কথা, অর্থাৎ তিনি দুঃখ দেন এইকথা, উল্লেখ ক'রে নায়িকা ভঙ্গির সঙ্গে যে আক্ষেপ-উক্তি করে, তাকে আজল্প বলে। ১৫১।

যথা—

'আমরা মুগ্‌ধা নারী তার কথায় শ্রদ্ধা করি বান্ধা গেনু যেমন হরিণী।
তাহার পাইনু ফল দুঃখে তনু টলমল জর-জর এসব কামিনী॥
শুন আমার মন্ত্রণা বচন।
অন্য কথা কহ মুখে শুনি মনে পাই সুখে, না করিহ কৃষ্ণের বর্ণন॥'

প্রতিজল্প

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই দ্বন্দ্বভাবে অর্থাৎ প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হয়ে অবস্থান করছেন। সে অবস্থা ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে কঠিন। সুতরাং আমরা তাঁকে পেতে পারি না।

দূতের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে, নায়িকা এই প্রকারের যে সব উক্তি করেন, তাকে প্রতিজল্প বলে। ১৫২।

যথা—

হে মাননীয় দূত! তুমি আমার প্রিয়তমের সখা। এখানে তিনি তোমায় পাঠিয়েছেন। তুমি কি বর চাও বলো? বলো, তোমার কোন্ অনুরোধ রক্ষা করতে হবে? হে সৌম্য! তুমি কেন আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাও! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান। তুমি তো জানো, তিনি সতত শ্রীবধূকে হৃদয়ে ধারণ করে আছেন। সেখানে গিয়ে, ব্রজাঙ্গনাদের পক্ষে তাঁর সঙ্গলাভ সম্ভব হবে না।

সুজল্প

গাম্ভীর্য, সরলতা, দৈন্য ও চাপল্যের সঙ্গে উৎকণ্ঠিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করাকে সুজল্প বলে। ১৫৩।

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

'শুধাই বিনয় করি মথুরাতে আছে হরি পিতৃগৃহ স্মরে কি কখন।
গোপগণে পড়ে মনে এই দিব্য বৃন্দাবনে মনে পড়ে যত কেলিগণ॥
মোরা তাঁর দাসীগণ কভু করেন স্মরণ কিছু কথা কহেন কখন।
তার সেই ভুজদ্বন্দ্ব যাহাতে অগুরু গন্ধ পুনঃ কিয়ে পাব পরশন॥'

দূতের নিকট শ্রীমতী প্রশ্ন করলেন:

আর্যপুত্র কি এখন মথুরাতেই আছেন? পিতৃগৃহের কথা কি তাঁর কখনো মনে হয় না? তাঁর গোপবন্ধুদের কথা কি কখনো স্মরণ হয় না! এই কিঙ্করীদের কথা কি তিনি কখনো বলেন না! তাঁর অগুরুগন্ধচর্চিত বাহুদুটি কি আর কখনো আমাদের মস্তকে স্থাপন করবেন না? আমরা কি তাঁর স্পর্শ আর কখনো পাবো না!

শ্রীমতীর প্রথম প্রশ্নে সরলতা, দ্বিতীয় প্রশ্নে গাম্ভীর্য, তৃতীয় প্রসঙ্গে দৈন্য এবং চতুর্থ প্রসঙ্গে চপলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। ১৫৪।

উল্লিখিত উদাহরণে মোহনের অনুভাব ও দিব্যোন্মাদ অবস্থাগুলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মাদন

হ্লাদিনীর সার (Essence of Pleasure Force) প্রেম। এই প্রেম যদি রতি-আদি মহাভাব-উদ্গমে উল্লাসশীল হয়ে ওঠে, তা হলে তাকে মাদন বলা যায়। এই মাদন (Ecstacy) পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং এই মাদনভাব সর্বদা শ্রীরাধাতেই বিরাজিত হয়। অন্যত্র এ ভাবের উদয় হয় না। ১৫৫।

যথা—

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বললেন, দেবি! এই ভাব সৃষ্টির আদি থেকে অক্ষয়। এ ভাব হৃদয়রূপ চন্দ্রকান্তমণিকে দ্রবীভূত করে এবং পূর্ণ হয়েও বক্রভাব ধারণ করে; আপন কান্তিতে ভয়রূপ অন্ধকার দূর করে। সমস্ত জগতের হর্ষস্বরূপ এই ভাব সায়ংকালে নবনব সম্পদে শোভা বিস্তার করে। রাধাকৃষ্ণের এই মাদনভাব অদ্বৈত। তাকে প্রণাম করি। তার স্তব করি। ১৫৬।

এই মাদনরস ঈর্ষার অযোগ্যপাত্রেও প্রবল ঈর্ষা সঞ্চারিত করে এবং সর্বদা সম্ভোগে তার গন্ধমাত্র-আধার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত গন্ধের যে-কোন আধারের স্তুতি করায়। ১৫৭।

যথা—দানকেলিকৌমুদীতে

ঈর্ষার অযোগ্য বস্তু বনমালা দেখে শ্রীরাধা ঈর্ষা প্রকাশ ক'রে বললেন:

'শুদ্ধ ব্রজনারীবৃন্দ নাহি জানে ভালমন্দ সুচরিত সরল অন্তর।
অহে কৃষ্ণের বনমালা তাহাদিগে করি হেলা তুমি মিছা দ্বেষ কেন কর॥
এই শুদ্ধ ব্রজনারী তারে তৃণতুল্য করি সদা রহ গোবিন্দের অঙ্গে।
আপাদমস্তক লয়া কৃষ্ণঅঙ্গ আলিঙ্গিয়া হৃদয়ে বিহার কর রঙ্গে॥'

হে বনমালা! আমরা শুদ্ধহৃদয়া ব্রজনারী, তোমায় কখনও ঈর্ষা করি না। কিন্তু তুমি বিদ্বেষপরবশ হয়ে আমাদের প্রতি এমন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছো কেন? শ্রীকৃষ্ণের শিখা থেকে চরণ

পর্যন্ত আলিঙ্গন ক'রে, তুমি তাঁর বিশাল হৃদয়ে বিহার করছো।

সম্ভোগে তদ্‌গন্ধ বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় গন্ধমাত্রের আধারের স্তুতি :

'পুলিন্দী রমণীগণ রম্য তাদের জীবন যারা কৃষ্ণচরণকুঙ্কুম।
তৃণে লগ্ন তাহা পাঞা আপনা হৃদয়ে লঞা সদাই কৌতুকী হয় মন ॥'

দয়িতার স্তনের কুঙ্কুম রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অনুলিপ্ত হয়েছিল। বনস্থলী পরিভ্রমণহেতু সেই কুঙ্কুম তৃণদলে লগ্ন হয়েছে। সেই তৃণদল থেকে কুঙ্কুম নিয়ে শবররমণীরা আপন-আপন আননে ও কুচদ্বয়ে লেপন ক'রে অনঙ্গদাহ প্রশমিত করছে।

তৃণদলের সৌভাগ্য এবং শবররমণীদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা নায়িকার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করছে। তৃণদল শ্রীকৃষ্ণের চরণকুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়েছে। আর শবররমণীদের প্রেম এত নিবিড় যে, তৃণলগ্ন চরণকুঙ্কুমের স্পর্শে তাদের অনঙ্গদাহ প্রশমিত হচ্ছে। ১৫৮।

যথা বা—

শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—প্রিয় সখি! এই কোমলা মালতী পূর্বজন্মে না-জানি কি কঠোর তপস্যা করেছিল। আহা! তাই সে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্যামকান্তি এই তমালতরুকে আলিঙ্গন করেছে। ১৫৯।

এখানে, তমালতরু ও মালতীলতা উভয়েই শ্রীরাধার ঈর্ষার অযোগ্য পাত্র, তবুও এই উক্তিতে শ্রীমতীর মনে ঈর্ষা সঞ্চারের আভাস পাওয়া যায়।

সম্ভোগকালে অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার মধ্যে যখন সংযোগ সংস্থাপিত হয় তখন নিবিড় আনন্দে এক বিচিত্র মাদনরসের উদ্ভব হয়। নিত্যলীলায় এই মাদনের বিলাপ সহস্রপ্রকারে বিরাজ করে। ক্ষণেক্ষণে উৎপন্ন মাদনোচ্ছ্বাসে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন ও চুম্বন ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা মাদনের কারকতা অনুভূত হয় ও স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ১৬০।

মাদনের সুন্দর গতি ও কার্যকলাপ রোধ করবার সাধ্য স্বয়ং মদনেরও নাই। এমন কি, মুনিগণও এর কারকতা সঠিক নির্ণয় করতে পারেন নি।

স্থায়িভাব—উপসংহার

প্রথমে রাগ উৎপন্ন হয়ে অনুরাগে পরিণত হয়। সে অবস্থা থেকে সত্বর স্নেহের উৎপত্তি হয়। তারপর মান, প্রণয় ইত্যাদির সঞ্চার হয়ে থাকে। অবশ্য শ্রীরাধা প্রভৃতি নায়িকার ক্ষেত্রে পূর্বরাগ থেকেই রাগলক্ষণের আবির্ভাব হয়েছে; মানপ্রণয়াদির অভাবে তা ব্যাহত হয়নি। ১৬১।

কৃষ্ণপ্রেমে ব্রজদেবীগণের যে-সব শ্রেষ্ঠভাব স্ফুরিত হয়েছে, তা তর্কের অতীত। সেইহেতু তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হলো না।

সাধারণী রতিতে ধূমায়িতভাব, সমঞ্জসা ও সমর্থারতিতে জ্বলিত ভাব এবং স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ প্রভৃতিতে দীপ্তভাবের বৈশিষ্ট্য থাকে। আর রূঢ়ভাবে উদ্দীপ্তভাব এবং মোদনাদিভাবে সুদীপ্তভাব শোভা পায় বা বিদ্যমান থাকে। ১৬২।

রতি-বিপর্যয়

সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতিতে উল্লিখিত ভাবগুলি প্রায়ই বজায় থাকে, তবে দেশকাল ও পাত্রভেদে তার কিছুকিছু ব্যতিক্রম হয়। পাত্রগণের শ্রেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ ইত্যাদি ভাবভেদে রতি-বিপর্যয় ঘটে। কেবলমাত্র রতিতে দীপ্তভাব হয়, কারণ দীপ্তভাব সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। কিন্তু স্নেহাদিতে জ্বলিত ভাব ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। ১৬৩।

রতিসীমা

আদ্যা অর্থাৎ সাধারণী রতি প্রেম পর্যন্ত পৌঁছায়। সমঞ্জসায় অন্তসীমা অনুরাগ পর্যন্ত। আর সমর্থা রতির অন্তসীমা মহাভাব পর্যন্ত।

সাধারণী রতি প্রেম ও সম্ভোগের সীমা অতিক্রম করে না। রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের রতি তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপ্ত এবং প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমর্থা রতিতে সকল ভাবই স্থায়ী। ১৬৪।

নর্ম-বয়স্যদের রতি অনুরাগের অন্তসীমা পর্যন্ত অবস্থিত হয়। কিন্তু সুবল প্রভৃতি সখাদের যে রতি, তা ভাবের অন্তিম সীমা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৬৫।

ইতি স্থায়িভাববিবৃতি।

শৃঙ্গারভেদ। ১।

বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগভেদে উজ্জ্বল রস দু'প্রকার হয়। ২।

বিপ্রলম্ভ

নায়ক ও নায়িকার অযুক্ত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন এবং যুক্ত বা মিলিত অবস্থায় পরস্পরের অভিমত, আলিঙ্গন ও চুম্বন ইত্যাদির অভাব ঘটলে যে-ভাব প্রকটিত হয়, তাকে বিপ্রলম্ভ বলে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক অর্থাৎ স্থায়িভাবের মাধুর্য বৃদ্ধি করে।

দীর্ঘানুরক্তয়োর্য়ূনোঃ রসমায়মহেতুতঃ
ভাবো যদা রতির্ণাম প্রকর্ষমধিগচ্ছতি।
নাভিগচ্ছতি চাভীষ্টং বিপ্রলম্ভস্তদুচ্যতে॥

অতিশয় অনুরক্ত যুবক ও যুবতীর মধ্যে যখন সমান সুযোগের অভাবহেতু ভাব উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হয় না, তখন তাকে বিপ্রলম্ভ বলা হয়। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের উন্নতি ও পুষ্টি কারক। ৩।

বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি সাধিত হয় না। বিপ্রলম্ভে ঈপ্সিতকে লাভ করবার আকাঙ্খা ও তার জন্য চিত্তের আবেগ গভীর থেকে গভীরতর হয়, ফলে অন্তরে অনুরাগের রঙ ধরে। একবার রঞ্জিত বসনকে পুনরায় রঞ্জন করলে যেমন তার রাগবৃদ্ধি হয়, তেমনি বিপ্রলম্ভে রঞ্জিত অন্তর সম্ভোগরসে নিমজ্জিত হলে তার রাগ বহুগুণ বিবর্ধিত হয়।

পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস ভেদে বিপ্রলম্ভ চার রকমের হয়। ৪।

পূর্বরাগ

মিলিত হওয়ার পূর্বে দর্শন এবং শ্রবণাদি থেকে যে রতি উৎপন্ন হয়ে নায়ক ও নায়িকার চিত্তকে উন্মীলিত করে, এবং বিভাবাদির সংমিশ্রণে অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন সম্পর্কে জড়িত হয়ে আস্বাদময় হয়ে ওঠে, প্রাজ্ঞগণ তাকে পূর্বরাগ বলেন।

দর্শন

সাক্ষাৎ, চিত্রপট এবং স্বপ্নাদিতে নায়ককে দেখার নাম দর্শন। এইভাবে নায়কও নায়িকাকে দর্শন করতে পারেন।

সুতরাং দর্শন তিন প্রকার হতে পারে। সাক্ষাৎ, চিত্রপট এবং স্বপ্নদর্শন।

সাক্ষাৎ দর্শন

যথা—পদ্যাবলীতে

বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি :

'বিকশিত ইন্দীবরদলনিন্দিত তনুরুচি জগত মাতায়।
কাঁচা কাঞ্চন জিনি অতি সুন্দর পীতবাস পহিরল তায়॥
সখি হে, ফিরি দেখ এ হেন রঙ্গ।
বুক মাঝে হায় কোন বরনাগর মঝু মনে দেওল অনঙ্গ।' ৫।

এখানে নায়কের সাক্ষাৎ দর্শন নায়িকার মনে পূর্বরাগ সঞ্চার করেছে।

চিত্রপট দর্শন

যথা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধা :

'পুনঃ পুনঃ পরিজনগণ মঝু বোলল চিত্রক দরশন লাগি।
যব ধরি পথমাঝে দেখনু নাগর মঝু মনে লাগল আগি॥
মুগধিনী নাগরী কাহে এত জানব দেখি হনু আনন্দে ভোর।
কো জানে অমৃতজলধি মাঝে বাড়ব এ তনু দাহন মোর॥'

পূর্বে আত্মীয়-স্বজনের কথায় তোমার চিত্রফলকস্থিত মূর্তি দেখেছিলাম। শিশিরের মতো স্নিগ্ধ তোমার চোখদুটি ও দিব্যকিশোর তনু আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমরা সরলচিত্তা নারী তাই বুঝতে পারিনি যে, ওই স্নিগ্ধতার অন্তরালে নিবিড় বাড়বানলের জ্বালা আছে। ৬।

এখানে চিত্রফলকে নায়ককে দেখে, নায়িকার চিত্তে পূর্বরাগ ও রতি-উত্তাপের সঞ্চার হয়েছে।

স্বপ্নদর্শন

সাক্ষাৎ দর্শন ও চিত্রদর্শন থেকে যেমন পূর্বরাগের সঞ্চার হয়, তেমনি স্বপ্নদর্শন থেকেও পূর্বরাগ সঞ্চারিত হতে পারে। শুধু পূর্বরাগ কেন, স্বপ্নদর্শনে নায়ক বা নায়িকার রতিসম্ভোগ পর্যন্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

যথা—

স্বপ্ন দেখে চন্দ্রাবলী পদ্মাকে বলেছিল—সখি! আজ এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। প্রথমে দেখলাম, একটী শ্যামবর্ণ জলশালিনী নদী। তারপর ওই নদীর তীরে দেখলাম একটি মাধবীকুঞ্জ। সেই কুঞ্জে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে। কুঞ্জের মাঝখানে একটি গৃহ। সেই কুঞ্জগৃহে তিমিরবরণ এক কান্ত পীতবাস পরিধান ক'রে বিরাজ করছেন। তিনি যেন চন্দ্রাবলীকে পান করবার জন্য উৎসুক হয়ে অশ্রুবিসর্জন করছেন।

শ্রবণ

বন্দী বা স্তুতিকার, দূতী ও সখী প্রভৃতির মুখে শুনে বা গান শুনে নায়ক সম্পর্কে নায়িকার চিত্তে পূর্বরাগের সূচনা হতে পারে।

বন্দীর মুখে শ্রবণ

যথা—

লক্ষ্মণাকে তার সখী বললে, তোমার স্বয়ম্বর সভায় বন্দিবর যখন স্তুতিপাঠ ক'রে বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন, তখন তোমার তনু কেমন পুলকিত হয়েছিল বল তো!

দূতীমুখে শ্রবণ

যথা—

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে মুকুন্দ! তোমার দূতী হয়ে যখন তারার নিকট গিয়ে তোমার রূপের বর্ণনা করলাম, তার অঙ্গ পুলকিত ও নয়ন আনত হলো। আরো কিছু শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে সে প্রশ্ন করতে উদ্যত হলো। কিন্তু তার মুখে কথা ফুটলো না। কণ্ঠস্বর গদগদ হলো।

সখীমুখে শ্রবণ

যথা—

বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

'মোর সহচরী তোমার এরূপ শুনিয়া বচনে মোর।
সেদিন অবধি তনু অতিক্ষীণ ভাবিয়া না পাই ওর ॥'

সেই উন্মাদ চকোরীলোচনা সখী যেদিন আমার মুখে তোমার কথা শুনেছেন, সেই দিন থেকে শরৎকালের নদীর মতো দিন দিন তাঁর তনু ক্ষীণ হচ্ছে।

গীতশ্রবণে

যথা—

লক্ষ্মণা তার সখীকে বললে, হে সখি! আমার পিতা বৃহৎ সেনের সভায় দেবর্ষি নারদ সজল নয়নে বীণা বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করছিলেন। তাই শুনে আমার নয়ম অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

রতি উৎপত্তির হেতুস্বরূপ যে সব অভিযোগের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তাতে বিপ্রলম্ভ স্থলে পূর্বরাগের সূচনাই যথোচিত ভাবে প্রকটিত হয়ে থাকে। ৭।

পূর্বরাগ প্রথমে মাধবের অর্থাৎ নায়কেরই সঞ্চারিত হয়। বয়ঃসন্ধির পর যৌবন-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয়ের মনই পরস্পরের সন্ধানে উৎসুক হয়। চিত্তের এই প্রথম চাঞ্চল্য বা ঔৎসুক্যকে (the first disturbance of equilibrium of the mind)। ভাব বলে। এই ভাব থেকেই পূর্বরাগের সূচনা হয়।

'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া।'

—কৌস্তভ অলংকার।

এই ভাব পুরুষ ও নারী উভয়ের মনেই সমভাবে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু নারী স্বভাবতঃ লজ্জাবতী ও ধৈর্যশীলা। সেই জন্য পুরুষের পূর্বরাগ যত সহজে প্রকটিত হয়, নারীর তা হয় না। তবে যেহেতু নারী স্বভাবকোমলা, এবং সুকুমার অনুভূতি ও রাগে তাদের অধিক চারুতা থাকে, সেইহেতু পূর্বরাগ-প্রসঙ্গে মৃগাক্ষীদের কথাই প্রথম বলা হয়েছে। ৮।

'আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়োবাচ্যঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদঙ্গিতৈরিতি।'

—সাহিত্য দর্পণ।

প্রকৃতি-ধর্মানুযায়ী নারীর প্রেমের আধিক্য ও আত্যন্তিকতার সঙ্গে পুরুষের প্রেমের তুলনা হয় না। রস ভক্তকে আশ্রয় করেই প্রকট হয়। ভক্ত যেমন ভগবানে অনুরক্ত হওয়ার পর ভক্তের প্রতি ভগবানের 'রাগ' বা অনুরাগ সঞ্চারিত হয়, তেমনি নারী অনুরাগিণী হওয়ার পর পুরুষের অনুরাগ তার প্রতি প্রকট হয়। পুরুষের চেয়ে নারীর আত্মনিবেদনের শক্তি ও নিষ্ঠা অনেক বেশী। সেই সঙ্গে চারুতার আধিক্য বর্তমান থাকে ব'লে, নারীর বা নায়িকার পূর্বরাগাদি রস অধিক সুষ্ঠু ও প্রকাশমান। নায়িকার রাগে মাধুর্য

বেশী। নায়িকার স্বভাবগত লজ্জা যেমন পূর্বরাগ প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তেমনি আবার একথাও অত্যন্ত সত্য যে, প্রেম সঞ্চারিত হলে, নায়িকার বা নারীর লজ্জা প্রভৃতির বালাই আর থাকে না। কৃষ্ণ-প্রেমে ব্রজদেবীগণের স্থান ভক্তের অধিক, সেই জন্য তাঁদের পূর্বরাগ প্রথমেই প্রকটিত হয়েছে।

সঞ্চারিভাব

পূর্বরাগাদি রতি বিষয়ে যে সব সঞ্চারিভাবের উদয় হয়, তার মধ্যে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ওই রতি প্রৌঢ়, সমঞ্জস এবং সাধারণ—এই তিন প্রকার হয়।

প্রৌঢ়

সমর্থ রতির স্বরূপকে প্রৌঢ় বলে।

দশ দশা

প্রৌঢ় পূর্বরাগে লালসা থেকে মরণ পর্যন্ত দশটি দশার উদ্ভব হয়। সঞ্চারিভাবে আরো অনেক রকম উৎকট অবস্থার উদ্ভব হয়। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতেরা সংক্ষেপে ওই দশ দশার কথাই বলেছেন। তাঁদের মতে ওই দশ অবস্থার বা দশার লক্ষণ হলো—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

পূর্বরাগের প্রৌঢ়ত্ব হেতু সব দশাগুলিই প্রৌঢ় হয়। ৯।

লালসা। ১০

অভীষ্টলিপ্সায় গাঢ়গৃধ্নুতা অর্থাৎ অভীষ্টলাভের জন্য মনে যে প্রবল আকাঙ্খা হয়, তাকে লালসা বলে। এই লালসায় ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১১।

যথা—

শ্রীরাধাকে ললিতা বললেন :

'পুনঃ পুনঃ কেন সদন ছাড়িয়া বাহির হইছ তুমি।
অমনি তুরিতে প্রবেশিলে ঘর বুঝিতে না পারি আমি॥
গুরুজন ভয়ে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অমনি বসিছ কেনে।
চঞ্চল নয়নে কেন বা চাহিছ যমুনা কুঞ্জ পানে॥'

হে কিশোরি! তুমি ঘণ্টায় শতবার কেন গৃহ থেকে বার হয়ে ব্রজসীমায় যাচ্ছ ও আবার ফিরে আসছো? গুরুজনের ভয়ে কেন অমন ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলে কদম্ববনের দিকে চাইছো? ।১২।

লালসার পরিপাক অবস্থা

যথা বা—বিদগ্ধমাধবে

বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে মাধব! দূর থেকে যদি প্রসঙ্গতঃ তোমার নামের একটী অক্ষরও শ্রীমতীর কানে প্রবেশ করে, তা হলে সেই মদিরেক্ষণা উন্মাদের মত হন। তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হয়। হায়, কি বলবো! নবজলধর নয়নগোচর হলে, দুটি বাহুলতা প্রসারিত ক'রে তিনি আলিঙ্গন করতে উদ্যতা হন। তাঁর চিত্ত উৎসুক হয়ে ওঠে। তিনি বলেন—হে সখি! আমায় দুটো ডানা এনে দাও, আমি উড়ে গিয়ে আমার প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করি।

উদ্বেগ

মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ। উদ্বেগে দীর্ঘনিঃশ্বাস, স্তব্ধতা, চিন্তা অশ্রু, বিবর্ণতা ও ঘর্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৩।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীরাধার অবস্থা দেখে, বিশাখা তাঁর মনের কথা জানবার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল—সখি! কিসের চিন্তায় তোমার ধৈর্য নষ্ট হলো? ঘামে তোমার অরুণাভ তাম্রবর্ণের শাড়ি ভিজে উঠেছে। বেপথুমানা হয়ে তনুস্থিরতা হারিয়ে ফেলেছ। সারা দেহ থরথর ক'রে কাঁপছে।

হে চম্পকগৌরি! বলো কিসের এই উদ্বেগ তোমার? যথার্থ বলো। আপন-জনের কাছে মনের কথা গোপন করতে নাই। তাতে ভালো হয় না।

জাগর্যা

নিদ্রাহীনতাকে জাগর্যা বলে। জাগর্যায় শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়। জড়তা (stupor) আসে, দেহ বিশুষ্ক ও শীর্ণ হয়। মন অশান্ত হয়ে ওঠে। ১৪।

যথা—

বিনিদ্র রজনীতে শ্রীরাধার অবস্থা দেখে, বিশাখার চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠলো। সে ভাবছিল, অন্তঃপুরে গুরুজনেরা আছেন। সেখানে সে কেমন ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে আনবে! আর অন্তঃপুরচারিণী শ্রীমতীকেই বা কেমন ক'রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিয়ে যাবে!—এই চিন্তায় বিশাখার অন্তর বিষাদে ভরে উঠলো।

বিশাখাকে সম্বোধন ক'রে শ্রীমতী বললেন—প্রিয়বান্ধবী, নিদ্রা নামে এক সখী একবার এসে ক্ষণকালের জন্য স্বর্ণোজ্জ্বল পীতবাসধারী এক শ্যামবর্ণ পুরুষকে আমার নয়ন সম্মুখে উপস্থিত করেছিল। তারপর সেই যে রুষ্ট হয়ে সে নিদ্রা চলে গেল, আর একটি বারের জন্যও ফিরে এলো না। এখন আর ভেবে কোনো লাভ নাই সখি; কিসে সেই নিদ্রা আবার আসবে, তার চেষ্টা করো। সে ছাড়া সেই স্বপন-চোরকে আর কেউ আনতে পারবে না।

তানব

তনু-কৃশতার নাম তানব। এতে দুর্বলতা এবং অস্থিরতা বা ইতস্তত ভ্রমণাদি উৎপন্ন হয়। ১৫।

যথা—

বিশাখাকে তার সখী বললে—

'হাতের বলয়চয় খসি হাত শূন্য হয়, তাহে অমঙ্গল আশঙ্কিয়া।
বলয়েরে আবরিতে পুইছা পরিল হাতে, সেহ পড়ে বাহির হইয়া॥'

মুরলীধ্বনি শুনে তোমার তনু কৃষ্ণা-চতুর্দশীর চাঁদের মতো ক্ষীণ হয়েছে। হাতের বলয় খসে পড়ছে। নিরাভরণ হাত নারীর পক্ষে অকল্যাণকর ব'লে, পৈছা অথবা অঙ্গুরীয় ধারণ করেছিলে। কিন্তু হায়, তাও যে স্খলিত হয়ে পড়ছে!

কোন-কোন পণ্ডিতের মতে তানবের স্থলে বিলাপ উল্লিখিত হয়েছে।

যথা—

শ্রীরাধা বিলাপ ক'রে বললেন—সখীগণ! এই যমুনার কূলে নবনীপ-তরুমূলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে বিহার করতে করতে নৃত্য করছিলেন। লতামণ্ডপের অন্তরালে লুকিয়ে থেকে, আমি ব্যগ্রচিত্তে তন্ময় হয়ে তাই দেখছিলাম। কিন্তু হায়, কি বলবো! পোড়া বিধি আমায় দাবানলে নিক্ষেপ করলো। মদন জ্বালায় আমি জ্বলেপুড়ে মরলাম।

জড়িমা

যাতে ভালোমন্দ-জ্ঞান লোপ পায়, প্রশ্ন করলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না, চোখে কিছু দেখে না, কানে কিছু শোনে না, সেই অবস্থার নাম জড়িমা। ১৬।

এই জড়িমাস্থলে অকস্মাৎ হুঙ্কার, স্তব্ধতা, শ্বাস ও ভ্রম প্রভৃতি জন্মায়। ১৭।

যথা—

কোন সখী পালিকে জিজ্ঞেস করেছিল—হে পদ্মমুখি! অকারণ কেন হুঙ্কার দিচ্ছ, প্রিয় সখীদের আলাপ শুনছো না, ত্রস্ত হয়ে মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছো? আমার আশঙ্কা হচ্ছে, নিশ্চয়ই মধুর মুরলীধ্বনি তোমার কর্ণে প্রবেশ করেছে।

বৈয়গ্র্য বা ব্যগ্রতা

ভাবের গভীরতা বা অতলস্পর্শতার জন্য যে চিত্তবিক্ষোভ এবং তার জন্য অসহিষ্ণুতা সঞ্চারিত হয়, তাকে বৈয়গ্র্য বা ব্যগ্রতা বলে। এই ব্যগ্রতায় বিবেক-বৈরাগ্য, খেদ ও অসূয়া প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বললে—দেবি, আশ্চর্য! মুনিগণ বিষয়চিন্তা ত্যাগ ক'রে যে কৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করেন, এই বালা শ্রীরাধা কি না সেই কৃষ্ণ থেকে মন প্রত্যাহার ক'রে বিষয়কর্মে অর্থাৎ গৃহকর্মে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করছেন! হৃদয়ে তাঁর স্ফূর্তির কণামাত্র ধারণ করবার জন্য যোগিগণ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই মুগ্ধা সেই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা করছেন।

ব্যাধি

অভীষ্টকে না পেয়ে, দেহে যে পাণ্ডুতা ও উত্তাপ প্রভৃতি সঞ্চারিত হয়, অর্থাৎ মুখচোখ ফেকাশে ও জ্বরভাবের উৎপত্তি হয়, তাকে ব্যাধি বলে! এই ব্যাধিতে নায়িকার কখনো শীত করে, কখনো মনে স্পৃহা জাগে, কখনো বা মোহ, দীর্ঘশ্বাস, পতন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। ১৮।

যথা—

ভদ্রার সখী শ্রীকৃষ্ণকে বললে, হে মুরারি! তুমি দাবানল দমন করেছিলে; এই কথা শুনে, আমার সখী ভদ্রা মদন-দাবানলে প্রজ্জলিতা হয়ে, তোমায় হৃদয়ে ধারণ করেছিল। কিন্তু তাতে ওই অনলের উপশম না হয়ে, সে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছিল। সেই ব্যথায় তার দেহ ভস্মের মতো পাণ্ডুর হয়েছিল।

উন্মাদ

সব সময় সব অবস্থায় তন্ময়তার জন্য সর্ববস্তুতে ভ্রান্তি ঘটে। যেটা যা, তাকে তাই ব'লে মনে হয় না, অন্যবস্তু ব'লে ভ্রম হয়। এই অবস্থাকে উন্মাদ বলা হয়। নায়িকার এই উন্মাদ-দশায় ইষ্টের প্রতি দ্বেষ, দীর্ঘশ্বাস ও নিমেষে-নিমেষে বিরহ ইত্যাদি উপস্থিত হয়। ১৯।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীরাধা তাঁর সখীদের বললেন :

'পটমাঝে মরকত সুন্দর নাগরে যব ধরি দেখল হাম।
কুটিল দৃগঞ্চল মঝু পর দেওল মনোমাঝে বিতরল কাম॥
তব ধরি আগনি শশী সম লাগই শশী ভেল আগুনি সমান।
কাতর অন্তর জরজর হোয়ল ছটফট করই পরাণ॥'

চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, শ্রীমতীর উন্মাদ অবস্থা উপস্থিত হলো। মনে হলো, চিত্রপট হতে বেরিয়ে ওই শিখিপুচ্ছধারী নবযুবা মরকতকান্তি বিস্তার করে, মৃদুহাসির সঙ্গে শ্রীমতীর দিকে ভ্রূ-নিক্ষেপ করছেন। শ্রীমতীর চিত্ত উন্মাদিত হলো। হায়, জ্যোৎস্না-পুলকিত সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিমাও যেন তাঁর উপর অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো!

মোহ

যাতে চিত্তের নিষ্ক্রিয়তা বা বিপরীত গতি হয়, তাকে মোহ বলে। এই মোহ উপস্থিত হ'লে, নায়িকার নিশ্চলতা ও পতন ইত্যাদি ঘটে। ২০।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম নিবেদন ক'রে বিশাখা বললে—হে কৃষ্ণ! তোমার চিন্তায় মোহগ্রস্তা হয়ে, শ্রীমতী নিশ্চল হয়ে ভূপতিতা হয়েছিলেন। তাঁর নাকে নিঃশ্বাস পড়ছিল না। চোখদুটি ঊর্ধ্বে উঠে স্থির হয়েছিল। তাই দেখে, জটিলা বলেছিল—হায়!

কেমন ক'রে বধূর এই বিপরীত গতি হলো? আমার হাতে কিছু কৃষ্ণতিল এনে দাও, আমি অপামার্জন করি—ওর ভূত ছাড়াই। কৃষ্ণতিল ছড়িয়ে মন্ত্র পড়লে সব অমঙ্গল দূর হবে।

জটিলা কৃষ্ণতিলের কথা বলতে, যে-ই কৃষ্ণ এই দুটি অক্ষর কানে গেল, অমনি শ্রীমতীর দেহে কম্পন উপস্থিত হলো। হে অচ্যুত! আমার সখী তোমাকেই এর হেতু ব'লে অবধারণ করেছেন। তুমিই তাঁর এই অবস্থার মূল কারণ।

মৃত্যু

যা যা করা দরকার তা সব ক'রেও যদি প্রতিকার না হয়, দূতীকে পাঠিয়ে নিজের প্রেম পীড়ার কথা জানিয়েও যদি কান্তের সমাগম না হয়, তা হলে কন্দর্প-বাণের পীড়নে নায়িকা অনেক সময় মরণের উদ্যম করে। এই অবস্থায় সে তার প্রিয় বস্তুগুলি সখীদের বিলিয়ে দেয়, মধুপগুঞ্জন, মৃদুমন্দপবন, জ্যোৎস্না, কদম্ব ইত্যাদিকে অতিনিবিড় ভাবে অনুভব করে।

যথা—

পৌর্ণমাসীকে শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জানিয়ে, বৃন্দা বললেন: রাধা তাঁর স্বহস্তরোপিত মুকুলিত মল্লীলতাকে আলিঙ্গন ক'রে, নিজের হীরকখচিত মণিহার ললিতাকে দিলেন এবং মধুপগুঞ্জিত কদম্ববনে প্রবেশ ক'রে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণনাম সঞ্জীবনী দিয়ে সখীরা তাঁকে সঞ্জীবিতা ক'রে রেখেছেন।

যথা বা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষায় মর্মাহতা হয়ে শ্রীমতী কালীয়হ্রদে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হলে, বিশাখা রোদন করতে লাগলেন। তাই দেখে শ্রীরাধা চোখের জল মুছে, বিশাখাকে বললেন—সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হন, তা হলে তোমার অপরাধ কি? বৃথা

রোদন ক'রো না। এই একটিমাত্র পরম উপকার তুমি আমার ক'রো—সেই হবে উৎকৃষ্ট চরমকাজ। দেখো, আমার এই তনুলতা যেন বৃন্দাবনের ওই তমালশাখায় লীন হয়ে চিরকাল অবিচলিত থাকে। ২১।

উদাহরণ পদ—

'না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ফেলিও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো, তমালের ডালে॥
আমি তমাল বড় ভালবাসি,
আমার কৃষ্ণ কালো—তমাল কালো,
তাই তো তমাল ভালবাসি॥'

শ্রীরাধার এই প্রকার উক্তির তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করবার যে প্রবল আকাঙ্খা তাঁর অন্তরে চিরজাগ্রত হয়ে আছে, সেই আকাঙ্খা যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সফল না হয়, তা হলে কৃষ্ণশ্যাম ওই তমালতরুকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁর কামনা পূর্ণ হবে। এখানে মাদন রসের সঙ্গে মোদন রস সমন্বিত হয়েছে।

সমঞ্জস

যা সমঞ্জসা রতির স্বরূপ, তাকে সমঞ্জস বলে। এই সমঞ্জসে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপযুক্ত উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা প্রভৃতি ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়।

সমঞ্জস রতি সঙ্গমের পূর্বে আবির্ভূত হয় এবং বিভাবাদির মিলনে, অর্থাৎ আলম্বন এবং সেই আলম্বনকে আশ্রয় ক'রে যে উদ্দীপন সঞ্চারিত হয় তারই সমন্বয়ে, সমঞ্জস নামক পূর্বরাগ রস সঞ্চারিত করে।

অভিলাষ

প্রিয়সঙ্গলিপ্সা বা প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গ-লালসা থেকে অন্তরে যে চেষ্টা সঞ্জাত হয়, তাকে অভিলাষ বলে। এই অভিলাষের দ্বারা নায়িকার বেশভূষার উৎকর্ষসাধন ও মনোগত রাগের বিকাশ হয়।

যথা—

সত্যভামাকে তার কোন সখী বললে :

'সত্যভামা তোরে কই সুভদ্রার সঙ্গে সই ছলে যাও দেবকীর ঘর।
বসন ভূষণ গায় নিতি নিতি যায় তাই কিছু আছে মনের ভিতর॥'

সুভদ্রার সঙ্গে তোমার সখ্য আছে, তাই ব'লে তুমি রোজ রোজ দেবকীর গৃহে যাচ্ছ। কিন্তু তা হ'লে তোমার মণ্ডন ও প্রসাধনে এত যত্নবতী হওয়ার কি প্রয়োজন? আজ দেখেশুনে এই কথাই স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, তোমার অন্তরে নিশ্চয়ই কোন গূঢ়ভাব আছে।

চিন্তা

অভীষ্টপ্রাপ্তির উপায় অনুধাবন করাকে চিন্তা বলে। অর্থাৎ কি উপায়ে অভীষ্টলাভ হবে তার উদ্ভাবনের জন্য যে ধ্যান, তাই চিন্তা। এই চিন্তায় বিছানায় শুয়ে বারবার এ-দিক ও-দিক ফেরা, ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলা, এবং দেখবার কিছু না থাকলেও পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।২২।

যথা—

চিন্তাক্লিষ্টা রুক্মিণীর অবস্থা দেখে, তার প্রতিবেশিনী বললে—হে কমলমুখি, ঘনঘন নিঃশ্বাসে তোমার ওষ্ঠবিম্ব ম্লান হচ্ছে, দেহযষ্টি কৃশ হয়েছে, চোখের কাজল ধুয়ে অশ্রুধারা বইছে, বারবার শয্যা গ্রহণ করছো, কেন? কাল তোমার বিয়ে আর আজ এমন বিকল হওয়া কি সাজে!

স্মৃতি

পূর্বে অনুভূত প্রিয়বস্তু বা প্রিয়জনের রূপ, গুণ, বেশ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা, অথবা সেগুলি মনে উদিত হওয়াকে স্মৃতি বলে। এই স্মৃতিতে কম্প, অঙ্গের বিবর্ণতা, নয়নে বাষ্পসঞ্চার ও দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যথা—

সত্যভামাকে তার কোন সখী বললে—হে সাত্রাজিতি! তোমার নয়নকমলদুটি অশ্রুপ্লুত হয়েছে। রথচক্রসদৃশ কুচদ্বয় কম্পিত হচ্ছে। বাহুমৃণালদুটি শ্লথ হয়েছে। তাই মনে হয়, তোমার হৃদয়-সরোবরে কৃষ্ণরূপ হস্তী বিহার করছেন।

হাতী তড়াগে নেমে যদি জলকেলি করে, তা হলে উৎক্ষেপিত জলরাশিতে যেমন পদ্মগুলি জলপূর্ণ হয় এবং তড়াগ ও তটভূমি আন্দোলিত হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি চিত্ত-সরোবরে কেলিরত হওয়ায় সত্যভামার কুচদ্বয় কম্পিত হচ্ছে, বাহুমৃণাল শিথিল হয়েছে ও নয়নপদ্মদুটি জলপূর্ণ হয়েছে।

গুণকীর্তন

সৌন্দর্যাদি গুণের বর্ণনায় শ্লাঘা প্রকাশ করাকে গুণকীর্তন বলে। দয়িতের গুণকীর্তনে কম্প, রোমাঞ্চ ও কণ্ঠ গদগদ হয়। ২৩।

যথা—

রুক্মিণী পত্র লিখে বললেন—হে কৃষ্ণ! তোমার রূপসম্পদের মধু পান করবার জন্য তৃষিতা হয়ে যুবতীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে মধু পান করলে যে তাদের কি অবস্থা হতো, তা বলতে পারি না। তুমি নিজেই সে রূপমাধুর্য দর্পণে দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলে। সে রূপের মধুর গন্ধ লাভ করা দূরে থাক, তার কথা ভাবতেই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। আমার চিত্তভৃঙ্গ স্থির থাকছে না। ২৪।

প্রৌঢ় রতিতে উদ্বেগ প্রভৃতি ছয়টি মানসিক অবস্থার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সমঞ্জসা রতির ক্ষেত্রেও সেই ছয়টি মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়। *

* উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি বা মরণেচ্ছা

সাধারণ

সাধারণপ্রায় রতিকে সাধারণ বলা হয়। এতে বিলাপ পর্যন্ত ষোলটি ভাবের কথা বলা হয়েছে। এই ষোলটি ভাব অতি কোমল (delicate)। সেইজন্য এগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্জিত হয়েছে। বিলাপান্ত ছয়টি দশার বিষয় উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে। এই ছয়টি দশা হলো—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ ও বিলাপ। ২৫।

অভিলাষ

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধে

শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, কৌরব পুরস্ত্রীগণের অন্তরে বাসনা জেগে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণকে কামনা ক'রে তাঁরা বলেছিলেন :

'কত তপ করি তারা হয়েছিল নারী, যাহাদের পতি এই সুন্দর মুরারি।'

যদিও ওই স্ত্রীত্বে স্বাধীনতা ও শুচিতা নাই, কেন না তাঁরা সকলে ধর্মসম্মত পত্নী নন, অর্থাৎ যথারীতি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রে ওই পতি-পত্নী সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। তবুও ওই সব নারী সেই স্ত্রীত্বকে সুশোভিত ক'রে আছেন। তাঁদের গৃহ থেকে এই পদ্মলোচন পতি কোনো সময়ের জন্য বাইরে যান না, উপরন্তু পারিজাত প্রভৃতি নানা সুন্দর ও প্রিয়বস্তু আহরণ ক'রে তাঁদের উপহার দিয়ে সর্বদাই হৃদয়ের আনন্দ বর্ধন করেন।

যাঁরা অতিধীর ব্যক্তি, অর্থাৎ অতিকোমল কামতন্ত্র চিন্তাদিতে যাঁদের চিত্ত কখনও চঞ্চল হয় না, তাঁরা অন্যান্য ভাবগুলির উদাহরণ ও বিশ্লেষণ (analysis) করবেন।

পূর্বরাগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বয়স্যদের হাতে নায়িকাগণের নিকট কামলেখ ও মাল্য প্রভৃতি পাঠিয়েছেন।

কামলেখ

যে লেখা নিজের প্রেম প্রকাশ করে, তাকে কামলেখ বলে। নায়িকার নিকট নায়কের বা নায়কের নিকট নায়িকার পত্র-মাধ্যমে যে কামেচ্ছা-প্রকাশ (self proposal), তারই নাম কামলেখ।

কামলেখ দু-রকমের হয়—নিরক্ষর ও সাক্ষর। একটি সাংকেতিক জ্ঞাপন, অপরটি লিপি।

নিরক্ষর কামলেখ

সুরক্ত কোন নব পল্লবে নখচিহ্নিত অর্ধচন্দ্র, যাতে কোনো বর্ণ বা অক্ষর লিখিত থাকে না, তাকে নিরক্ষর কামলেখ বলে।

যথা—

বিশাখা তার সখীর হাতে একখানি কামলেখ পাঠিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই কামলেখ হৃদয়ে ধারণ ক'রে সুবলকে বললেন—

বিশাখা তার নখাগ্র দিয়ে এই কিশলয়-শিখরে একটি অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত করে পাঠিয়েছে। এটী যেন কন্দর্পের অর্ধচন্দ্র বাণ! না জানি কেমন ক'রে হঠাৎ এই পত্র কন্দর্পবাণ হয়ে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। ২৬।

সাক্ষর কামলেখ

যেখানে গাথাময়ী লিপি অর্থাৎ ভাষায় লিখিত পত্র প্রেরিত হয়, সেখানে সেই লিপিকে সাক্ষর বা অক্ষর-সমন্বিত কামলেখ বলা হয়। ২৭।

যথা—জগন্নাথবল্লভ নাটকে

শশিমুখার হস্তে প্রেরিত শ্রীরাধার কামলেখ :

হে-কৃষ্ণ। তুমি দীর্ঘকাল ধরে আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করছো। অপযশ হচ্ছে মদনের! কিন্তু আমি তো মদনকে কোথাও দেখতে পাই না। চারিদিকে শুধু তোমাকেই দেখছি। ২৮।

কামলেখ রচনায় হিঙ্গুলদ্রব কিংবা কস্তুরী মসীরূপে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ পুষ্পদল-পত্র কুস্কুমে মুদ্রিত ক'রে, তাকে পদ্মনালের তন্তু দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা হয়, যাতে লিপিখানি গোপন থাকে।

মাল্য অর্পণ

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত মালাটী শ্রীরাধাকে দিয়ে বৃন্দা বলেছিলেন— সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের শিল্পকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এই মালা গেঁথে তোমার জন্য পাঠিয়েছেন।

এই কথা শুনে, কমলাঙ্গিনী শ্রীরাধার অঙ্গ থেকে স্বেদবারি নির্গত হতে লাগলো। মনে হলো, সেই স্বেদবিন্দুচ্ছলে যেন শ্রীমতীর কুলধর্ম, শঙ্কা, ধৈর্য—সবকিছুই নিঃশেষে বেরিয়ে গেল।

কোনকোন পণ্ডিতের মতে পূর্বরাগের প্রথমে হয় নয়নপ্রীতি, তারপর চিন্তা। চিন্তার পরে জাগে আসঙ্গ লিপ্সা অর্থাৎ সঙ্গকামনা বা আসক্তি। আসক্তির পর মনে সঙ্কল্পের উদয় হয়। তারপর হয় নিদ্রাচ্ছেদ—চোখের ঘুম চলে যায়। তারপরে দেখা দেয় তনুক্ষীণতা বা কৃশতা; কৃশতার পরে বিষয়নিবৃত্তি, এবং তারপর লজ্জানাশ। লজ্জানাশের পর উন্মাদ। তারপরে মূর্চ্ছা, এবং মূর্চ্ছার পরে মৃতি বা আপন মৃত্যুকামনা।

দর্শনে নয়নপ্রীতির সঞ্চার বা 'ভালো-লাগা' থেকে সূচনা হয় পূর্বরাগের। তারপর চিন্তা থেকে মৃতি পর্যন্ত দশটী স্মরদশা বা কামদশা নায়িকার জীবনে পরপর ঘটে। ২৯।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগেও ক্রমপর্যায়ে ওই দশটী স্মরদশার উদ্ভব হয়। তার নিদর্শন ঃ

যথা—

বৃন্দা শ্রীরাধাকে বললেন :

'বংশীক ছোড়ি চিত অতি আকুল নাগর ফিরই গহনে।
বনমালা গলে নাহি পহিরহি আকুল কুণ্ডল নাহি লয় শ্রবণে॥
তুয়া ভুরু ভুজঙ্গিনী তাহে অবদংশল জারল কালীয়দমনে।
সহচর ছোড়ি কুঞ্জমাঝে রহতহি চাহই চঞ্চল নয়নে॥'

সখি! তোমার ভ্রূভুজঙ্গিনী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-পবন পান করায় তিনি বংশীনাদের পরিমল-উল্লাস বিস্মৃত হয়েছেন। বিবিধ কুসুম চয়ন ক'রে আর কুণ্ডল ও বনমালা রচনা করছেন না। সহচরগণের চারুচরিত্রে আর তাঁর কোনো আকর্ষণ নাই। সে সব বিষয়ে আর কোনো তৃষ্ণা তাঁর নাই। তিনি সবকিছুই ত্যাগ করেছেন। ৩০।

ইতি পূর্বরাগপ্রকরণ।

মান

পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতির বা নায়ক-নায়িকার বাঞ্ছিত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদি অর্থাৎ পরস্পরের মুখপানে চাওয়া ইত্যাদি কার্যে যে মনোভাব বাধা দেয় বা নিরোধ করে, তাকে মান বলে।

এই মানে নির্বেদ বা বৈরাগ্য, শঙ্কা, অমর্ষ বা ক্রোধ, চপলতা, গর্ব, অসূয়া, অবহিত্থা বা ভাবগোপন, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব হয়। ৩১।

প্রণয়ই মানের উত্তম ক্ষেত্র অর্থাৎ যুবক-যুবতী বা নায়ক-নায়িকার ভাববন্ধন যখন প্রণয়ের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখনই মানের প্রকৃষ্ট স্ফূর্তি হয়। এই মান সহেতু ও নির্হেতু ভেদে দু'প্রকার। ৩২।

'জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিৎ মানতাংব্রজেৎ।
স্নেহান্মানঃ কচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাপ্নুতে॥'

স্নেহ থেকে প্রণয় উৎপন্ন হয়ে কোথাও মান সঞ্চারিত হয়, কখনো বা স্নেহ থেকে মানের উৎপত্তি হয়ে প্রণয় উদ্ভূত হয়; এই জন্যই মানবিষয়ে প্রণয়কেই শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলা হয়েছে।

সহেতু মান

যেখানে মানের কোন হেতু বা কারণ থাকে, তাকে সহেতু মান বলে। সাধারণতঃ মানের কারণ ঈর্ষা। মনে ঈর্ষা হলেই মানের উদয় হয়। প্রিয়জনের মুখে বিপক্ষের গুণকীর্তন বা বৈশিষ্ট্যের কথা শুনলে প্রণয়মুখ্য যে ভাবের উদয় হয়, তাই থেকে নায়িকার ঈর্ষামান উদ্ভূত হয়। ৩৩।

স্নেহ ব্যতীত ভয় হয় না। স্নেহ থাকলেই নায়ক বা নায়িকার মনে ভয় হয় যে, এই বুঝি হারালাম! এই বুঝি ব্যথা দিলাম!

আর প্রণয় ব্যতীতও ঈর্ষা হয় না। প্রণয়ে ভাববন্ধনের দৃঢ়তা সম্পর্কে নায়ক-নায়িকার মনে স্থির বিশ্বাস থাকে। তাই অপর পক্ষীয়ের গুণকীর্তন শুনে মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে। সে ঈর্ষা প্রকাশে মনে কোনো ভয় থাকে না, সেই জন্য এই প্রকার মান উভয়েরই প্রেম-প্রকাশক হয়। ৩৪।

নায়ক যখন কোন অপরাধ করে, নায়িকার প্রতি তার ভয় হয়। আবার নায়কের অপরাধের জন্য নায়িকার মনে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়। এই দুই কারণে নায়ক ও নায়িকার মনে মানরূপ রসের সঞ্চার হয়। এখানে ভয়ের কারণ স্নেহ এবং ঈর্ষার কারণ প্রণয়। নায়কের সঙ্গে সখ্য স্থাপিত না হ'লে নায়িকার মনে ঈর্ষা জন্মাতে পারে না। আবার নায়িকাসম্পর্কে নায়কের চিত্তে আর্দ্রভাব বা স্নেহ না থাকলে, নায়কের মনেও ভয় হয় না।

অতএব হরিবংশে

সত্যভামার রোষান্বিত ভাব দেখে, স্নেহহেতু যদুনন্দন ভয়েভয়ে ধীরপদক্ষেপে তার গৃহে প্রবেশ করলেন। সত্যভামা ছিল রূপযৌবন সম্পন্না, তাই নিজের সৌভাগ্যে সে সর্বদাই গর্বিতা থাকতো। সে যখন সখীর মুখে শুনলো যে, রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের কাছে পারিজাত পুষ্প পেয়েছে, ঈর্ষায় তার অন্তর জ্বলে উঠলো। প্রবল অভিমান হলো সত্যভামার মনে।

শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ সুখের জন্য সত্যভামা সৌভাগ্যবতী। সেই সৌভাগ্যের সঙ্গে অতুলনীয় রূপের সমন্বয় তাকে গর্বিতা করেছে। সেই গর্বের জন্যই তার অত অভিমান। সত্যভামা মধুস্নেহবতী। তাই স্নেহসঞ্জাত মান তার বেশী।

যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্য বিরাজ করে, বিপক্ষের উৎকর্ষ-কীর্তন তার সহ্য হয় না। সত্যভামা ব্যতীত অন্য নায়িকার অন্তরে

সুসখ্যের অভাব ব'লে, রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্পদানের কথা শুনে তাদের মান উৎপন্ন হয়নি।

বিপক্ষবৈশিষ্ট্য তিন প্রকার। যথা—শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট; অর্থাৎ শ্রবণ, অনুমিতি ও দর্শন থেকে উৎপন্ন।

শ্রবণ

প্রিয়সখী ও শুক প্রভৃতির মুখে শোনা কথা হলো শ্রবণ।

সখীমুখে শ্রবণ

যথা—

বৃন্দা অভিমানিনী মনোরমাকে বললেন—হে শশিমুখি! সখীর মুখে মিথ্যাবার্তা শুনে, তুমি তোমার প্রণয়াস্পদের উপর অনুরাগ বৃথা শিথিল করো না। হে দেবি! প্রসন্না হও, মনের গ্লানি দূর করো। ওদিকে তোমার মুখ না দেখে, প্রিয়তম আজ বনে ব'সে বিশীর্ণ হচ্ছেন। ৩৫।

'মিছামিছি কেন কঠিন সখীর বচনে করেছ মান।
আমি ভাল জানি আন যুবতীর নিকটে না যায় শ্যাম॥'

শুকমুখে শ্রবণ

যথা—

অভিমানিনী শ্যামলার প্রতি চাটুবাক্য প্রয়োগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বললেন:

'কলহ-নিপুণা কোন সহচরী পড়াল এহেন শুকে।
চন্দ্রাবলী সঙ্গে আমার বিহার পড়িছে আপন মুখে॥
রাই তুমি না করিহ মান।
শুকের বচন সকলি বিফল তুমি সে আমার প্রাণ॥'

অনুমিতি

ভোগাঙ্কদর্শন, গোত্রস্খলন অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি ব'লে ডাকতে শুনে, কিংবা স্বপ্ন দেখে, অনুমিতি (Inference) হতে পারে। এই পর্যায়ে ভাগ করলে, অনুমিতি তিন প্রকার হয়।

ভোগাঙ্ক

বিপক্ষ অথবা প্রিয়জনের অঙ্গে যে রতিচিহ্ন দেখা যায়, তাকে ভোগাঙ্ক বলে। ৩৬।

বিপক্ষগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন

যথা—

খণ্ডিত চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, পদ্মা রোষযুক্তা হয়ে বললে—হে ধূর্ত! তোমার আর চাটুবাক্যে প্রয়োজন নাই। যথেষ্ট হয়েছে, এই পর্যন্তই ভালো। চন্দ্রাবলী খিন্ন-নয়না হয়ে ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। তুমি আর ক্ষণকালও এখানে থেকো না। প্রাঙ্গণ থেকে চলে যাও। বৃদ্ধা ক্রুদ্ধা হয়ে আছেন। ললিতার ললাটে (বিপক্ষ রমণীর) তুমি যে মকরীচিত্র অঙ্কিত করেছ, তাতেই সব বুঝেছি। তার সেই চিত্রিত ললাটই তোমার সব চাতুরি উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে।

প্রিয়গাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন

যথা—বিদগ্ধমাধবে

খণ্ডিতা শ্রীরাধা অনুনয়কারী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন ঃ

হে কেশব! অমন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার পথপানে চেয়েছিলে, তাই পুষ্পরেণু পড়ে তোমার চোখদুটি লাল হয়েছে। আর বনের শীতল বাতাস লেগে তোমার বিম্বাধর ব্রণিত হয়েছে, হিমেল বাতাসে ঠোঁটদুটি ফেটে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হে দেব! সঙ্কোচ পরিত্যাগ করো। বিনয়-বচনে আর প্রয়োজন নাই। আমি দৈবকর্তৃক বিড়ম্বিতা, বিধাতা আমার অদৃষ্টে দুঃখ লিখেছেন। তুমি কি করবে! থাক, আর তোমার দিকে চেয়ে দেখবো না।

শ্রীমতী বিপরীত লক্ষণা দ্বারা এই কথাই দয়িতকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর আর বুঝতে কিছু বাকী নাই। অন্যরমণী-সম্ভোগে নিশাযাপনের জন্য নয়নদু'টি রক্তবর্ণ ধারণ করেছে, বিম্বাধর দন্তের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

এক্ষেত্রে নায়িকার মানই স্বাভাবিক। প্রিয়গাত্রে অপর নায়িকার ভোগাঙ্ক দর্শন থেকে এই মানের উৎপত্তি হচ্ছে।

গোত্রস্খলন

ভুল ক'রে একজনকে অন্যজনের নাম ধরে ডাকা, বা কোন নায়িকাকে তার বিপক্ষ-নায়িকার সংজ্ঞায় আহ্বান করা প্রভৃতিকে গোত্রস্খলন বলে। এই গোত্রস্খলন নায়িকার পক্ষে অত্যন্ত ঈর্ষার কারণ হয়, এবং মরণ অপেক্ষাও অধিক দুঃখপ্রদ হয়।

যথা—বিল্বমঙ্গলে

রাধামোহনমন্দির থেকে বেরিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট গেলেন। অন্যমনস্কতাহেতু ভুলবশতঃ হঠাৎ তাকে সম্বোধন ক'রে জিজ্ঞেস করলেন—'রাধে! তোমার কুশল তো?'

তাঁর মুখে এই কথা শুনে, চন্দ্রাবলী বললে—'ওহে কংস! তোমার সংবাদ মঙ্গলময় তো?'

কৃষ্ণ বললেন—'অয়ি বিমুগ্ধহৃদয়ে! এখানে কংসকে তুমি কোথায় দেখলে?'

উত্তরে চন্দ্রাবলী বললে—'তুমিই বা রাধাকে কোথায় দেখলে?'

এই কথা শুনে, লজ্জাবনতমুখে শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন।

সেই হাস্যময় মাধব তোমাদের রক্ষা করুন। প্রেমময় মাধবের এই সলজ্জ হাসি অপূর্ব ও অতুলনীয়। ৩৭।

এখানে গোত্রস্খলনহেতু নায়িকার ঈর্ষা-উক্তির মাধুরী প্রদর্শিত হলো। এবার তার সখীদের উক্তির উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

যথা বা—

চন্দ্রাবলীর সভায় সঙ্গীত-লহরীতে মুগ্ধ হয়ে, রসাস্বাদ প্রসঙ্গে কি বলতে গিয়ে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমক্রমে চন্দ্রাবলীকে 'ষোড়শীতারা' ব'লে সম্বোধন ক'রে ফেললেন। তাই শুনে, চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা রোষভরে ব'লে উঠলো—অহ! হে কিতব, শঠ, তোমার সামনে

বিমলদ্যুতি চন্দ্রাবলী বিরাজ করছেন। তুমি এখানে ষোড়শীতারা অর্থাৎ রাধাকে কোথায় দেখলে? তোমার বর্ণ তিমিরের মতো মলিন। অন্ধকার রজনী তারাকেই চেনে। কিন্তু চাঁদ উঠলে যে অন্ধকার বিলীন হয়ে যায়। যাও—যাও, এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। ব্রজের অরুণমণ্ডলা আমার এই সহচরী ক্রোধদ্যুতি প্রকাশ করবার আগেই এখান থেকে প্রস্থান করো।

এখানে গোত্রস্খলনের জন্য পদ্মার মান উপস্থিত হয়েছে এবং চন্দ্রাবলীরও প্রচণ্ড মান আশংসিত হচ্ছে। ৩৮।

স্বপ্নদর্শন

শ্রীকৃষ্ণ বা বিদূষক যদি স্বপ্ন দর্শন ক'রে, স্বপ্নায়িত অবস্থায় এক নায়িকার উপস্থিতিতে বিপক্ষ-নায়িকা সম্পর্কে কোন উক্তি করেন, তা শুনে মানের উৎপত্তি হয়। তাকে স্বপ্নদর্শনজনিত মান বলে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন

যথা—

বৃন্দা কুন্দবল্লীকে বললেন ঃ

'চন্দ্রাবলীর কাছে হরি আছয়ে শয়ন করি তাথে স্বপ্নে এই কথা কয়।
রাই মোর অন্তরে রাই মোর বাহিরে রাই মোর অগ্রে পৃষ্ঠে রয়॥
চন্দ্রাবলী তাহা শুনি আপন লঘুতা মানি কৃষ্ণপ্রতি বিরচিলা মান।
সখীরে না কহে কথা হৃদয়ে বাড়িল ব্যথা ক্রোধে জলে আগুন সমান॥'

রাধে! তুমি আমার হৃদয়ে-বাহিরে আছো, এই কথা স্বপ্নঘোরে শ্রীকৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত হওয়ায়, শ্রীরাধার প্রতি তাঁর প্রেমের আতিশয্য প্রকাশ পেল। তাতে চন্দ্রাবলীর প্রচণ্ড মান স্বাভাবিক।

বিদূষকের স্বপ্ন

যথা—

শৈব্যা তার সখীকে বললে—সখি! মধুমঙ্গল চন্দ্রাবলীর গৃহে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে সে বললে, 'মাধবি! তুমি কোন

চিন্তা করো না। শ্রীকৃষ্ণ নানাচাটুবাক্যে পদ্মার সখা চন্দ্রাবলীকে প্রবঞ্চনা করেছেন।' তাই বলছি, তুমি ত্বরায় শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের কাছে অভিসারে পাঠাও।

আশ্চর্য দেখ, বিদূষকের মুখে এই কথা শুনে চন্দ্রাবলা অভিমানে জ্বলতে লাগলো।

দর্শন

যথা—

পদ্মা অনুনয় ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে বললে, হে শঠচূড়ামণি! তুমি মিথ্যা কথা বলো না। গিরিকন্দরে আমার সখী চন্দ্রাবলীকে একাকিনী রেখে, ছলনা ক'রে তুমি সম্ভ্রম দেখিয়ে পালিয়ে এসেছ। পরে দূর থেকে ক্ষুদ্র ঘন্টিকার শব্দ শুনে, আতঙ্কিতা হয়ে, চন্দ্রাবলী বাইরে এসে দেখে—যমুনাপুলিনে শ্রীরাধার সঙ্গে তুমি বিহার করছো। সেই থেকে চন্দ্রাবলী অভিমানে জ্বলে মরছে। ৩৯।

যথা বা—

চন্দ্রাবলী দূর থেকে ললিতাকে দেখে, ব্যথিত অন্তরে পদ্মাকে বললে—সহচরি! উৎকণ্ঠিতা হয়ে আজ সকালে গুঞ্জামালা গেঁথে শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু হায়! সকালেই দেখলাম যে, সেই মালা ললিতার বক্ষে দোলে। আগুনের মত উজ্জ্বল বর্ণের সেই গুঞ্জাবলী আমার হৃদয়কে দগ্ধ করছে।

নির্হেতু মান

অকারণ অথবা দুইয়ের কারণাভাসহেতু নায়ক ও নায়িকার যে প্রণয় উদিত হয়, এবং সেই প্রণয়নিবন্ধন যে মানের উদ্ভব হয়, তাকে নির্হেতু মান বলে। ৪০।

পণ্ডিতগণ প্রণয়ের পরিণামকে আদ্যমান বা সহেতু মান বলেন, আর প্রণয়ের বিলাসজনিত বৈভবকে দ্বিতীয় মান অর্থাৎ নির্হেতু মান ব'লে থাকেন। প্রণয় থাকলেই মানের উৎপত্তি হয়, এবং কোন

কারণ না-থাকা সত্ত্বেও যে মান উদিত হয়, তাকে বিদগ্ধজনেরা প্রণয় মান ব'লে কীর্তন করেছেন। ৪১।

তাই কথিত আছে যে, সর্পের গতি যেমন বক্র, প্রণয়ের গতিও তেমনি স্বভাব-কুটিল। কারণ থাক বা না থাক, যুবক-যুবতীর প্রণয়ে মানের উদয় হয়। এই মানে ভাব-সংগোপন, অর্থাৎ মনের কথা খুলে না বলা, বা মুখভার ক'রে থাকা, ইত্যাদি যে-সব ভাব উদিত হয়, সে-গুলিকে ব্যভিচারিভাব ব'লে জানতে হবে। ৪২।

শ্রীকৃষ্ণের নির্হেতু মান

শ্রীকৃষ্ণের সহেতু মান সম্ভব নয়। তবুও তাঁর মান উদিত হলো, নির্দেশিত স্থানে অভিসারে আসতে ব্রজসুন্দরীর বিলম্ব হয়েছে ব'লে। এটা কারণাভাস জনিত মান।

যথা—

কোন ব্রজসুন্দরী বললেন—হে কৃষ্ণ! তুমি কথা না বলো, অন্ততঃ একবার স্মিতদৃষ্টিতে আমার দিকে চাও! আমার কোন অপরাধ নাই। কৌশলে পতিকে বঞ্চনা ক'রে আসতে এই জ্যোৎস্না-ময়ী রাত্রির অর্ধেক অতীত হলো। তারপর আমি জ্যোৎস্নাভি-সারের উপযোগী শুভ্রবেশে সজ্জিতা হয়ে দ্রুতপদে আসছিলাম। অনেক দূর এগিয়ে আসার পর হঠাৎ নিবিড় মেঘে চাঁদ ঢেকে গেল। বনপথ অন্ধকার হলো। সেই জন্যই আমার আসতে আরো দেরী হয়েছে।

যথা বা—

শ্রীরাধা শ্যামলাকে বললেন:

'বনফুল চয়নে বিলম্ব করি পন্থহি শ্যাম নিকটে হাম গেল।
মুঝে হেরি নাগর বাত নাহি বোলল কেবল অধোমুখ ভেল॥
হাম ফুলঅঞ্জলি পদতলে দেয়লু তাহে ভুরু কুটিল বিলাস।
পুরুষকি মান সুচির নাহি হোয়ই বদনে প্রকাশল হাস॥'

পথে ভালো-ভালো বনফুল চয়ন করতে আমার বিলম্ব হলো। গিয়ে দেখি, মুরারি মান ক'রে বসে আছেন। কথা বলছেন না। চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। মুখে তাঁর মৃদুহাসি ফুটে উঠলো। পুরুষের মান কতক্ষণ থাকে !

কৃষ্ণপ্রিয়ার কারণাভাবজনিত মান

যথা—উদ্ধবসন্দেশে (১)

শ্রীকৃষ্ণকে বন থেকে গোষ্ঠে যেতে দেখে, শ্রীরাধার মান উপস্থিত হলো। তাই দেখে, শ্যামলা বললে—সখি ! কেন তুমি অকারণ মান করছো ? গোষ্ঠ-অঙ্গন থেকে শ্রীকৃষ্ণ তোমার দেহলী-বেদিকার দিকে মুহুর্মুহু উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তুমি বৃথা মান ক'রে কেন গবাক্ষপথে চেয়ে থেকে অন্তর বেদনার্ত করছো ! ।৪৩।

এখানে শ্রীরাধার মানের কোনো কারণ নাই, তবুও তাঁর মান হলো—এই ভেবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর জন্য বনে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন না !

কৃষ্ণপ্রিয়ার কারণাভাসজনিত মান, যথা—

(২) শ্রীরাধাকে মানিনী দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন :

কেন তুমি অকারণ কুপিতা হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেছ ? আমি তো কোন অপরাধ করিনি।

'তোমার বচনে কুসুম চয়ন করিতে গেলাম আমি।
কোন দোষ নাই কেন মিছা রাই মানিনী হয়াছ তুমি ॥
অনেক যতনে গহন কাননে আনিলাম মল্লিকা ফুলে।
ভূষণ করিয়া তোমারে পরাব কিবা সাজে শ্রুতিমূলে ॥ ' ৪৪ ॥

যুগপৎ মান

মানের কারণ না থাকলেও, নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই একসঙ্গে মানের উদয় হতে পারে।

যথা—

যুগপৎ মানগ্রস্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দা বললেন :

'কেন হে নাগর মুখ নামাইয়া বসিয়া রয়েছ তুমি।
কেন কেন রাই তোমার বদনে বচন নাহিক শুনি ॥
বুঝিলাম মনে তোমরা দুজনে প্রেমেতে করেছ মান।
পুনঃ রতি রসে এখনি ভুলিবে, দুহুঁ সে দোঁহার প্রাণ ॥'

শ্রীরাধাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—জানি জানি হে বিরসবদনে! এমন কোন অনির্বচনীয় অভ্যাস আছে, যার জন্য ক্রীড়াকলহে উভয়ের এই মান ভঙ্গ হলো না। ৪৫।

এককালীন কারণাভাসজনিত মান সম্ভব নয়। সেই জন্য উপশমের সহিত কারণাভাবজনিত মানের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

যথা বা—

শ্রীকৃষ্ণ নির্জনে বিশাখাকে লীলাকৌতুকচ্ছলে বললেন—সখি! আমরা দুজনে যমুনাতীরের কুঞ্জগৃহে ছিলাম। থাকতে থাকতে হঠাৎ দুজনে দুজনকে আর দেখতে পেলাম না। তার জন্য মিথ্যা যে মান উপস্থিত হলো, তাতে আমরা দুজনেই ক্লান্ত হচ্ছিলাম। তারপর, আমি যখন একটি দাড়িম্ব ফল হাতে নিলাম, শ্রীরাধার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তখন আমি পরিহাস করতে করতে তাঁর প্রফুল্ল অঙ্গ আলিঙ্গন করলাম। ৪৬।

নির্হেতুক মান আপনা-আপনিই উপশমিত হয়, এবং নায়ক নায়িকাকে হৃদয়ে গ্রহণ করলে, মানময়ী নায়িকার মুখে আপনিই হাসি ফুটে ওঠে।

এর শেষসীমা অশ্রুপাত পর্যন্ত। হাসতে গিয়েও নায়িকার চোখে জল আসে।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বললেন, হে রাধে! তোমার রোষ যদি বেশীই হয়ে থাকে, তাহলে গণ্ডদেশ এমন প্রফুল্ল হলো কেমন ক'রে!

এই নর্মবাক্যে শ্রীমতীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তখন নন্দনন্দন তাঁর প্রিয়তমাকে চুম্বন করলেন।

হেতুজনিত মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি এবং উপেক্ষা প্রভৃতি রসান্তরের দ্বারা উপশমিত হয়। এই মান-উপশমের চিহ্ন বাষ্পমোচন অর্থাৎ চোখের জল মোছা ও হাসি ইত্যাদি।

সাম

প্রিয়বাক্যের রচনাকে সাম বলে। অর্থাৎ মিষ্ট কথায় নায়িকাকে তুষ্ট করে সন্ধি স্থাপন করা।

যথা—

মানিনী শ্রীরাধাকে তুষ্ট করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সুন্দরি! যথার্থই আমার গুরুতর অপরাধ হয়েছে, তাই তুমি মান করেছ। তোমার অটল স্নেহই যে আমার একমাত্র আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনেই শ্রীমতী নতমুখে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। সেই অবিরল অশ্রুধারা অনঙ্গ-উৎসবের রঙ্গ-মঙ্গলঘট কুচদ্বয়কে জলপূর্ণ করতে লাগলো।

ভেদ

ভঙ্গিদ্বারা নিজেই নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা, এবং সখীদের দিয়ে নায়িকাকে তিরস্কার করানো, এই দুই পদ্ধতিতে ভেদ দ্বিবিধ হয়। ৪৭।

ভঙ্গিদ্বারা নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ। ৪৮।

যথা—বিদগ্ধমাধবে

কৌশলে নায়িকার মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রেও তার মানের উপশম করা হয়। নায়িকার এই ধরণের মাহাত্ম্য বর্ণনায় নায়কের মাহাত্ম্যও প্রকারান্তরে প্রকাশিত হয়।

মানিনী শ্রীরাধার রূপবর্ণনা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মানিনি! তোমার লোচনদুটি চঞ্চল মীনের মতো সুন্দর, উৎকৃষ্ট কঠোর স্তন

তোমারই উপযুক্ত, তোমার ক্রোড়দেশ অতিশয় দীপ্তিশালী, তোমার এই অধর মহানন্দ-সম্বর্ধক, মধ্যদেশ অতিক্ষীণ—ত্রিবলী বন্ধনযুক্ত, মুখরুচি অতুলনীয় সুন্দর। হে প্রিয়তমে! তুমি এত শোভার আধার হয়েও মনে কেন মানের কলুষ রেখেছ?

পক্ষান্তরে, হে মানিনি! আমি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দিত হয়েও তোমার স্তুতি করছি। তুমি গোপস্ত্রী, এর চেয়ে অধিক সৌভাগ্য আর তোমার কি হতে পারে? অতএব সুন্দরি, তুমি মান পরিত্যাগ করো।

এখানে প্রিয়-উক্তির দ্বারা সামের উদাহরণ হলো। আবার নায়কের স্বীয় বাগ্‌ভঙ্গির দ্বারা ভেদ কীর্তিত হচ্ছে। ৪৯।

যথা বা—

মানিনী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাধে! আমি সর্বতোভাবে স্নিগ্ধ হলেও তুমি যখন আমার উপর রুষ্টা হচ্ছ, তখন দোষ তোমার নয়, এ দোষ আমারই। কেন না, দশমদশাপ্রাপ্তা দেববালাগণকে উপেক্ষা ক'রে যখন তোমার ভজনা করেছি, তখন তার ফল আমায় ভোগ করতেই হবে। হে সুমুখি! তুমি ব্রজযুবতী, কেবল প্রেমপীড়িত যৌবনের সেবাই করছো। তাই তুমি কেবল তোমার প্রেমপীড়াই অনুভব করো।

অর্থাৎ, আমার কথা ভাবছো না।

'সুর-তরুণীগণ মুঝে কত যাচল ব্রজনারী কত চারি পাশে।
সো সব ছোড়ি তোহে হাম সেবনু তুয়া সঙ্গম-রস আশে॥'

সখার দ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ

যথা—

সখীগণ তিরস্কার ক'রে মানিনী ভদ্রাকে বললে, হে সুন্দরি! যিনি শঙ্খচূড় বধ ক'রে সকলের অভয়বিধান করেছেন, তাঁর তুল্য প্রিয়তম নাই। তাঁকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। অলক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ সখীদের দ্বারা এইভাবে ভদ্রার প্রতি উপালম্ভ (তিরস্কার) প্রয়োগ করলে,

ভদ্রার নেত্র হতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়ে নাসাগ্রে গজমুক্তার মতো শোভা পেতে লাগলো।

দান

কোন ছলে নায়িকাকে ভূষণাদি উপহার দেওয়াকে দান বলে।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ পদ্মাকে বললেন—পদ্মে! কামনামে আমার এক প্রিয় বন্ধু আছেন। তুমি যে আমার প্রেয়সী, এই কথা শুনে তিনি এই হার দিয়েছেন তোমার বক্ষে অর্পণ করবার জন্য, যাতে এই হার সঙ্গম-উৎসব প্রাপ্ত হয়।

এই ব'লে দুহাতে হারটি তুলে ধরে শ্রীকৃষ্ণ পদ্মার গলায় পরাতে উদ্যত হলেন। মান-উপশমহেতু পদ্মার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তাই দেখে, শ্রীকৃষ্ণ তার গণ্ডে চুম্বন অঙ্কিত করলেন।

নতি

কেবলমাত্র দৈন্য অবলম্বন ক'রে প্রিয়ার পদপ্রান্তে নত হওয়া বা পায়েপড়াকে নতি বলে।

যথা—

বৃন্দা কুন্দবল্লীকে বললেন—সখি! কন্দর্পগণের কান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, অপরূপরূপময় মাধব, তাঁর ময়ুরপুচ্ছরচিত চূড়া ভুমিতে লুটিয়ে শ্রীরাধার চরণে প্রণাম করলেন। শ্রীরাধার নয়নমেঘ হতে অবিরল বাষ্পরাশি বর্ষিত হতে লাগলো। তাতেই শ্রীমতীর মানরূপ গ্রাষ্মের অবসান হলো।

উদাহরণ: 'দেহি পদপল্লবমুদারং'—জয়দেব।

উপেক্ষা

সামাদির দ্বারা যদি মানের উপশম না হয়, তা হলে নায়িকার প্রতি নায়ক যে অবজ্ঞা বা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেন, তাকে উপেক্ষা বলে। ৫০।

যথা।

বৃন্দা বিশাখার সখীদের বললেন, সুন্দরীগণ! একে এই প্রিয়তম ব্রজরাজতনয়, তাতে আবার তিনি বীরশ্রেষ্ঠ, এবং তার উপর কন্দর্পকোটিবিজয়ী তাঁর রূপ! দেখ, এহেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধা কি রুক্ষভাব ধারণ করেছেন। এখন ইনি নিষ্ঠুরমনে দূরে সরে যাচ্ছেন। এ উপেক্ষায় কল্যাণ হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে আর কি যুক্তি থাকতে পারে?

নায়ক যখন দৃঢ়চিত্তে উপেক্ষা প্রকাশ করেন, তখন নায়িকার মান আর থাকে না। সুমেরুসম মান প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন, সখা! মুহুর্মুহু নতিদ্বারাও যখন মানের উপশম হলো না, দুর্নিবার হয়ে রইলো, তখন আমি অবিলম্বে মৌনব্রত অবলম্বন করলাম। তাতে পদ্মার নয়নদুটি বাষ্প বিকীরণ করতে লাগলো। পদ্মা অবশ্য বললে যে, চোখে তার পুষ্প পরাগ পড়েছে, তাই চোখে জল ঝরছে।

অথবা—

উপাসনা পরিত্যাগ ক'রে অন্যার্থসূচক বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা মৃগাক্ষীদের প্রসন্নতা উৎপাদন করাকেও পণ্ডিতগণ উপেক্ষা ব'লে থাকেন।

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বললেন—হে সুন্দরি! তোমার ধম্মিলে যে নবমালতী ও বামকর্ণে মল্লীপুষ্প দেখছি, তা আমার চেনা। কিন্তু দক্ষিণ কর্ণে যে পুষ্পটি শোভা পাচ্ছে, সেটি তো আমি চিনি না। দেখি, গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারি কিনা! আঘ্রাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নাসাপুট উদ্যত করতেই চন্দ্রাবলীর গণ্ডস্থল পুলকিত হয়ে উঠলো। হাসিমুখে শ্রীকৃষ্ণ চুম্বন করলেন।

রসান্তর

আকস্মিক ভীতিসঞ্চারাদির দ্বারা রসান্তরের সৃষ্টি হয়। এই রসান্তর দু'রকমের হয়, যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্বক।

যাদৃচ্ছিক

অকস্মাৎ যে-ভয় উপস্থিত হয়, তাকে যাদৃচ্ছিক বলে।

যথা—

গুরুতর উপায় অবলম্বন ক'রেও শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রার মানভঙ্গ করতে পারলেন না। কিন্তু দেখ, হঠাৎ মেঘের গর্জন শুনে, ভদ্রা ভীতা হয়ে দু' হাতে শ্রীকৃষ্ণের গলা জড়িয়ে ধরলো।

এখানে আকস্মিক ভয়ে রসান্তর সৃষ্টি হওয়ায় ভদ্রার মানের উপশম হলো।

বুদ্ধিপূর্বক

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা সপ্রতিভ বুদ্ধির দ্বারা কান্ত মানভঞ্জনের যে উপায় অবলম্বন করেন, তাতে রসান্তর সৃষ্টি হয়। এই রসান্তরে মান অপনোদিত হয়। ৫১।

যথা—

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বললেন, দেবি! মানিনী শ্রীরাধার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে থেকে, লোচন সঙ্কুচিত ক'রে, ত্রাস ও ব্যথার অনুভূতি জানিয়ে, ছল ক'রে বললেন—হঠাৎ আমার হাতে কি একটা বিষাক্ত পঞ্চমুখকীট দংশন করলো।

এই কথা শুনে, শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—কি কি হলো, কি হলো!

গান্ধর্বিকা উৎকণ্ঠিতা হয়ে নিকটে আসতেই, শ্রীকৃষ্ণ স্মিতমুখে তাঁকে চুম্বন করলেন। ৫২।

অন্যকোন উপায় ছাড়াও, দেশকালবলে মুরলীশ্রবণের দ্বারা ব্রজসুন্দরীদের মান উপশমিত হয়। ৫৩।

দেশবলে মানোপশমন

যথা—

ভদ্রাকে বৃন্দা বললেন :

'কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমরগণ গুঞ্জরু বৃন্দাবন বনমাঝ।
মৃদুমৃদু হাসি নীপতরু মূলহি বৈঠল নাগররাজ॥
চন্দ্রাবলী তব ছোড়ল মান।
নাগর দরশ পরশরসলালসে সখীমুখে দেওল নয়ান॥'

বৃন্দাবনের চারিদিকে ভ্রমরগুঞ্জন ও বনেবনে পুষ্পবিকাশ এবং সেই সঙ্গে কদম্বমূলে হাস্যবদন প্রিয়তমকে দেখে, চন্দ্রাবলীর নির্হেতু মান স্খলিত হলো। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে সখীর মুখপানে চাইতে লাগলেন, অর্থাৎ সখি! আমি এখন কি করি বলো?

কালবলে মানোপশমন

যথা—

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দা বললেন :

'এ হেন শরৎকালে চন্দ্রছটা ঝলমলে যমুনার তীর শোভা করে।
শুনিয়া সখীর বাণী মান ছাড়ি দিল ধনি অভিসার করিল সত্বরে॥'

শ্রীরাধা মানিনী হয়ে একান্তে বসেছিলেন। কিন্তু দূতীর মুখে যখনই তিনি শুনলেন যে, শরতের মধুরমূর্তি সুধাকর সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশিতে যমুনাতটবর্তী কাননভূমি সুশীতল করেছে, তাঁর মান নিমেষে দূরে গেল। প্রসন্না হয়ে তিনি অভিসারে উদ্যতা হলেন।

মুরলীধ্বনিতে মানোপশমন

যথা—

মানিনী শ্রীরাধাকে কোন এক সখী বললে—দেবি! তুমি মান পরিত্যাগ করলে না। তা না করো, আমার কিছু বলবার নাই।

কিন্তু দেখো, শেষে একটি ফুৎকারে ওই মান ঢ়ু গেলে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুই বিজয়ী হবে।

যথা বা—

মানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে ললিতাকে বললেন :
'মান নাহি জানি আমি, মানের উপাধ্যায় তুমি, তোমার বচনে কৈনু মান।
ঐ দেখ বনমাঝে কানুর মুরলী বাজে, সত্বরে আচ্ছাদ মোর কান॥'

নির্হেতু মান ত্রিবিধ

মানের তারতম্যহেতু নির্হেতু মান ত্রিবিধ হয়। যথা—লঘু, মধ্য ও মহিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ। ৫৪।

যে মান অতি অল্পায়াসে সুসাধ্য হয়, তার নাম লঘুমান। যা যত্নে সাধ্য হয়, তার নাম মধ্যমান। আর মঙ্গলজনক উপায়ের দ্বারাও যা দুঃসাধ্য, তার নাম মহিষ্ঠ বা দুর্জয়মান। ৫৫।

মানহেতু ব্রজসুন্দরীগণ রোষবশে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সব উক্তি ক'রে থাকেন, তার উদাহরণ : বাম, দুর্লীলশেখর অর্থাৎ কপটচূড়ামণি, কিতবেন্দ্র অর্থাৎ খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত, কঠোর, নির্লজ্জ, অতিদুর্ললিত, গোপীভুজঙ্গ, রতহিণ্ডক অর্থাৎ নারীচোর, গোপিকাধর্মবিধ্বংসী, গোপসাধ্বাবিড়ম্বক, কামুকেশ, ঘোরতিমির, শ্যামাত্মা বা কালো বরণ, অম্বরতস্কর বা বস্ত্রহারী, গোবর্ধনতটারণ্যতস্কর বা বৃন্দাবনের বনচোর ইত্যাদি। ৫৬।

ইতি মানপ্রকরণ

প্রেম-বৈচিত্ত্য

প্রেমের উৎকর্ষহেতু প্রিয়তমের কাছে থেকেও মনে যে বিচ্ছেদ-ভয় জাগে, তাকে প্রেম-বৈচিত্ত্য বলে। ৫৭।

যথা—

পৌর্ণমাসীকে বৃন্দা বললেন :

'কান্থক কোড়ে বৈঠি ধনি কহতহি কাঁহা গেও নাগর রাজ।
কি মঝু দোষে ছোড়ল বরনাগর ইহ বলি পড়ু ক্ষিতি মাঝ॥
এ সখি, কান্থ দেহ মুঝে আনি।
ঐছন রাইক বচনে হরি বিস্মিত বদনে লাগাওল পানি॥' ৫৮॥

এটি নির্হেতু প্রেমবৈচিত্ত্য। কারণাভাসজনিত গৌণ প্রেম বৈচিত্ত্যের উদাহরণ—

যথা বা—বিদগ্ধমাধবে

বিহ্বলচিত্তা শ্রীরাধা সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখেও দেখতে পেলেন না। তাই বিলাপের সঙ্গে বললেন—হয় কোন গুরুতর কাজে, না হয় আমার কোন বৈগুণ্য দেখে, পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ এই বনে আমায় একাকিনী ফেলে কোথায় চলে গেলেন! পাশে এমন কোন প্রণয়িনী নাই, যার দ্বারা তাঁকে আহ্বান করি। আমিই বা আর কেন এখানে নিভৃতে বসে থাকবো! । ৫৯।

'অনুরাগের পরমোৎকর্ষ যেই জন পায়।
নিজ কোলে পতি তিলে তিলেকে হারায়॥'

অনুরাগ কোন-কোন স্থলে বিলাসপ্রাপ্ত হয়ে, নায়িকার এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, সে পার্শ্বস্থিত প্রিয়তমকেও পলেপলে হারিয়ে ফেলে, খুঁজে পায় না।—কই! তুমি কোথায় গেলে? কোথায় গেল আমার প্রিয়তম?—কই তুমি!—ইত্যাদি বিলাপের সঙ্গে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে এ-পাশ ও-পাশে খুঁজে বেড়ায়।

নায়িকার এই প্রেম-বৈচিত্ত্যের সুন্দর উদাহরণ বোপদেব কৃত মুক্তাফল গ্রন্থে পট্টমহিষীদের গীতবিভ্রম প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

ইতি প্রেমবৈচিত্ত্য প্রকরণ॥

প্রবাস

যে সব যুবক-যুবতী বা নায়ক ও নায়িকা পূর্বে মিলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যদি দেশান্তরজনিত ব্যবধান ঘটে, পণ্ডিতগণ তাকে প্রবাস বলেন। বিপ্রলম্ভকেও প্রবাসরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন না, বিপ্রলম্ভেও বেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান ঘটে। প্রবাসে হর্ষ গর্ব মত্ততা ও লজ্জা বর্জন ক'রে, শৃঙ্গারযোগ্য ব্যভিচারী ভাবগুলির উদ্ভব হয়।

প্রবাসভেদ

এই প্রবাস দুরকমের হয়—বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক।

বুদ্ধিপূর্বপ্রবাস

কার্যানুরোধে স্থানান্তরে যাওয়াকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে। ভক্তগণের প্রীতিসম্পাদন বা প্রীণনাদি শ্রীকৃষ্ণের কার্যরূপে কথিত হয়েছে।

বুদ্ধিপূর্বপ্রবাস দ্বিবিধ

কিঞ্চিদ্দূর গমন এবং সুদূর গমন ভেদে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস দু'রকমের।

কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস—আদ্য

কোন দূতী গোষ্ঠে গিয়ে গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণকে বললে, আজ শ্রীরাধা সুরভীগণের পথ চেয়ে অধীর অপেক্ষায় শুধু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ করছেন। মুরলীধ্বনির দিকে কাণ পেতে, তোমার প্রতি চিত্ত অভিনিবেশ করেছেন। তোমার আগমন প্রতীক্ষায় শ্রীমতী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন।

যথা—

'সুরভিকুলপথিবিনিহিতনয়না তব নিজনামবশীকৃতরসনা।
মাধব তব বিরহে বিধুবদনা রাধা খিদ্যতি মনসিজ বেদনা॥
মুরলীনিনাদ শ্রুতিপটুবিষয়া তব মুখকমলে বিনিহিতহৃদয়া।
শ্রীল শচীনন্দন কবি গদিতং হরিমিহ জনয়তু বহুতর মুদিতং॥'

সুদূর প্রবাস—দ্বিতীয়

যথা—

ভাবী, ভবন ও ভূত ভেদে সুদূর প্রবাস তিন প্রকার হয়। এই তিনটিই বুদ্ধিপূর্বপ্রবাস।

বুদ্ধিপূর্বক সুদূরপ্রবাস—ভাবী

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

কোন ব্রজদেবী ভয়, খেদ ও মনোবেদনা প্রকাশ ক'রে সখীকে বললে—বালা! ব্রজরাজের আদেশে দ্বারপাল গোকুলে ঘোষণা করছে যে, কাল প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাবেন। আমার ডান চোখ নাচছে। সে তো অমঙ্গল সুচক। তাই আমার মন চঞ্চল হয়েছে। হায়! ভাগ্যে কি ঘটবে, কে জানে। ।৬১।

বুদ্ধিপুর্বক সুদূরপ্রবাস - ভবন

যথা—ললিতমাধবে

শ্যামলার উক্তি :

উদয়গিরির সানুদেশে সূর্যের লাল আভা প্রতিফলিত হয়েছে। রথে আরোহণ ক'রে গান্ধীতনয় অক্রূর যাত্রাকালীন নান্দীপাঠ করছেন। সেই নান্দীপাঠ শেষ হওয়ার আগে, হে হৃদয়। তুমি বিদীর্ণ হও। নইলে, ভূখননকারী দ্রুতগামী অশ্বখুরের শব্দে তুমি আর্তনাদ করবে।

বুদ্ধিপুর্বক সুদূরপ্রবাস—ভূত

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন—হে সহচরি! স্বেচ্ছায় মুরারি দূরে আছেন, সে লোকাতীত বিপদের দুর্দিন অর্থাৎ সাধ্যের অতীত দুঃখ আমায় তত পীড়া দিচ্ছে না। কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য যে আশা হৃদয়ে ধারণ করেছিলাম, তা এখন তীব্র বাড়বানল হয়ে আমার হৃদয়কে দগ্ধ করছে—আমায় অসহ পীড়া দিচ্ছে।

এই বুদ্ধিপূর্বক ভূত সুদূর প্রবাসে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রেয়সীরা প্রেমের বশবর্তী হয়ে পরস্পর সংবাদ প্রেরণ করেন।

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

মথুরা থেকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যাকে সংবাদ পাঠালেন :

'বিরহের দাহন চক্ষু করি নিমীলন কথোদিন সহিয়া রহিবে।
বন্ধুগণের সুখ করি যাব আমি ব্রজপুরী তবে মোর সঙ্গম পাইবে ॥' ৬২ ॥

তথা—পদ্যাবলীতে

ব্রজদেবীদের প্রেরিত সংবাদ পেয়ে, শ্রীকৃষ্ণের যে অনুভাব হয়েছিল, দ্বারকা থেকে পৌর্ণমাসী তার বর্ণনা করলেন।

যথা—

ব্রজদেবীগণ শুকপক্ষীর মুখে দ্বারকায় সংবাদ পাঠিয়ে বললেন, হে কৃষ্ণ! যমুনাপুলিন, সান্ধ্য বায়ুহিল্লোল এবং রম্য চন্দ্রকিরণ চিত্তে সন্তাপ সৃষ্টি করছে, চিত্ত হরণ করছে না। শুকমুখে ব্রজদেবীদের এই কথা শুনে, দ্বারকার অন্তঃপুরে থেকেও শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। তাতে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদের গর্ব চূর্ণ হলো।

অবুদ্ধিপূর্বপ্রবাস

পরতন্ত্র বা পরাধীনতার জন্য যে প্রবাস, তার নাম অবুদ্ধিপূর্ব প্রবাস। এই পারতন্ত্র্য দিব্য ও অদিব্য ইত্যাদি অনেক রকম হয়। ৬৩।

যথা—ললিতমাধবে

শঙ্খচূড় শ্রীরাধাকে হরণ করে নিয়ে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ করেছিলেন—হে সুন্দরি! আমি শত শত মনোবাসনায় ব্যগ্র হয়ে এই শারদ-পূর্ণিমা নিশীথে বৃন্দাবনের পুষ্পসুরভিত বনবীথিকায় এসেছিলাম। কিন্তু হায়! আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কপট শঙ্খচূড় এসে তোমায় হরণ করে নিয়ে গেল।

এই প্রবাস নামক বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগর বা নিদ্রাহীনতা, উদ্বেগ, তানব বা তনুক্ষীণতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং মৃতি—এই দশ দশা ঘটে।

চিন্তা

অক্রুরের সঙ্গে রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে গেলেন, শ্রীরাধা চিন্তা-সাগরে নিমজ্জিতা হলেন। বিরহে তাঁর অন্তর নিরন্তর ঘূর্ণিত হতে লাগলো।

'যখন গোকুল ছাড়ি হরি গেলা মধুপুরী অক্রূর লইয়া গেল তারে॥
সেইদিন হৈতে রাধা মনেতে বিরহ বাধা ডুবি রৈল চিন্তার সাগরে॥'

যথা বা—হংসদূতে

অক্রুর সাথে আরোহিয়া রথে গেল যবে প্রাণনাথ,
কুসুম সমান গোপিনী পরাণে হইল বজ্রাঘাত।
সেই বিরহ সাগরতলে ডুবলো সারা পরাণমন।
ঘূর্ণীঘন ব্যাথর চাপে অশ্রু ঝরে অনুক্ষণ॥

জাগর

যথা—পদ্যাবলীতে

বিরহিণী শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন—সখি! যে সব নারী স্বপ্নে তাদের প্রিয়তমকে দেখে, তারা ধন্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর থেকে আমার চোখে যে ঘুম নাই। নিদ্রাও বৈরী হয়ে আমায় ত্যাগ করে গেল। সে আর আমার চোখে এলো না, আমি স্বপ্নই বা দেখবো কেমন করে!।৬৪।

উদ্বেগ

যথা—হংসদূতে

কৃষ্ণবিরহিণী রাই ললিতাকে বললেন—হে সখি! আমার মন যে জ্বলে-পুড়ে গেল। হায়! আমি কি করবো! আমি এই দুঃখ

সাগরের পারাপার দেখছি না। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বলো, কি উপায়ে আমি ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য ধারণ করতে পারি।

তানব

যথা—

উদ্ধব বৃন্দাবন থেকে মথুরায় এলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রাধা ও বিশাখার কথা জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন—হে যদুপতি! তোমার বিরহে শ্রীরাধার মুখপদ্ম ম্লান হয়েছে। তাঁর অন্তর নিরানন্দ ও বিষাদম্লান; অনাহারে দিন যাপন ক'রে, কুচদ্বয় শিথিল হয়েছে; বিরহ-উত্তাপে নিদাঘের ক্ষুদ্র নদীর মতো তনু ক্ষীণ ও শুষ্ক হয়েছে।

মলিনতা

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট উদ্ধবের বিবৃতি :

'শিশিরের পদ্মজিনি রাধার বদনখানি চক্ষু যেন শারদ উৎপল।
বন্ধুক মলিনতর তার তুল্য দু'অধর তনু নাহি করে ঝলমল॥'

তোমার অসহ বিরহবিপত্তিতে বিশাখার তনুও মলিন হয়েছে। সূর্যোত্তাপে বিশুষ্ক শরৎকালীন কুমুদপুষ্পের মতো নয়নদুটি নিষ্প্রভ হয়েছে। বিশাখার দশা আর কি বর্ণনা করবো!

প্রলাপ

যথা—ললিতমাধবে

শ্রীকৃষ্ণবিহনে সারা বৃন্দাবন যেন শূন্যতায় পর্যাসিত হয়েছে। সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কোথাও আর কিছু নাই। বিরহিণী রাধা তাই বিলাপ করছেন—সখি! কোথায় সেই নন্দকুলচন্দ্র! কোথায় গেল সেই শিখিপুচ্ছধারী? সেই মোহনমন্দ্রমুরলীধ্বনিকারী শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? কোথায় সেই ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি শ্যাম? সেই নৃত্যরস-উত্তাল রাসবিহারী আজ কোথায়? আমার জীবন রক্ষার

পরমৌষধিনিধি, তোমাদের সেই পরমসুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলেন ? হায়! হা বিধি, তোমায় ধিক্।

ব্যাধি

যথা—ললিতমাধবে

শ্রীমতীর অন্তর যেন ব্যাধিত হয়ে উঠলো। তিনি আর পারছেন না সেই বিরহ সইতে। বিরহিণী শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সখি! গোকুলপতির বিচ্ছেদ-জ্বর যে পুটপাক স্বর্ণের চেয়েও বেশী উত্তাপদায়ক, গরলের চেয়েও বেশী জ্বালাময়, বজ্রের চেয়েও বেশী দুঃসহ, হৃদয়ে বিদ্ধ শেলের চেয়েও কষ্টদায়ক, কঠিন বিসূচিকা রোগের চেয়েও তীব্র। এই নিদারুণ বিশ্লেষজ্বর আমার মর্মভেদ করছে।

উন্মাদ

বৃন্দাবন থেকে শ্রীরাধার সংবাদ বহন করে এনে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে মুরারি! তোমার বিরহে শ্রীরাধা কখনো অকারণ হাসতে হাসতে গৃহের ভিতর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনো বা চেতন ও অচেতন বস্তুকে সমজ্ঞান ক'রে, তোমার সংবাদ জিজ্ঞেস করছেন। হে সখা, বেশী আর কি বলবো! তোমার বিষম বিরহে খেদোক্তি করতে করতে উদ্ভ্রান্তচিত্তা হয়ে শ্রীমতী ভূলুণ্ঠিতা হচ্ছেন।

যথা বা—

কোন সখী শ্রীরাধার উন্মাদভাব দেখে, অন্য এক সখীকে বললে—মাধবের বিচ্ছেদে আজ শ্রীমতী অকারণ অট্টহাস্য করছেন। কখনো উৎকণ্ঠিতা হয়ে অকস্মাৎ চমকে উঠে চীৎকার করছেন। কখনো বা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছেন। কেউ তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারছে না। মাধবের বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয়াবেগ তীব্র হয়ে উঠেছে।

মোহ বা মূর্চ্ছা

যথা—

বিরহিণী রাধার অবস্থা দেখে, ললিতা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পত্র লিখলেন ঃ

'স্তব্ধ করে দৈন্যার্ণব দূর করে চিন্তা সব উন্মাদেরে করয়ে স্থগিত।
মূর্চ্ছা হয়া সহচরী রোধয়ে নয়নবারি ক্ষণে ক্ষণে হারায় সম্বিত ॥'

বিরহে শ্রীমতী দৈন্যের সাগরে ডুবেছেন ; নিরাভরণা, মলিনবেশা ভিখারিণীর মতো হয়েছেন। মুখে কথা নাই। চিন্তাশক্তিও লুপ্ত হয়েছে। উন্মাদ অবস্থাও বিলুপ্ত হয়েছে। চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। হে কংসারি, সেই পদ্মের মতো সুন্দরী শ্রীরাধার আজ নিদারুণ কৃষ্ণবিরহে একমাত্র সহচরী হয়েছে মূর্চ্ছা।

মৃতি বা মৃত্যু

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় অবস্থান করছিলেন, তখন বিরহিণী শ্রীরাধার অবস্থা দেখে, সখীরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যমুনাপুলিনে একটি শুভ্রহংসকে দেখে, তারা তাকে দূতরূপে মথুরায় পাঠাবার সংকল্প করলো। ললিতা সেই হংসকে সম্বোধন ক'রে বললেন—হে মরাল! তুমি দূত হয়ে আকাশপথে দ্রুত মথুরায় যাও। শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে শ্রীমতীর দশা বর্ণনা করে ব'লো, তাঁর আজ দশম দশা উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণবিরহে তিনি মরতে বসেছেন।

ব'লো, হে রাসক্রীড়ারসিক!

'ছাড়ি পতি নিজজন লইল তোমার শরণ সার কৈল তোমার চরণ।
তুমি প্রেম ভঙ্গ ক'রে ছাড়িয়া আইলে তারে বড়ই চঞ্চল তুয়া মন ॥
রাধায় ধিক্ রহু তাথে অদ্যাবধি নাসিকাতে তুলা ধরি করি পরীক্ষণ।
ঘড় ঘড় করে গলা ঈষৎ চলয়ে তুলা সেই দশা না যায় বর্ণন ॥'

হায়! পূর্বে তুমি এই শ্রীরাধার প্রতি কতই নবনব প্রণয়লহরী সঞ্চারিত করেছিলে। কিন্তু আজ তুমি আর তার কোন অপেক্ষা রাখো না। তার সম্পর্কে নির্বিকার হয়েছ। ধিক্ তার জীবনে, যে আজো তার নিঃশ্বাসবায়ু বইছে।

প্রবাসজাত বিপ্রলম্ভে শ্রীমতীর যেমন দশম দশা উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণেরও তেমনি সময়-সময় ওই সব দশা অনুভূত হয়। উপলক্ষণাদ্বারা তার একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। ৬৫।

যথা—

ললিতার পত্র পেয়ে উদ্ধব মথুরা থেকে প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, শ্রীকৃষ্ণও রাধা-বিরহে সময়ে সময়ে অত্যন্ত কাতর হচ্ছেন। রত্নশোভিত ক্রীড়াগৃহে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পালঙ্কে শুয়েও তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। তাঁর স্মৃতিপটে জেগে উঠছে গিরিগুহার শিলাতটে শ্রীরাধার সঙ্গে রতিবিলাসের কথা।

'শয্যা পয়ঃফেন জিনি তাথে বসি যদুমণি রাজন্যার সঙ্গেতে বিহরে।
বনে রাধার ক্রীড়াগণ যেই হয় স্মরণ তেই মূর্চ্ছা হয়ে ভূমে পড়ে॥'

প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ প্রভৃতি প্রেমভেদে এবং মধুস্নেহ, ঘৃতস্নেহ ও মাঞ্জিষ্ঠ প্রভৃতি ভাবগুলির মতো দশাও নানা প্রকার হয়। কিন্তু বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হলো না।

প্রেমভেদে অনুভাবের লক্ষণানুযায়ী উক্ত দশাগুলি সাধারণতঃ ঘটে। অসাধারণ যে দশাগুলির উদ্ভব হতে পারে, বাহুল্যবোধে সেগুলি উল্লিখিত হলো না। ৬৬।

রতির তারতম্য বিশেষে যে সব মোহনভাব হয়, অর্থাৎ মোদনের বিরহ অবস্থাগত অধিরূঢ় ভাবের অসাধারণ দশাগুলি উদ্ভূত হয়, শ্রীরাধা সম্পর্কে সেই দশাগুলির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ৬৭।

এ ছাড়াও, বিপ্রলম্ভ অবস্থায় যে দিব্যোন্মাদ দশা হয়, তাতে অনেক সময় মানসিক বিবর্ত (Psychic Transformation) প্রভৃতি দশার উদ্ভব হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে এই গুলির বিশেষ উদাহরণ দেওয়া হয় নি। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ তার উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন :

'অনুখণ মাধব মাধব সোঙারিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজভাব স্বভাব হি বিছুরল আপন গুণ লুবধায় ॥'

বিপ্রলম্ভ অবস্থায় অনুক্ষণ মাধবের কথা ভাবতে ভাবতে সুন্দরী যেন নিজেই মাধবত্ব প্রাপ্ত হলেন। কখনো দু'টি হাত তুলে আনমনে বেণুবাদনের ভঙ্গি করেন। কখনো বা ময়ূরপুচ্ছ কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় মোহনচূড়া বাঁধেন।

এতদ্ভিন্ন বিপ্রলম্ভ প্রসঙ্গে কোনকোন পণ্ডিত করুণরসের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রবাস-প্রসঙ্গে সে বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ব'লে, বিপ্রলম্ভ প্রসঙ্গে আর সেগুলি পৃথক্ ভাবে আলোচিত হলো না। ৬৮।

ইতি বিপ্রলম্ভভেদ ॥

সংযোগ-বিয়োগ স্থিতি

The States of Union and Separation

প্রেমে যদিও মিলনই মুখ্য, তবুও মিলনের পূর্বে ও পরে যে অবস্থাগুলি থাকে, তাকে অস্বীকার করা চলে না। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ইত্যাদি বিপ্রলম্ভ অবস্থাগুলি প্রেমের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক। প্রেমের সংযোগ-বিষয়ে অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মিলনবিষয়ে পূর্বরাগের সঞ্চার হয় আগে, তারপর আসে সংযোগস্পৃহা। যদিও এই পূর্বরাগ ও সংযোগস্পৃহাকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে দেখা সম্ভব নয়। কেন না, নায়ক বা নায়িকার যখন একজনের অপরকে বা উভয়ের উভয়কে ভালো লাগে, তখন সেই ভালো-লাগার সঙ্গেসঙ্গেই অলক্ষ্যে সংযোগলিপ্সা অন্তরে জাগে। বস্তুতঃ মিলনের পূর্বে বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছিতার এই সংযোগলিপ্সার নামই পূর্বরাগ। কিন্তু এই মানসিক স্থিতিকে ততক্ষণই পূর্বরাগ বলা যাবে, যতক্ষণ উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত না হয়। মিলনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার এই অবস্থাকে বিয়োগস্থিতি অর্থাৎ অযুক্ত অবস্থান বলা চলে।

অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোকের অনুভূতি বা অনুমিতি হতে পারে না, বিয়োগস্থিতি না থাকলেও তেমনি সংযোগস্থিতিকে উপলব্ধি করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষকে প্রকটিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীদের বিরহ-অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃন্দাবনে সর্বদাই রাসলীলা ইত্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে বিহার করেছেন। তাঁর সেই বৃন্দাবন-লীলায় কখনো বিরহের অবসর ছিল না। কেবলমাত্র প্রকটলীলায় একদা তিনি অক্রূরের অনুরোধে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গিয়েছিলেন। কিন্তু নিত্যলীলায় বস্তুতঃ তিনি সর্বদাই বৃন্দাবনে বিরাজমান।১।

যথা—পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে

'গোগোপগোপিকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি।'

অর্থাৎ গো, গোপ ও গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে সেখানে কংসারি আজও ক্রীড়া 'করছেন'। কদাচ সে ক্রীড়ার অবসান ঘটেনি। বৃন্দাবনে নিত্য বিদ্যমান সে লীলা। ২।

'কংসহা নিত্যক্রীড়া করে বৃন্দাবনে।
অতএব জানিল নাহি ছাড়ে বৃন্দাবনে ॥'

যেখানে নিত্যক্রীড়া বিদ্যমান, সেখানে বিয়োগ বা বিচ্ছেদের প্রশ্ন থাকতে পারে না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় বিচ্ছেদ ও বিরহ ইত্যাদি অনিত্য। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই গোপীপ্রেম। এই প্রেমের কোনো বিরতি নাই, বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই, অবসান নাই।

কিন্তু কালিন্দীর কূলে, পুষ্পিত কদম্ববনে, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনা-দের যে প্রেমলীলা, সে শুধু বৈকুণ্ঠের সম্পদ নয়। এই পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রেম, মান, বিরহ, অভিসার, মিলন, যা রূপায়িত হয়েছে বৃন্দাবনের প্রেমলীলায়, তারই অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত হয়েছে জীবলোকে—বিশ্বব্যাপী আনন্দস্রোতে। এই প্রেম ও স্নেহের ভাব-বন্ধন পৃথিবীর পথে মৃত্যুক্লিষ্ট জীবনকে অমৃতময় করে তুলেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনারা নিখিল বিশ্বের সেই অগণিত নরনারীর প্রতীক্। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনাদের অপার্থিব প্রেমের যে মাধুর্যরস, সেই মাধুর্যরসই বিমুগ্ধ করে রেখেছে বিশ্ব-আত্মাকে। দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য, এই চারটি পর্যায়ে প্রেমপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সত্য। কিন্তু ওই মাধুর্যরসকেই শ্রেষ্ঠ রস বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেন না, মাধুর্যরসের আনন্দ পৃথিবীর সকল আনন্দের সীমাকে অতিক্রম ক'রে জীবকে ব্রহ্মাস্বাদের স্বরূপ আস্বাদন করায়। তথ্যগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন-লীলা বিচ্ছেদ ও

বিয়োগহীন হলেও, যুবক-যুবতীর ভাববন্ধনে পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস প্রভৃতি বিপ্রলম্ভে বিয়োগ স্থিতি আছে। বিয়োগ এবং বিরহ আছে বলেই মিলন এত মধুর। বিয়োগস্থিতিই সংযোগ স্থিতিকে মধুরতর করে তুলেছে। আবার সংযোগকালের প্রকট মাধুর্যই মাথুরবিরহতাপের মহাউৎকণ্ঠাজনিত মহাভাব ও মাদন ভাবের মাধুর্য প্রকাশে সহায়তা করেছে।

ইতি বিয়োগ-সংযোগ-স্থিতিবিবৃতি

সম্ভোগ । ৩।

নায়ক ও নায়িকার পারস্পরিক দর্শন এবং আলিঙ্গনাদির অনুকূল পরিবেশ সংঘটিত হ'লে, চিত্তে যে উল্লাসের উদ্ভব হয়, তারই আরোহভাবকে (ascending ecstacy) অর্থাৎ উল্লাসের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষকে সম্ভোগ বলে।

মনীষিগণ এই সম্ভোগকে মুখ্য এবং গৌণভেদে দুটিভাগে বিভক্ত করেছেন। ৪।

যুবক-যুবতীর অনুরাগ সঞ্চারিত হওয়ার পর, যখন দু'জনে দু'জনকে দেখবার এবং আলিঙ্গন প্রভৃতিদ্বারা রতিরসাস্বাদনের সুযোগ পায়, তখন তাদের চিত্তে এক অনির্বচনীয় উল্লাস বা আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এই উল্লাসভাব যদি কোন বাধা না পায়, এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিমান্ হয়ে চরমোৎকর্ষে উপনীত হয়, তাহলে নায়ক-নায়িকার রতিরসাস্বাদনের সম্ভোগ হয়।

মুখ্য সম্ভোগ

জাগ্রত অবস্থায় দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আরোহমান উল্লাস-ভাবকে মুখ্য সম্ভোগ বলে। এই সম্ভোগ চতুর্বিধ। পূর্বরাগ থেকে মান ও প্রবাস পর্যন্ত ক্রমপর্যায়ভেদে এই মুখ্য সম্ভোগ চার রকমের। যথা সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। ৫।

সংক্ষিপ্ত

সাধারণতঃ পূর্বরাগের পর প্রথম যে মিলনের সুযোগ ঘটে, তাতে নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ হয়। লজ্জা ও ভয়ের জন্য যুবক-যুবতী এই সম্ভোগে অল্পমাত্র উপচার বা ভোগাঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। লজ্জা ও ভয় ছাড়াও, এই প্রাথমিক মিলনে নায়ক এবং নায়িকার যথেষ্ট অসহিষ্ণুতা থাকে। সেই জন্য সম্ভোগ সংক্ষিপ্ত হয়। ৬।

নায়কের সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। ৭।

যথা—সপ্তসতী গ্রন্থে

নান্দীমুখী শ্রীরাধার সখীদের বললে—সখীবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণের যে হস্ত গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিল, প্রথম সমাগমে সেই বলশালী হস্তও শ্রীরাধার স্তনস্পর্শে কম্পিত হলো। অনভ্যস্ততাজনিত ভয়, সঙ্কোচ ও লজ্জায় গিরিগোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের অমিত বলশালী হস্তও শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ করতে গিয়ে কেঁপে উঠলো। সুতরাং রতি সম্ভোগের উপচার ও উপকরণগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যবহার হলো।

শ্রীকৃষ্ণ যে হস্তে অবলীলাক্রমে গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন, সেই হস্তে তোমাদের রক্ষা করুন। জন্মাবধি তিনি কখনো স্ত্রীসম্ভোগ করেন নি, তাই তিনি জানতেন না যে, এই সম্ভোগ কেমন। উপরন্তু শ্রীমতী পরোঢ়া; পরকীয়াত্বপ্রত্যয়ে তাঁর সঙ্কোচ ও ভীতি সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক। ৮।

নায়িকাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

যথা—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নবসঙ্গমে প্রবৃত্ত হলে, শ্রীকৃষ্ণ যখন চুম্বনোদ্যত হলেন, শ্রীমতী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকলেন। আলিঙ্গনে উদ্যত হলে, অঙ্গলতা কুটিল হলো অর্থাৎ সঙ্কোচভরে বক্রতা ধারণ করলো। শ্রীমতী লজ্জায় নুয়ে পড়লেন; রতিলীলাপ্রসঙ্গিত কথায় অব্যক্ত অনুরাগে নির্বাক্ রইলেন। তবুও কোন বাধা না দিয়ে, মধুসূদনের আনন্দবিধান করলেন। ৯।

'রসের পদবী নাগর কহয়ে রাই না উত্তর করে।
নূতন সঙ্গমে রসের সাগরে ভাসাল নাগর বরে॥'

সংকীর্ণ সম্ভোগ

সম্ভোগকালে যদি মনে পড়ে যে, নায়ক বিপক্ষের গুণকীর্তন করেছিলেন এবং তাকে, অর্থাৎ সম্ভোগরতা নায়িকাকে, বঞ্চনা

করেছিলেন, তাহলে আলিঙ্গন ও চুম্বনাদির উপকরণ সংকীর্ণ হয়ে আসে ; নায়িকা উদারভাবে দয়িতকে রতিপূজার উপচারগুলি তুলে দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সম্ভোগ সংকীর্ণ হয়। তপ্ত ইক্ষু চর্বন করলে যেমন মিষ্টরস ও উত্তাপ দু-ই একসঙ্গে অনুভূত হয়, তেমনি সংকীর্ণসম্ভোগে নায়িকার চিত্তের উত্তাপ এবং রতিরসের মধুরতা একসঙ্গে আস্বাদিত হয়। ১০।

যথা—

পৌর্ণমাসী একদিন শ্রীরাধাকে অভিসারে পাঠিয়ে, লতামণ্ডপের অন্তরাল থেকে শ্রীমতীর চিত্ত-উত্তাপযুক্ত মধুর কেলিমাধুর্য দেখে বলেছিলেন—

কংসরিপুর সঙ্গে সম্ভোগরতা শ্রীরাধার এই অসূয়াযুক্ত অমৃতময় জল্পনা, মাৎসর্য, মানের উপশম, রম্য কটাক্ষ এবং প্রস্ফুরিত পরম সুন্দর মুখইন্দুশোভিত অনঙ্গক্রীড়াসকল জয়যুক্ত হোক। ১১।

যথা বা—

'মুখবিধু চুম্বনে যাই কহই পুনঃ জাহ চন্দ্রাবলী গেহ।
নিবিড় আলিঙ্গনে মান ভরমে তহি ধীরে ধীরে কুঞ্চই দেহ॥'

গার্গী নান্দীমুখাকে বললে—সখি! মানের উপশম হলেও শ্রীরাধার মুখকমল একটু বক্র হয়েই রইল, বিশেষ প্রসন্ন হলো না। নয়নের দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে, ধীরেধীরে ঈর্ষাই প্রকাশ করতে লাগলো। বাক্যও অসূয়ায় মলিন হলো। যদিও শ্রীরাধার মধুর আকৃতি মানের পরিচয় দিল, তবুও শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সুখী করলেন। ১২।

সম্পন্ন সম্ভোগ

প্রবাস থেকে ফিরে এসে কান্ত দয়িতার সঙ্গে মিলিত হ'লে সম্পন্নসম্ভোগ হয়। নায়ক নায়িকার এই সঙ্গম আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দু'প্রকার।

আগতি

লৌকিক ব্যবহারের দ্বারা নায়ক এসে মিলিত হলে, তাকে বলে আগতি ; অর্থাৎ যেখানে স্বাভাবিক নিয়মে নায়ক ফিরে আসেন, কোন চেষ্টা বা আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ থাকে না।

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

শ্রীকৃষ্ণ বন থেকে গোষ্ঠে ফিরে আসছেন, এই কথা শ্রীরাধাকে জানিয়ে, বিশাখা বললে—হে রাধে! বল্লবীগণের চিত্তহারী গুঞ্জামালা শোভিত মুকুন্দ তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য হাসিমুখে এসেছেন। তাঁর বিরহে তুমি সারাদিন ক্লান্ত হয়ে আছো। হে মৃদুলে, গুরুজনের ভয়ে আর মন্দাক্ষী হয়ে থেকো না। গৃহ ছেড়ে কুঞ্জ দেউলে এসো। এখনই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

'ছাড়ি গুরুজন লাজ এসো গো অঙ্গনমাঝ বিরহেতে হয়াছ দুঃখিনী।
বন হৈতে শ্যামরায় আসিয়া মিলিল তায় বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে এখনি॥'

প্রাদুর্ভাব

প্রেমবিহ্বলা বিরহিণী নায়িকার সম্মুখে নায়কের অকস্মাৎ আবির্ভাবের নাম প্রাদুর্ভাব।

যথা—শ্রীমদ্ভাগবত দশমে

রাস বিপ্রলম্ভের পর হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবে গোপিনীদের যে অবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা করে শুকদেব বললেন—হে রাজন্! গোপীগণের রোদন শুনে, শ্রীকৃষ্ণ পীতবাস পরিধান ক'রে মাল্য ও অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে, অকস্মাৎ হাসিমুখে তাদের সামনে এসে এমন ভাবে উপস্থিত হলেন যে, দেখে মনে হলো, যেন সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথ। তাঁর সেই রূপ দেখে, কামদেবের চিত্তও মোহিত হয়।

এখানে গোপাঙ্গনাদের সম্পন্ন-সম্ভোগ সাধিত হয়।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, দেশান্তর থেকে এসে যদি হঠাৎ

নায়ক তাঁর প্রিয়তমার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহলে তাকেও প্রাদুর্ভাব বলে।

যথা বা—হংসদূতে

প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন—সখি! স্বপ্ন-সম্ভোগের কথা দূরে থাক। বাস্তব সম্ভোগের কথা যা বলছি, তাই শোনো। মনের বিভ্রম-বুদ্ধিতে অবিশ্বাস ক'রো না। তোমার বয়স্য সেই গোবর্ধন হঠাৎ অসময়ে বনে এসে, কৌতুকভরে যে কামকলহের পাণ্ডিত্য দেখালেন, তা অতুলনীয়। প্রাদুর্ভাব-সম্ভোগের সঙ্গে স্বপ্ন-সম্ভোগের তুলনা হয় না। ১৩।

পরিণত প্রেমে বা রূঢ়ভাবে বিপ্রলম্ভের পর যে সম্ভোগ হয়, তাতে পরিপূর্ণ আনন্দ ও পরমসুখ সঞ্চারিত হয়। এ অবস্থায় বিরহ ঘটলে, সে বিরহের পীড়া দ্বিগুণ হয়। কিন্তু যদি অনুরাগের জন্য নায়কের স্ফূর্তি ও প্রাদুর্ভাব হয়, তাহলে সুখোৎসবে নায়িকার সর্ব-অভীষ্ট পূর্ণ হয়। ১৪।

বিপ্রলম্ভের পর এই প্রাদুর্ভাবে যদি সম্ভোগ সম্পন্ন না হতেই আবার বিরহ ঘটে, তা হলে নায়িকার চিত্তে অসহ জ্বালার সৃষ্টি হয়। অমৃতরাশির আস্বাদন করতে গিয়ে জীবনপাত্র গরলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পদ উদাহরণ:

'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। ১৫।

পরাধীনতার জন্য যদি নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাদের দেখা সাক্ষাৎ দুর্লভ হয়ে ওঠে, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্ভোগ বা পারস্পরিক উপভোগের সুযোগ উপস্থিত হলে, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। ১৬।

যথা—ললিতমাধবে

শ্রীরাধা নববৃন্দাকে বললেন—যাঁর দর্শন আশায় বিরহ-অনলে দগ্ধ হয়েও এই দেহ ধারণ করে ছিলাম, অন্তঃকরণউৎপাটনকারী নিদারুণ মনঃপীড়ারূপ অতিবৃষ্টি সহ্য করেছি, কালিন্দীতটে কুটীর বিবরে ক্রীড়াভিসারে সেই জীবিতবন্ধুর ইন্দুবদন পুনরায় বারবার আস্বাদন করলাম। ১৭।

যথা বা—ললিতমাধবে

সব সময় যাঁর দর্শন পাওয়া অসম্ভব, সেই শ্রীরাধাকে দীর্ঘ প্রবাসের পর কাছে পেয়ে, শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হৃদয়ে বললেন—প্রিয়ে! তুমি নিখিললোকলক্ষ্মী। আমি তোমার চিহ্ন খুঁজতে এসে, সাক্ষাৎ তোমায় পেলাম। এ যেন কল্পনাতীত সৌভাগ্য! পৃথিবীতে যে চণকমুষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে যদি হঠাৎ কনকবৃষ্টি লাভ করে, তার যে অবস্থা হয়, তোমায় পেয়ে আমার সেই অবস্থা হয়েছে। ১৮।

এখানে দীর্ঘ প্রবাসের পর শ্রীরাধার দর্শনলাভে শ্রীকৃষ্ণ পরম সম্পদ লাভের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করছেন। এক্ষেত্রে নায়ক ও নায়িকার মিলনে যে সম্ভোগ রস আস্বাদিত হলো, তাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলে।

পূর্বে যে চতুর্বিধ সম্ভোগের কথা বলা হলো, সেগুলির প্রত্যেকটি আবার 'প্রচ্ছন্ন' ও 'প্রকাশ' ভেদে দ্বিবিধ। এই বিশ্লেষণমূলক ভেদগুলি রসোল্লাসকর নয় ব'লে, সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হয় নি।

ইতি মধুররসপরিপাক-বিবেক॥

গৌণ সম্ভোগ

প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে সম্ভোগের দ্বিবিধ বিশ্লেষণ অতি-উল্লাসকর নয় বলে, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো না। কিন্তু গৌণ সম্ভোগের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১।

স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে বা নায়ককে পেয়ে, নায়িকা যে সম্ভোগ-রস আস্বাদন করেন, তাকে গৌণ সম্ভোগ বা স্বপ্ন-সম্ভোগ বলে। সামান্য ও বিশেষ ভেদে স্বপ্ন দু'রকমের হয়। যা সামান্য, তা পূর্বে 'ব্যভিচারিভাবে' আলোচিত হয়েছে। আর যে স্বপ্নে জাগ্রত অবস্থার ন্যায় দুজনের মিলন হয়, তাকে বিশেষ স্বপ্ন বলে। এই বিশেষ স্বপ্নে জাগর্যা বা জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে কোন প্রভেদ থাকে না। এ এক মহা-অদ্ভুত অবস্থা। এই জাগর্যা-নির্বিশেষ স্বপ্নে নায়ক-নায়িকা অনেক সময় রতিসম্ভোগের পরিপূর্ণ রসাস্বাদন করে। ভাব ও উৎকণ্ঠাময় স্বপ্নবিশেষ পূর্বের মতো চার রকমের হয়, যথা—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্।

স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ

যথা—

স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ ক'রে, পূর্বরাগবতী শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন:

'সুন্দর কালিন্দীতীরে গোবিন্দ বিহার করে নবাম্ভোদজিনি তনুখানি।
মাথায় বিনোদচূড়া তাহে গুঞ্জা ছড়াছড়া সে বড় রসিক শিরোমণি॥
নিকটে আসিয়া মোরে বদনচুম্বন করে সভয় নয়নে পুনঃ চায়।
আমি থাকি শয়নে এই দেখি স্বপনে এ বড় আমার হল দায়॥'

প্রিয়সখি! স্বপ্নে সেই বিদগ্ধচূড়ামণি বলীয়ান্ নবযুবা অনুদিন আমার মুখচুম্বন করলেন। মুহূর্তে আমার তনুমন অপূর্ব সম্ভোগরসে আপ্লুত হলো। ২।

স্বপ্নে সংকীর্ণ-সম্ভোগ

শ্রীমতীর কোন মুগ্ধা সখী বললে—প্রিয়সখি'! তুমি ক্রুদ্ধা হয়ো না। আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি অসময়ে মানের উপশম করি নি। হে সুমুখি! তোমার সেই ধূর্ত নাগর স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে, আমার উপর রসবৃষ্টি করেছিলেন। তাতেই আমার অন্তরব্যাপী মানের আগুন আপনা-আপনি উপশমিত হলো। ৩।

স্বপ্নে সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ সম্ভোগ

যথা—হংসদূতে

মাথুর বিরহে কাতরা শ্রীরাধা ললিতাকে বললেন : সখি!

'আমারে ছাড়িয়া হরি গেল যদি মধুপুরি কিবা ক্ষতি আছয়ে আমার।
যাহ তুমি কোন পুরি সুখেতে রহিও হরি আমার মরণ মাত্র সার॥
তুমি গেলে মধুপুরি আমি আছি দুখে মরি তুমি পুনঃ আসিয়া স্বপনে।
সবলে রমণ করি যাহ পুনঃ মধুপুরি এত জ্বালা সহিব কেমনে॥'

সেই নিষ্ঠুরচূড়ামণি আমায় ত্যাগ ক'রে মথুরায় গিয়েছেন। সেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকুন, কিন্তু আমার মরণ ছাড়া কোনো গতি নাই। কেন না, স্বপ্নে তিনি বৃন্দাবনে এসে বলপূর্বক আমায় রমণ করছেন। এ আমি সইব কেমন করে? কোন্ স্ত্রী এটা সইতে পারে! । ৪।

স্বপ্নে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

যথা—ললিতমাধবে

শ্রীরাধা নববৃন্দাকে বললেন—

'আজিকার স্বপন শুনলো সুন্দরী নাগর আসিয়াছিল।
আদর করিয়া আমার নিকটে কত রস বিরচিল॥
স্বপনে দারুণ অক্রূর না ছাড়ে রথ লয়্যা এলো তাই।
দেখিয়া পরাণে কাঁপিয়া মরি যে কত করি হায় হায়॥'

সখি! স্বপ্নে গোবিন্দ আমার নয়নের অঙ্গনভূমিতে এসেছিলেন।

কিন্তু হায়! রাজপুরুষ অক্রুর এসে তাঁকে রথে আরোহণ করিয়ে আবার মথুরায় নিয়ে গেলেন। ৫।

নায়ক ও নায়িকা দুজনেরই একরকম স্বপ্ন-সম্ভোগ হতে পারে, যেমন অনিরুদ্ধ ও উষার এককালীন অবাধে স্বপ্ন সম্পন্ন হয়েছিল। নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের স্বপ্ন কখনো কখনো এককালীন-সত্য হয়। যাঁরা প্রণয়সিদ্ধ তাঁদের এই পরম অদ্ভুত স্বপ্নের ফল জাগ্রত অবস্থাতেও দেখা যায়। ৬।

প্রেমের পঞ্চম অবস্থায় উপনীতা গোপাঙ্গনাদের স্বপ্ন সম্ভব হয় না। তাদের রজোগুণবৃত্তিজাত জৃম্ভণমাত্র হয়। ৭।

কৃষ্ণভাবের বিলাস অতি মনোহর; আশ্চর্য স্বপ্নবিস্তারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অতিনিবিড় সঙ্গম সংঘটিত করে। ৮।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ স্বপ্নসম্ভোগের বিষয় আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এইসব স্বপ্নে স্পষ্টতঃ সম্ভোগরতির অনুভব-দশা উপস্থিত হয়। ৯।

অনুভব-দশা বলতে সন্দর্শন, জল্পনা, স্পর্শ, পথরোধ, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনায় জলকেলি, নৌ-খেলা (Rowing), লীলাচৌর্য (বাঁশী বা বসন ইত্যাদি চুরি ক'রে লুকিয়ে রাখা), কপট নিদ্রা, লুকোচুরি, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি বুঝায়।

সন্দর্শন

যথা—ললিতমাধবে

শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বললেন—হে চঞ্চলাক্ষি! যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দোদুল্যমান-মকরকুণ্ডলশোভিত গণ্ডস্থল ও মুখপদ্ম তুমি সন্দর্শন না করো, ততক্ষণই তোমার মনে গুরুজন ও কুলমর্যাদার ভয় থাকে। একবার দেখলে, মনে আর কোন ভয় বা লোকলজ্জা থাকে না।

'তাবত গুরুর ভয় তাবত কুলে মন রয় তাবত হয় ধর্মের আচার।
যাবত কুণ্ডলধারী পরম মোহন হরি নাহি হয় নয়নগোচর॥'

জল্পনা

যথা—

পরস্পরের গোষ্ঠী অর্থাৎ বান্ধবজনের সঙ্গে রঙ্গ আলাপ বা টুক্ কেটে কথা বলা, এবং বিতথোক্তি বা মিথ্যা বাদানুবাদ ও কথোপকথন ইত্যাদিকে জল্প বা জল্পনা বলে। ১০।

পরস্পর গোষ্ঠী

যথা—দানকেলিকৌমুদীতে

দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর পথরোধ করলে, শ্রীমতী বললেন—কুলস্ত্রীদের ধর্ষণ করলে, রাজা কখনই ক্ষমা করবেন না। তিনি শাস্তি দেবেন।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভুজঙ্গ যদি দাঁত দিয়ে ওই সব স্ত্রীদের দংশন করে, তাহলে ভাল হয়। এখানে ভুজঙ্গ অর্থে কামসর্প। ১১।

শ্রীকৃষ্ণ আবার বললেন—রাধে! তুমি মঙ্গলমূর্তি, নব চন্দ্রকলার মতো তোমার ললাটফলক। কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্মবিশিষ্ট সুন্দর চোখদুটি তোমার অভিনব সম্পদ। মনোহর তার বিলাসদৃষ্টি। শিবের মতো তোমার ওই উজ্জ্বল নেত্রাঞ্চলে কন্দর্পও বিদগ্ধ হচ্ছেন। তোমার বক্ষে আমায় স্থান দাও। আমায় ভোগী পুরুষশ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করো। ১২।

বিতথোক্তি জল্প

যথা—দানকেলিকৌমুদীতে

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা এবং অন্যান্য গোপাঙ্গনাদের বললেন :

'এই গিরিগোবর্ধনে কতদিন নারীগণে হরে নিলাম বসনভূষণ।
নারীসব নগ্ন হল বৃক্ষপত্র পহিরল উপকার কৈল লতাগণ ॥'

দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী ও অন্যান্য গোপাঙ্গনাদের ভয় দেখিয়ে বললেন—গোবর্ধনপর্বতে আমি হরিণনয়নাদের বসনভূষণ কেড়ে নিয়ে, তাদের জৈনধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলাম, অর্থাৎ দিগম্বরী

করেছিলাম। তখন তারা দীনচিত্তা হয়ে, কাকুতিমিনতি করেছিল। গাছের পাতা ও লতা দিয়ে অঙ্গ আচ্ছাদন ক'রে লজ্জা নিবারণ করেছিল। ১৩।

একথা শুনে, শ্রীমতী ও গোপাঙ্গনারা স্বভাবতই বাদানুবাদ করেছিলেন। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ এই উক্তিদ্বারা তাঁদের প্রকারান্তরে এই ভয়ই দেখিয়েছিলেন যে, দরকার হলে আবার তিনি তাঁদের বিবস্ত্রা করবেন।

স্পর্শ

যথা—

কোন এক লঘু-প্রখরা যূথেশ্বরী কোন অধিকমৃদ্বী সখীর সঙ্গে রসিকতা ক'রে বলেছিল—সখি! তুমি আর শপথ করো না। ভুজঙ্গরাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমায় ভুজভুজঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন। তুমি সেই স্পর্শে অতিশয় দূষিতা হয়েছ। হে কপটিনি! তাই তোমার অনুপম তনু কম্পিত হয়ে ঘর্মাক্ত হয়েছে। দেখ, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়েছে। ১৪।

বর্ত্মরোধন বা পথরোধ

যথা—বিদগ্ধমাধবে

শ্রীরাধা যাচ্ছিলেন সূর্যপূজা করতে। গিরিপথে যেতে, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন।

শ্রীমতী বললেন—আমি সূর্যপূজা করতে যাচ্ছি। আমার পথ ছাড়ো।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাধে! এপথে এসো না। এপথে চারিদিকে পর্বতশৃঙ্গ স্ফুটশিলায় আচ্ছন্ন, শ্যামল বেতস-বন ও বাঁশবনে সানুদেশ পরিপূর্ণ। এই পথে সামনের ওই উত্তুঙ্গ পর্বত অতিক্রম ক'রে তুমি কেমন ক'রে যাবে! তার চেয়ে, যমুনাতীরের পথে চলো

রাসক্রীড়া

যথা—

বিমানচারিণী কোন দেবী অন্য এক দেবীকে বললেন :

'কৃষ্ণ জিনিনবঘন তড়িৎ যেন গোপীগণ তড়িতের মাঝে জলধর।
তড়িৎ মেঘের মাঝে সমসখা হয়ে সাজে রাসলীলা বড় মনোহর॥'

রাসলীলায় গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনার স্কন্ধে হাত রেখে ইতস্তত ভ্রমণ করছেন। বিদ্যুৎ-সমা উজ্জ্বলা গোপবধূর পাশে নবজলধরশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকে দেখে যেন মেঘ ও বিদ্যুতের সমন্বয় বলে মনে হয়। দেখ, সখীরা শ্রীকৃষ্ণের করাম্বুজ ধারণ ক'রে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করছে।

বৃন্দাবন-লীলা

যথা—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বললেন :

'স্থলপদ্ম বিকশিত তাথে ভ্রমরের গীত স্তুতি করে তোমার চরণে।
কুন্দফুল রাশিরাশি তোমার চরণে আসি দণ্ডবৎ করে দন্তগণে॥
তোমার অধর দেখি বিম্বফল হল দুখী চেয়ে দেখ রম্য বৃন্দাবনে।'

প্রিয়ে! ওই দেখ, তোমার বশীভূত বৃন্দাটবী বিলাসময় হয়ে উঠেছে। পুষ্প-পত্রে উল্লসিত হয়ে, সারা বৃন্দাবন যেন তোমার আনন্দবিলাসের লীলাভূমি হয়ে উঠেছে।

'রাধিকারে সঙ্গে লয়া হরি বেড়ায় দেখাইয়া।
বিহরয়ে বড় সুখী মনে। ১৫।'

যমুনায় জলকেলি

যথা—

যমুনায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে জলকেলি করছিলেন। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বললে—তোমার সঙ্গে শ্রীরাধার জলকেলি-যুদ্ধে শ্রীরাধার দ্বারা উৎসিক্ত জলরাশিতে তোমার

গলার মালা ছিঁড়ে পড়েছে, কপালের তিলক ধুয়েমুছে গিয়েছে, মুখচন্দ্র বক্ষস্থ কৌস্তুভমণিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, এবং তোমার চিকুর বন্ধনমুক্ত হয়েছে। তুমি চকিত হয়ো না, আমার সখী কখনই তোমার মতো প্রিয়জনকে পীড়া দেবেন না।

এখানে জলকেলিতে শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় সূচিত হচ্ছে। তিনি যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

যথা বা—পদ্যাবলীতে

যেমন চক্রবাকৃদম্পতির দিবসে মিলন এবং রাত্রে বিচ্ছেদ ঘটে, তেমনি জলক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাচঞ্চল করতলের দ্বারা শ্রীরাধার মুখচন্দ্রিমা কখনো মুক্ত, কখনো বা আচ্ছাদিত হচ্ছে; অর্থাৎ আলো ও আঁধারে যেমন চখা-চখির মিলন ও বিরহ ঘটে, তেমনি বিমুক্তি ও আচ্ছাদনে শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নয়নচকোরের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটছে। এই অপরূপ জলক্রীড়া-কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে রক্ষা করুন।

নৌখেলা বা নৌকাবিহার

যথা—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে মাধব। তুমি বলছো, যমুনায় তরঙ্গ নাই, নৌকাখানিও নূতন; তোমার কথা সত্য। কিন্তু এইটাই সবচেয়ে আশঙ্কার কথা যে, তুমি ভাল নাবিক হলেও অতিচঞ্চল। সুতরাং ভয় হয়, হয়তো মাঝনদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেবে।

লীলাচৌর্য

বংশী, বস্ত্র ও পুষ্পাদি হরণকে লীলাচৌর্য বলে। কখনো কখনো নায়িকা নায়কের অনবধানতার অবসরে তাঁর কোন জিনিস চুরি ক'রে লুকিয়ে রাখেন। কখনো বা নায়ক নায়িকার কোন দ্রব্য অপহরণ ক'রে লুকিয়ে রাখেন।

বংশীচৌর্য

যথা—পদ্যাবলীতে

সখীগণের উক্তি :

'চরণ নূপুর ছাড়ি গেলা রাধা ধীরিধীরি না করিয়া কঙ্কণনিক্কণ।
নিদ্রায় আছিল হরি নিল বংশী চুরি করি হাসি হাসি করিল গমন ॥'

বস্ত্রচৌর্য

যথা—

শ্রীকৃষ্ণের ভীতিসঞ্চার উদ্দেশ্যে বিবস্ত্রা গোপীগণের উক্তি :

'তরুপত্র বস্ত্র করি যাও এক সহচরী আনহ ব্রজের বৃদ্ধাগণ।
এই বস্ত্রবাটপাড়ে আসি যেন গালি পাড়ে, সুখে মোরা করিব দর্শন ॥'

যমুনার জলে দাঁড়িয়ে বিবস্ত্রা গোপিনীরা বললে—কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণ যদি বসন ফিরিয়ে না দেন, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বৃক্ষপত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন ক'রে গিয়ে, বৃদ্ধাদের ডেকে আনো। তাঁরা এসে, এই উমাব্রত-পরায়ণা কুমারীদের লাঞ্ছনাকারী শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করুন ; আমরা মনের আনন্দে দেখি।

পুষ্পচৌর্য

যথা—

শ্রীরাধা একাকিনী শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পোদ্যানে পুষ্পচয়ন করছিলেন। তাঁকে ধরবার ইচ্ছা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অয়ি মৃগনয়না! তুমি প্রতিদিন গোপনে এই উদ্যান থেকে পুষ্পমঞ্জরী অপহরণ করো। হে তস্করি! সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে আজ তুমি ধরা পড়েছ। কাজেই আর প্রৌঢ়ি করো না, বেশী প্রবীণতা দেখাবার চেষ্টা করো না। চৌর্য-অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য ওই গুহারূপ কারাগৃহে প্রবেশ করো।

ঘট্ট বা ঘাট

যথা—দানকেলিকৌমুদীতে

দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণ ললিতা ও অন্যান্য সখীদের বললেন—তোমরা ঘাটোয়ালকে ঘাটের শুল্ক না দিয়ে, তাকে অবজ্ঞা ক'রে তার সঙ্গে বিবাদ করছো। আমার মনে হয়, তোমরা ওই গিরিতটের বিষম দুর্গে ঘাটরাজের সঙ্গে রণ করতে চাও। ১৬।

'আমি ত ঘাটের রাজা না করি তাহার পুজা বিবাদে চঞ্চল কৈলে মন।
বুঝি গিরিকুঞ্জবনে ঘাটের রাজার সনে তোমরা করিবে মহারণ ॥'

কুঞ্জাদি লীনতা

যথা -বিদগ্ধমাধবে

কুঞ্জমধ্যে লুকিয়ে থাকা বা লতাগুল্মের অন্তরালে নায়িকার আত্মগোপন ক'রে থাকাকে কুঞ্জাদিলীনতা বলে।

শ্রীরাধা কুঞ্জমধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীকৃষ্ণ বনের ভিতর প্রবেশ ক'রে বললেন—আমার মনে হয়, শশিমুখী নিবিড় ক্রীড়ামোদের জন্য এই অশোকবনের অন্তরালে কোথাও লুকিয়ে আছেন। নইলে পুষ্পামোদী এই অশোকবৃক্ষ ঘিরে ভ্রমরেরা স্তবগুঞ্জন করবে কেন? তাঁর চরণের স্পর্শ পেয়ে নিশ্চয়ই অশোকবনে পুষ্পসমাগম হয়েছে।

সুন্দরীদের চরণস্পর্শে অশোকবৃক্ষে পুষ্পসমাগম হয়। তাই অশোকবনে দোহদ উৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে, রমণীগণ অশোকবৃক্ষে চরণাঘাত করেন।

এখানে অশোকবৃক্ষ ঘিরে অলিকুলের স্তবগুঞ্জন শুনে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাহ্ণে সেখানে শ্রীরাধার চরণ স্পর্শ অনুমান করছেন।

মধুপান

যথা—

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বললেন—দেবি। মধুপাত্রে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুখচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। শ্রীরাধা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি মধু পান করছেন না।

'কৃষ্ণের বদনচন্দ্র মধুপাত্রে প্রতিবিম্ব দেখে রাধা সুস্থির নয়নে।
যাচয়ে নাগররায় তবু মধু নাহি খায় রৈল চেয়ে প্রতিবিম্ব পানে ॥'

মধুপাত্রে নায়কের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। চুমুক দিয়ে সেই পাত্র থেকে মধুপান করবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও, নায়িকা মধুপান না ক'রে সেই মুখপানে চেয়ে আছেন। দয়িতের মুখ-চন্দ্র-প্রতিবিম্বিত মধুপাত্রে অধরস্পর্শের অনুরোধ অতিমধুর রতি নিবেদন জ্ঞাপন করে।

বধূবেশ ধারণ

যথা—উদ্ধবসন্দেশে

শ্রীরাধার সঙ্গে বিশাখার যে আলাপ হয়েছিল, উদ্ধব তার মাধুর্য অনুভব করেছিলেন। তাঁকে সেই রস পুনরায় আস্বাদন করাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সখা। শ্রীরাধা মান করেছিলেন। কোন রকমেই তাঁর মানভঞ্জন করা যায়নি। সেইজন্য আমি নারীবেশ ধারণ ক'রে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। শ্রীরাধা আমায় দেখে বিশাখাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—সখি। এই শ্যামবর্ণা নারীটি কে?

বিশাখা বলেছিলেন—উনি একটি গোপকন্যা।

শ্রীরাধা জিজ্ঞেস করেছিলেন—কিন্তু এখানে এসেছেন কেন?

বিশাখা উত্তর দিয়েছিলেন—তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য এসেছেন। উনি তোমার বয়স্যা হবার জন্যই জন্মেছেন। ওঁকে বারংবার আলিঙ্গন করো।

এই কথা শুনে, শ্রীরাধা আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হয়ে যখন জানতে পারলেন যে, আমিই বধূবেশ ধারণ করেছি, মানিনী লজ্জিতা হলেন।

কপট নিদ্রা

যথা—কর্ণামৃতে

ব্রজবালার সঙ্গে রমণ করবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রার ভান করে এই লীলা করে থাকেন। নিজেকে অল্প-অল্প সংবৃত করে রাখেন। তাঁর মুখে মৃদুহাসির রেখা ফুটে ওঠে। তাঁকে নিদ্রিত দেখে, গোপাঙ্গনারা অবাধে প্রেমের লীলাবাক্য আলোচনা করেন; তাঁদের তনু রোমাঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা নিদ্রায় মুদিত নয়নে থেকে, কান পেতে তাঁদের সেই জল্পনাবাক্যের রসোপলব্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই মুদিতনেত্র শয়ানমূর্তির আমরা উপাসনা করি। ১৭।

'দেখসিয়া হরি কপট করিয়া শয়ন করিয়া রয়।
মুখে মৃদুহাসি ছাপিয়া রাখয়ে তভু প্রকাশিত হয়॥'

দ্যুতক্রীড়া বা পাশা-খেলা

যথা—

বৃন্দা কুন্দলতাকে বললেন:

'রাইকানু পাশা খেলে সখীগণ গুটি চালে পণ কৈল অধরচুম্বন।
কখন জিতয়ে হরি কভু জিতে সুন্দরী হাততালি দেয় সখীগণ॥'

শ্রীকৃষ্ণ পাশা-খেলায় পণ জয় ক'রে শ্রীরাধার দক্ষিণ গণ্ডে চুম্বন অঙ্কিত করলেন। তারপর শ্রীরাধা "বামঞ্চ দশ" ব'লে পাশা চাললেন। এই কথা শুনে, শ্রীকৃষ্ণ ছল ক'রে বললেন—সুন্দরি! তুমি যা আজ্ঞা করলে, তা আমার শোনা উচিত। এই ব'লে তিনি শ্রীমতীর বামগণ্ড দংশন করতেই শ্রীমতী কোপভরে ভুজলতা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করলেন। ১৮।

বস্ত্রাকর্ষণ বা পটাকৃষ্টি

যথা—ললিতমাধবে

কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার বক্ষোবস্ত্র অপহরণ করেছিলেন তখন শ্রীমতী লজ্জায় নিকুঞ্জের নিবিড় অন্ধকারে লুকিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে খুঁজবার জন্য অন্ধকার কোণে প্রবেশ করলেন। তাঁর বক্ষস্থিত কৌস্তভমণি থেকে যে কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তাতে অন্ধকার বিদূরিত হলো। শ্রীমতী লজ্জিতা হলেন।

'আজি ত নিকুঞ্জঘরে রাধাবস্ত্র নিলাম হরে তাথে লুকাইল অন্ধকারে।
কৌস্তভমণির সার তাথে কৈল উপকার আমা দেখি রাধা লজ্জা করে॥'

চুম্বন

যথা—

রূপমঞ্জরী তার সখীকে বললে:

'রাইক বদন কমলবর সুন্দর চুম্বই নাগর রায়।
কমল বিপিনে যেন অলিবর বিহরই পুনঃপুনঃ মধু পিয়ে তায়॥' ১৯॥

আলিঙ্গন বা আশ্লেষ

যথা—

শ্রীরাধার কোন সখী অন্যসখীর কাছে বর্ণনা করে বললেন—শ্রীমতী যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন, তখন যে শোভা হলো, তা বর্ণনা করি শোন। অতিশয় হর্ষে নবকুঙ্কুমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধা নবঘনদ্যুতি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। দেখে মনে হলো, যেন স্বর্ণলতাবেষ্টিত তমালবৃক্ষের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে গেল। ২০।

নখক্ষত

যথা —

শ্যামলা পরিহাস ক'রে শ্রীরাধাকে বললে—সখি! তোমার কুচযুগল দেখে, কুচ ব'লে মনে হয় না। মনে হয়, তুমি তোমার গজেন্দ্রগমনে গজরাজকে পরাজিত ক'রে, তার কুম্ভদুটি হরণ ক'রে

নিয়ে আপন হৃদয়ে স্থাপন করেছ। আর এই স্তনদ্বয়ে যে ক্ষতচিহ্ন দেখছি, সে যেন নাগদমন শ্রীকৃষ্ণের নখাঙ্কুশ চিহ্ন।

'গতিতে কুঞ্জর জিনি তায় কুম্ভ হরে আনি রাখিয়াছ আপন হৃদয়ে।
শ্রীনাগদমনকৃত নখাঙ্কুশ চিহ্ন যত প্রকাশিত হইয়া আছয়ে॥'

বিম্বাধরসুধা পান

যথা—

দূতী শ্রীরাধাকে বললে—হে করভোরু! তুমি তোমার ওই সুধাকরবিম্ববিনিন্দিত অনিন্দ্য মুখকমল হাত দিয়ে ঢেকো না। বরাঙ্গনে! তোমার অধররূপ রঙ্গণকুসুমের মধু কদম্ববনের ওই ভ্রমর পান করুক। ২১।

'সুধাকরসুধা ব্যর্থকারী মুখ আচ্ছাদ না কর করে।
নাগরভ্রমর পান করু তাহা আপনার আশা পুরে॥'

সম্প্রয়োগ

যথা—

কুন্দলতার প্রতি বৃন্দার উক্তি :

'রাধিকার কন্ধ বেরি হস্ত প্রসারিল হরি অধরের সুধা করে পান।
রাধার হয় ভাবোদ্গম দোঁহে অতি মনোরম ক্রীড়াবিধি করয়ে নির্মাণ॥'

শ্রীরাধাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে, কন্দর্পউৎসববিশারদ শ্রীকৃষ্ণ নিধুবনে ক্রীড়া বর্ধন করতে লাগলেন।

বিজনে সম্ভোগ দু'রকমের হয়; সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাস। বিদগ্ধগণের মতে, লীলাবিলাসে যে নিবিড় সম্ভোগসুখ আস্বাদিত হয়, সম্প্রয়োগে তা হয় না।

যথা—

সখীগণ গবাক্ষপথে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসদর্শনে সেই সম্ভোগের রসাস্বাদন করলেন :

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলপূর্বক আলিঙ্গনে উদ্যত হলেন, শ্রীরাধা তাঁর অঙ্গে নখরাঘাত করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বস্ত্রাকর্ষণে প্রবৃত্ত হলে, শ্রীরাধা তাঁর হস্তস্থিত নীলপদ্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরাধা সম্প্রয়োগ-রতি অপেক্ষা লীলা-বিলাসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখবিধান করলেন।

'হরি আলিঙ্গয়ে তাথে রাই করে নখাঘাতে কৃষ্ণ যেই করয়ে চুম্বন।
বসন ফেলাঞা মারে হরি পুনঃ বস্ত্র ধরে রাধা করে উৎপল তাড়ন॥
গোবিন্দ উৎপল ধরে শুষ্ক রোদন করে কপটে করয়ে কোপাভাস।
সঙ্গমের শতগুণ তাথে আনন্দিত মন রাধা সঙ্গে সদাই বিলাস॥'

এই লীলাবিলাসে পরস্পরের যে সুখাস্বাদন হয়, সম্প্রয়োগ-সম্ভোগে সে সুখ আস্বাদিত হয় না।

যথা বা—

নর্মকলাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে পরিহাস করলে, শ্রীরাধার নয়নের দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠলো, ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলপ্রকাশের কৃত্রিম প্রয়াস করলে, শ্রীরাধা কর্ণোৎপলদ্বারা তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। এইরূপে ব্রজাঙ্গনাদের রতিগুরু শ্রীকৃষ্ণ গান্ধর্বিকার সঙ্গে লীলাখেলা করতে লাগলেন। এই ক্রীড়া সুরতোৎসবের চেয়ে অনেক বেশী সুখের আস্বাদ বিস্তার করতে লাগলো।

তথা গীতগোবিন্দে

শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের পরস্পর সুরতারম্ভে যে আনন্দলহরী উদ্ভূত হয়, তা রসিকজনের অনুভববেদ্য। পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গন জনিত পুলকাঙ্কুরসঞ্জাত লীলাখেলা, সতৃষ্ণ নয়নের দৃষ্টি, অধরসুধা পান, নর্ম-আলাপ এবং মন্মথকলাযুদ্ধে আনন্দানুভূতির জন্য মিলনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল। পরম অভীষ্ট লাভের তৃষ্ণায় শান্তি বিঘ্নিত হলো, এবং অবশেষে সেই রস সুরস হয়ে রসোৎকর্ষ স্থাপিত হলো। সার্থক হলো শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহামিলন।

গ্রন্থসমাপনে মঙ্গলাচরণ

যথা—

হে গোকুলানন্দ, হে গোবিন্দ, হে গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্র! হে প্রাণেশ, হে সুন্দরোত্তংস, হে নাগরশিখামণি, হে বৃন্দাবনচন্দ্র, হে গোষ্ঠ-যুবরাজ, হে মনোহর! ইত্যাদি নামে ব্রজদেবীগণ তাঁদের প্রিয়তমকে প্রণয়সম্ভাষণ করে থাকেন। ২২।

'এই মত কৃষ্ণেরে করে প্রিয় সম্বোধন।
কিঞ্চিৎ দেখাল তার দিগ্ দরশন॥
অতুল্য অপার সেই মধুররসসিন্ধু।
তটস্থ হইয়া তার পাইনু একবিন্দু॥'

যেমন সমুদ্রের তল নাই এবং পার নাই, তেমনি এই মধুররস অতল ও অপার। এই অপার ও অতলস্পর্শ মধুররসে কেউ অবগাহন করতে পারেন না। এই অন্তহীন অপার রসসমুদ্রের তট ভূমিতে দাঁড়িয়ে শুধু সেই মধুররসকে স্পর্শ করা যায় মাত্র। আমিও তটস্থ হয়ে শুধু স্পর্শই করলাম। ২৩।

হে দেব! গহনমহাঘোষ বৃন্দাবন-সাগরোৎপন্ন উজ্জ্বল শৃঙ্গাররস এই উজ্জ্বলনীলমণি তোমার মকরকুণ্ডল-পরিসরে সেবাসমুচিত ভজনা করুক। ২৪।

ইতি—সম্ভোগভেদ

উজ্জ্বলনীলমণিনামগ্রন্থ সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

বিপ্রলম্ভের প্রকারভেদ

পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস

পূর্বরাগ

১। সাক্ষাৎ দর্শন
২। চিত্রপটে দর্শন
৩। স্বপ্নে দর্শন
৪। বন্দীমুখে শ্রবণ
৫। দূতীমুখে শ্রবণ
৬। সখীমুখে শ্রবণ
৭। গুণী জনের গীতশ্রবণ
৮। বংশীধ্বনি শ্রবণ

মান

৯। সখীমুখে শ্রবণ
১০। শুকমুখে শ্রবণ
১১। মুরলীধ্বনি শ্রবণ
১২। বিপক্ষগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন
১৩। প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন
১৪। গোত্রস্খলন
১৫। স্বপ্নে দর্শন
১৬। অন্যনায়িকার সঙ্গ দর্শন

প্রেমবৈচিত্ত্য

১৭। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ
১৮। নিজপ্রতি আক্ষেপ
১৯। সখীর প্রতি আক্ষেপ
২০। দূতীর প্রতি আক্ষেপ
২১। মুরলীর প্রতি আক্ষেপ
২২। বিধাতার প্রতি আক্ষেপ
২৩। কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ
২৪। গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

প্রবাস

২৫। ভাবী
২৬। মথুরাগমন
২৭। দ্বারকাগমন
২৮। কালীয়দমন
২৯। গোচারণ
৩০। নন্দমোক্ষণ
৩১। কার্যানুরোধ
৩১। রাসে অন্তর্ধান

সম্ভোগের প্রকারভেদ

সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

৩৩। বাল্যে মিলন
৩৪। গোষ্ঠে গমন
৩৫। গোদোহন
৩৬। অকস্মাৎ চুম্বন
৩৭। হস্তাকর্ষণ
৩৮। বস্ত্রাকর্ষণ
৩৯। বর্ত্মরোধ
৪০। রতিভোগ

সংকীর্ণ সম্ভোগ

৪১। মহারাস
৪১। জলক্রীড়া
৪৩। কুঞ্জলীলা
৪৪। দানলীলা
৪৫। বংশীচুরি
৪৬। নৌকাবিলাস
৪৭। মধুপান
৪৮। সূর্যপূজা

সম্পন্ন সম্ভোগ

৪৯। সুদূর দর্শন
৫০। ঝুলন যাত্রা
৫১। হোলী লীলা
৫২। প্রহেলিকা
৫৩। পাশাখেলা
৫৪। নর্ত্তক রাস
৫৫। রসালস
৫৬। কপট নিদ্রা

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

৫৭। স্বপ্নে মিলন
৫৮। কুরুক্ষেত্রে
৫৯। ভাবোল্লাস
৬০। ব্রজাগমন
৬১। বিপরীত সম্ভোগ
৬২। ভোজন কৌতুক
৬৩। একত্র নিদ্রাবস্থা
৬৪। স্বাধীনভর্তৃকা।

রস-প্রবাহ

দুটি শাখা—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ

(ক) বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ

অনুক্রমণিকা

(১) পূর্বরাগ—৮ (২) মান—৮ (৩) প্রেমবৈচিত্ত্য—৮ (৪) প্রবাস—৮

(১) পূর্বরাগ

শ্রবণ	
দূতীমুখে	১
সখীমুখে	১
গুণগান	১
ভাটমুখে	১
বংশীধ্বনি	১
	৫
দর্শন	
স্বপ্ন দর্শন	১
সাক্ষাৎ দর্শন	১
চিত্রপট দর্শন	১
	৩
মোট—৮	

(২) মান

সহেতু	
(ক) শ্রুত	
সখীমুখে	১
শুকমুখে	১
মুরলীপ্রস্তাবে	১
	৩
(খ) অনুমিতি	
ভোগাঙ্কচিহ্ন	
প্রিয়গাত্রে	১
বিপক্ষগাত্রে	১
বাক্য-স্খলন	১
	৩
নির্হেতু	
কারণাভাস	১
অতিকারণ	১
	২
মোট—৮	

(৩) প্রেমবৈচিত্ত্য

অনুরাগ	
আক্ষেপানুরাগ	১
উল্লাসানুরাগ	১
	২
রূপানুরাগ	
কৃষ্ণপ্রতি আক্ষেপ	১
নিজপ্রতি ”	১
মুরলীপ্রতি ”	১
সখীপ্রতি ”	১
দূতীপ্রতি ”	১
	৫
রসোদ্গার	১
মোট—৮	

(৪) প্রবাস

নিকট প্রবাস	
গোচারণ	১
নন্দমোক্ষণ	১
কালীয়দমন	১
কার্যানুরোধে	১
রাসে অন্তর্ধান	১
	৫
ভাবী	১
ভবন	১
ভূত	১
	৩
মোট—৮	

নায়ক—ধীরোদাত্ত
নায়িকা—খণ্ডিতা
করুণরস
শোকভাব
৪

নায়ক—ধীরশান্ত
নায়িকা—বিপ্রলব্ধা
করুণ রস
উৎসাহভাব
৪

নায়ক—শঠ
নায়িকা—প্রোষিতভর্তৃকা
বীভৎস রস
জুগুপ্সাভাব
৪

নায়ক—ধীরশান্ত : কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস
নায়িকা—বিপ্রলব্ধা
অদ্ভুত রস
উৎসাহভাব

নিকট প্রবাস
চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ—প্রত্যেক অষ্টপ্রকারে
মোট—৩২ প্রকার।

(খ) সম্ভোগ চতুর্বিধ

অনুক্রমণিকা

(১) সংক্ষিপ্ত		(২) সঙ্কীর্ণ		(৩) সম্পূর্ণ		(৪) সমৃদ্ধিমান্
পূর্বরাগান্তর		মানান্তর		কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসান্তে		সুদূর প্রবাসান্তে
বাল্যে	১	মহারাস	১	সুদূর দর্শন		স্বপ্নে মিলন
গোষ্ঠে	১	কুঞ্জলীলা	১	দোললীলা		কুরুক্ষেত্র
গাভীদোহে	১	দানলীলা	১	হোলিলীলা		বাক্‌বিলাপে
চুম্বনে	১	নৌকাবিলাস	১	প্রহেলী	১	ব্রজাগতে
স্পর্শনে	১	বংশীচৌর্য	১	দ্যূতক্রীড়া	১	ভোজনকৌতুকে
বস্ত্রাকর্ষণে	১	মধুপান	১	নর্তক রাস	১	একত্র নিদ্রায়
পথরোধে	১	সূর্যপূজা	১	রসালস	১	বিপরীত সম্ভোগ
রতিভোগে	১	স্বয়ংদূতী	১	কপট নিদ্রা		স্বাধীনভর্তৃকা
মোট		মোট—৮		মোট—৮		মোট

নায়ক—ধৃষ্ট	নায়ক—ধীরললিত
নায়িকা—খণ্ডিতা	নায়িকা—বাসকসজ্জিতা
ভয়ানক রস	রৌদ্র রস
ক্রোধভাব	বিস্ময়ভাব
৪	
নায়ক—দক্ষিণ	নায়ক—অনুকূল
নায়িকা—অভিসারিকা	নায়িকা—স্বাধীনভর্তৃকা
হাস্য রস	মধুর রস
হাস্যভাব	রতিভাব

সম্ভোগ চতুর্বিধ—প্রত্যেকটি অষ্টপ্রকারে মোট—৩২
বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ—প্রত্যেকটি অষ্টপ্রকারে মোট—৩২

সর্বসমেত—৬৪ রস

ভ্রমসংশোধন—

১ম পৃষ্ঠা,	১ম পংক্তি	'সদানন্দং'	স্থলে	'সদানন্দম্'
	১৬শ „	'আলোচনাই'	„	'বিস্তৃত আলোচনাই'
৮১	১৯শ „	'ব্যপদশে'	„	'ব্যপদেশে'
১৯৪	১৮শ „	'নির্বেদঃ'	„	'নির্বেদ'
৩৫২	৯ম „	'মিথ্যা'	„	'কপট'